শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ

অনুজ প্রতিমেষু

স্নায়ু যুদ্ধের ধরণ হল উগ্র যৌনাত্মক গল্প, উপন্যাস, কবিতায় সাহিত্যকে ডুবিয়ে দেওয়া, তার সঙ্গে যৌন রসাত্মক নাটক, শৃঙ্গার রসাত্মক সিনেমা, নগ্ন নারীর বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি বিক্রয়। এই সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খোলা, ক্যাব্যারে নাচ প্রচলন করা। মেয়েদের প্রলোভন দেখিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে টেনে নামানো! নানারকম অশালীন পোষাকে মেয়েদের নৈতিকবোধ শিথিল করে দেওয়া, নানা রকমের রাসায়নিক পিল বাজারে ছেড়ে, মদের পিল ইত্যাদি দিয়ে স্নায়ু শিথিল করে দেওয়া। তার ওপর রয়েছে ধর্মের নামে বাঁদরামি, প্রতিবাদকারীর গলাকাটা, গণতন্ত্রের নামে দুর্নীতিকে প্রসার করা, যুব-সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের পথে টেনে নামানো। এইগুলোই হল বুর্জোয়া শাসকদের মুখ্য অস্ত্র যা দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা যায়।

তিরিশ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মহান ঐতিহ্য কিভাবে নষ্ট হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের পর তারই সামান্য চিত্র।

এই লেখকের :—

রাজা বদলের পালা
পথে প্রান্তরে (১ম ও ২য় পর্ব)
এই শহরে
আমি চে গুয়েভারা
মহারাজার চোখে বাংলাদেশ
রূপ রস রঙ্গ
ওরা নকশালপন্থী কেন ?
সিয়া একটি গোপন চক্র
হানয় থেকে সায়গন
আমায় বাঁচতে দাও
অশান্ত চিলি

ইত্যাদি ইত্যাদি

প্রতি নিয়ত অনেক ঘটনাই ঘটে, সবতো মনে রাখা যায় না। যে সব ঘটনা মনের কোনায় দাগ কাটে সেগুলোই মাঝে মাঝে মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, এই রকম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হল পানুদিদির বিয়ে। আজও পানুদিদির বিয়ের ঘটনাটা বেশ মনে আছে। সহজ কথায় বলতে পারি, মনে রাখার মতই সেই ঘটনা।

আমাদের নিকট প্রতিবেশী নৃপেন লাহিড়ির বড় মেয়ে পান্না ওরফে আমাদের পানুদিদি। নৃপেন লাহিড়ি পাড়া সুবাদে আমাদের কাকা। হাঁতড়ে দেখলে কোথাও না কোথাও একটা কিছু আত্মীয়তাও থাকতে পারে। এসব জানে মুরুব্বীরা, আমাদের অত জানার দরকার কোন কালেই হয়নি। আমরা অর্থাৎ আমার ভাইবোনেরা নৃপেনকাকা পর্যন্ত এগিয়েছি, তাতেই আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা ছিল। এর বেশি জানার কোন প্রয়োজন কখনও কেউ অনুভব করেনি।

নৃপেনকাকা মহকুমা আদালতের মোক্তার, পসার ভাল কিন্তু সঞ্চয়ের অঙ্ক আশাপ্রদ নয় বলেই জানতাম। অবশ্য এই জানাটা পরে ভুল প্রতিপন্ন হয়েছিল। পানুদিদি আমার চেয়ে বয়সে খুব বড় নয়, হয়ত বছর দেড়েকের বড়। বাল্যকাল থেকেই পানুদিদির বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল অবাধ। পানুদিদির ছোট ভাই বসন্তলাল আমার সহপাঠী। আমরা সবাই একসঙ্গে খেলতাম, মারামারি করতাম। সব বিষয়ে পানুদিদি ছিল লীডার, বোধহয় তার লীডারশিপ্ মেনে নিয়ে তাকে সমীহ করে চলতাম।

আমাদের যখন বার তের বছর বয়স তখন পানুদিকে সেমিজ শাড়ি পড়তে দেখলাম। বেশ একটু পার্থক্য রেখেই চলতে আরম্ভ

করল পানুদিদি। সে সময় পানুদিদি আদেশ করলে এমন কাজ নেই যা করতে পারতাম না।

পানুদিদির বয়স তখন আঠার। আমরা দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখনকার দিনে মেয়েদের আঠার বছর অনেক বয়স। অনেকের ফিস্‌ফিসানি শুনেছি, বিশেষ করে পাড়ার গিন্নীবান্নিরা মাঝে মাঝেই ফিস্ ফিস্ করে বলত, নেপেন মোক্তারের ধিঙ্গি মেয়েটার আর বিয়ে হবে না। মেয়েটাকে পুঁতলে স্যাওড়াগাছ বেরুবে।

রূপ ছিল পানুদিদির। সবাই বলত, পেনোর রূপের দেমাক কত। টানা টানা চোখ, গোলগাল মুখ, গৌর বরণ, লোকের চোখ ঝলসে দিত। বয়স অনুযায়ী স্বাস্থ্য আরও সুন্দর করেছিল পানুদিদিকে। গলার স্বর এত মিষ্টি যে তার কথা শোনার জন্য তার পাশে পাশে ঘুরতাম। ছোট শহরে ছিল একটা মেয়েদের মাইনর স্কুল। মেয়েদের মাইনর পাশ করাটা ছিল সে সময় অধিক বিদ্যা অর্জন। কিন্তু পানুদিদি ওখানে থামেনি। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমাদের আগের বছর পাশও করেছিল। পাশ করার পর পানুদিদিকে থামতে হল। পানুদিদি আর এগোবার মত গরজও দেখায়নি।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কলেজে পড়বে না পানুদি?

পানুদিদি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল, বাবার বিদ্যাতো হয়ে গেছে। এবার মোক্তারি পরীক্ষা দেব।

ঠাট্টা করছ পানুদি?

না রে না। আর পড়ে কি হবে? সেইতো রান্নাঘরের ম্যানেজারী, এই বিদ্যাই যথেষ্ট। বিদ্যার বহর বৃদ্ধি পেলে নদী ছেড়ে সাগর খুঁজতে হবে। রান্নাঘরের বিদ্যা এতেই বেশি। আরও যখন বড় হবি সব তখন বুঝবি।

তোমার সব কিছুতেই কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব।

না ছাড়তে চাইলেও বই-কেতাব আমাকে ছেড়েছে। বেঁধে রেখে

কিছুই হয় না রে। যতই প্যাঁচ কষবি ততই ফস্কা পাক্ দেবে। এই তো বেশ আছি। আর দরকার নেই।

আমরা ছিলাম মনোযোগী পাঠক। স্কুল কামাই করতাম না। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মমত পড়তাম। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে ছিল খেলার মাঠ। আমরা থাকতাম এই গণ্ডীর মধ্যে। এর বেশি এগোতে সাহস পেতাম না, সুযোগও ছিল না।

হঠাৎ একদিন দেশ শুদ্ধ লোক লাফিয়ে উঠল। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মেতে উঠল। সবার মুখেই এক কথা, ইংরেজ হটাও। অবশ্য সবাই বলতে আমাদের মত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের কথা বলছি। সরকারী কর্মচারীদের ছেলেরা অথবা অর্থবান ব্যক্তিদের ছেলেরা ভুলেও মুখ দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করত না।

ধুয়ো উঠল আইন অমান্য কর। লবণ তৈরী কর। মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং কর।

আমার মগজে এসব মোটেই ঢোকে না। এসব রাজনীতি আর কর্মনীতি আমার পক্ষে তিক্ত কুইনাইন মনে হত। আমিও অতি সন্তর্পণে এই হুজুগ থেকে নিজেকে হটিয়ে রাখতাম। রাজনীতির ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে থাকতাম।

একদিন পানুদিদির মুখে শুনলাম গান্ধীমহারাজের কথা। লবণ সত্যাগ্রহ করে গান্ধীজি জেলে গেছেন তাও শুনলাম। দেশের আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কারাবরণ শুনে কেমন একটু ঘাবরে গেলাম।

পানুদিদি বলল, আমরা পেছনে থাকব কেন? আমরাও এগিয়ে যাব। তোরা এসব খবর রাখিস না কেন? তোরা দেশকে ভালবাসিস না, তা না হলে চুপ করে বসে থাকতিস না।

বললাম, কোথায় খবর পাব। সারা শহরে বিশ বাইশখানা খবরের কাগজ আসে, তার অর্ধেকটাই ইংরিজি কাগজ, বড় বড়

সরকারী অফিসাররা পড়ে। আমরা পড়ব কোথা থেকে? লোকের মুখেই যা শুনি তাই বলি।

কেন রে, আমাদের বাড়িতেই তো রোজ বিকেলে কলকাতা থেকে খবরের কাগজ আসে। ইচ্ছে করলেই তো পড়তে পারিস।

বাপ্‌রে বাপ্‌। বিকেলবেলা থেকে রাত দশটা অবধি কাগজ নিয়ে যেভাবে বাবা-কাকার দল কাড়াকাড়ি করেন সেখানে নাক ঢোকালে থাপ্পরে নাক ভোঁতা করে দেবে।

পরের দিনও তো পড়তে পারিস। আমাদের বাড়িতেই তো কাগজ থাকে। যে কোন সময় পড়তে পারিস।

অত সময় কোথায় পাব পানুদি। পরীক্ষার পড়া পড়তে হয়। বিকেলে একটু খেলাধুলা না করলে মন ভাল থাকে না। কখন কাগজ পড়ব?

সেই খোট্টা দারোয়ানের কথা শোনালি। এক হাঁথ মে ঢাল এক হাঁথ মে তলোয়ার, ক্যাসে চোর পাকড়েগা। আর যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না! পড়ার ইচ্ছা থাকলে ওসব কোন কাজের কথা নয়।

কথা শেষ করেই পানুদিদি গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ ভারী গলায় বলল, খবরের কাগজ পড়লে তবেই তো লেখাপড়া শেখা সম্পূর্ণতা লাভ করে। কত শেখার আছে তা জানিস?

জানি কিন্তু পড়ার সুযোগ পাই না। এবার থেকে রোজ বাসী কাগজই পড়ব।

তখন তো জানতাম না, অবশ্য পানুদিদিও জানত না যে খবরের কাগজ সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থরক্ষা করতে শতকরা আশীটি মিথ্যা খবর দেয় বাকি খবরের কিছুটা সত্য কিছুটা অর্ধসত্য। যাই হোক সেদিনের কথায় ফিরে যাই। রোজ খেলার মাঠে যাবার আগে খবরের কাগজের পাতা উল্টে দেখতাম। পুরানো কাগজ নিয়ে টানাটানি হত না। আমার সহপাঠী পানুদিদির ভাই বসন্তলালের

পড়ার ঘরে বসে বসে অভিনিবেশ সহকারে খবরের কাগজ কিছুটা পড়তাম। গোটা কাগজটা মোটেই পড়া হতনা। খেলার সময় হলেই লাফ দিয়ে বেড়িয়ে পড়তাম।

পান্নুদিদির সঙ্গে প্রায় দিনই আলোচনা হত। পান্নুদিদি আইন অমান্য আন্দোলনের একটা যেন ডায়েরী। প্রতিদিনের ঘটনাগুলো আমাকে শোনাত, আলোচনা করত, মন্তব্য করত, একদিন বলল, শুনেছিস ননা, সুভাষবাবু নীলাগ্রামে গেছেন লবণ সত্যাগ্রহ করতে। নীলা গ্রামে একজন সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে।

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, মেরে ফেলেছে!

হাঁ রে হাঁ। দেশপ্রেম যাদের থাকে তারা কি মরণকে ভয় করে। মরণের ভয় থাকলে কেউ কি দেশসেবা করতে পারে।

বললাম এরা তো অহিংস সত্যাগ্রহী। এদের কেন হত্যা করছে?

সেটাই তো কথা। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেছে। যা খুশী করছে। মানুষ মারছে জেল জুলুম জরিমানা করছে। পরাধীনতার বড় জ্বালা। আমার ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে গিয়ে সত্যাগ্রহ করি। মারুক আমার বুকে বুলেট।

আমি শিউড়ে উঠলাম। কল্পনায় পান্নুদিদির বুকের রক্ত দেখে যেন স্থির থাকতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি বললাম, ওসব অলক্ষুণে কথা বলনা পান্নুদি। মরতে হলে লড়াই করে মরা উচিত। ওসব কুকুর শেয়ালের মত মরতে চাওয়া বোকামি।

পান্নুদিদি হেসে বলল, একদিন মরতেই হবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য মরণে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

স্বর্গ তুমি বিশ্বাস কর?

করি আবার করিনা। যখন দুঃখ পাই তখন যেমন ভগবানের নাম করি অসহায়ের মত আবার দুঃখ না কমলে মনে মনে বলি, দুত্তোর ভগবান। এও তেমনি। অসহায় মানুষকে কাজে নামতে

হলে এই রকম একটা বিশ্বাস থাকা দরকার। জানিস তো, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। তাই স্বর্গকে বিশ্বাস করি।

বিরক্তির সঙ্গে বললাম, স্বর্গে আমার দরকার নেই। মর্তে বেঁচে থাকতে চাই। স্বর্গ-নরক সবই এই মর্তে। মরে গেলে তো ফুরিয়ে গেল। ওটা আমার পছন্দ নয়। অত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে চাইনা পান্নুদি।

আমার কথা শুনে পান্নুদিদি মন্তব্য করেছিল, ভীতু কোথাকার?

আমি চিরকালের ভীতু। মনটা আমার ওদের মত সাহসী ছিল না কোন কালেই। কোন দুর্ঘটনার সংবাদ শুনলেই বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করত। এখনও সেই অবস্থাই রয়েছে। কোনদিনই আমার মনোবল বেশী ছিল বলে দাবী করতে পারিনি। পান্নুদিদি এরকম মন্তব্য করলে চুপ করে থাকতাম, কোন উত্তর দিতাম না।

পান্নুদিদি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গল্প বলত। অবশ্য বেশির ভাগই ছিল মনগড়া। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস পড়েছি। অংশগ্রহণকারীদের কাছে ঘটনার টুকরো টুকরো অংশ শুনেছি, পুলিশের রেকর্ড থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও পেয়েছি। এসবের সঙ্গে পান্নুদিদির গল্পের অমিল অনেক হলেও, তখন পান্নুদিদির কাছে শোনা ঘটনা বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এটা না স্বীকার করে পারছি না। সূর্য সেন, গনেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতির অমিত বিক্রম, দুর্জয় সাহস ও দেশপ্রেমের গল্প শুনে গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠত। খুব মনোযোগ সহকারে সব শুনতাম।

একদিন বললাম, গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে এসব স-হিংস আন্দোলন কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে।

পান্নুদিদি মত বদলেছে। আগের মত গান্ধীজির নামে গদ গদ হয় না। আমার কথার পিঠে কথা বলল পান্নুদিদি, লবণ তৈরী করে চরকা কেটে কস্মিনকালেও দেশ স্বাধীন হয় না তা দেশের লোক

বুঝেছে গত তিন বছরে। ইংরেজের হাতে আছে বন্দুক, আমাদেরও হাতে তুলে নিতে হবে বন্দুক। সমানে সমানে লড়াই করতে না পারলে জমবে কেন, কিভাবেই বা মোকাবিলা করা যাবে। ইংরেজ সহজে কি এদেশ থেকে যাবে। যুদ্ধ করে শত্রু তাড়াতে হবে।

কে আমাদের শত্রু ?

ইংরেজ। ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে নিজের দেশে। জানিস ইংরেজের দেশে সারা বছরের তিন মাসের খাবারও উৎপন্ন হয় না, বাকি নয় মাসের খাবার আমাদের দেশ থেকে যায়। আমরা যদি খাবার না দেই ওদের অনাহারে মরতে হবে।

বললাম, ইংরেজ যখন এদেশে আসেনি তখন কি ওরা না খেয়ে থাকত ?

খেতে পেতনা বলেই তো ওরা বের হয়েছিল ঘর থেকে। যাদের ঘরে খাবার থাকে তারা কি কখনও ঘর ছেড়ে বের হয়। ওদের ঘরে খাবার ছিল না বলেই তো সাগর পাড়ি দিয়ে অন্যের দেশে এসেছিল লুটেপুটে খেতে। আমাদের গলায় ফাঁস আটকে রেখেছে বলেই এত অত্যাচার আর শোষণ সহ্য করছি।

আমরা স্বাধীন হলে এসব অত্যাচার আর শোষণ থাকবেনা, এই তো তোমার কথা।

হাঁ। কেন থাকবে অত্যাচার আর শোষণ। এ-দেশের কোটি কোটি লোক থাকে অনাহারে, খাবার নেই, বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজার স্থান নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, রোগে ওষুধ নেই। আমরা স্বাধীনতা পেলে এসব সমস্যা আর থাকবে না। আমরা আমাদের সমস্যা মেটাব তখন। ইংরেজকে তাড়াতেই হবে।

বললাম, তোমার কথাই ঠিক পান্নুদি। পরাধীন জীবন যে দুর্বিসহ এটাও ঠিক কিন্তু ইংরেজ তাড়াবার পথ যে কোনটা তা ভেবে পাচ্ছি না। গাঁজার দোকানে পিকেটিং করলে ইংরেজ কি পালাবে ?

কিম্বা দু একটা সাহেব মারলে ইংরেজ পালাবে? ঠিক বুঝতে পারছি না পানুদি।

পানুদিদি চুপ করে গেল।

এ রকম আলাপ আলোচনা প্রায়ই হত। কোন সময়েই পানুদিদি নির্দিষ্ট কোন মত শোনাতে পারত না। এটাও ঠিক ওটাও ঠিক অর্থাৎ কোনটাই সর্বাঙ্গীন ঠিক নয়। এটাই যেন তার মতবাদ। দুটোরই প্রয়োজন আছে। একদিকে আঘাত আরেক দিকে তোষণ। এটাই বোধহয় পানুদিদি বুঝাতে চাইতো।

পানুদিদির ঘরে মাঝে মাছে সত্য সরকারকে দেখতাম। সত্য সরকার চুপি চুপি আসত। ফিস্ ফিস্ করে কথাবার্তা বলত। আমাদের দেখে থেমে যেত। সত্য সরকারের সঙ্গে কখনও কখনও আসত দীনেশ দাস আর অমিয় তরফদার। সে সব দিনে আমি আর বসন্তলাল আসরে জুটতাম। বেশ আলোচনা সভা বসত। দেশ উদ্ধারের নানা কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা হত। আমরা সব না বুঝলেও মোটামুটি বুঝেছিলাম, যে কোন উপায়ে ইংরেজকে তাড়াতে হবে।

আরও কটা বছর কেটে গেছে।

আমরাও স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি।

আবহাওয়া খুব খারাপ। নতুন নতুন খবর আসে। বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গাঁজা-মদের দোকানে পিকেটিং নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। গান্ধী-আরউইন প্যাকট্ হয়েছে। থানার বড় দারোগাকে আর ছুটোছুটি করতে হয় না, তবে নিত্যকার মত আই-বি ইনেস্‌পেকটার নীরদবরণকে মাঝে মাঝেই থানায় যাতায়াত করতে দেখতাম।

গাঁজা-মদের দোকান থেকে পিকেটিং তুলে নেওয়াতে আমাদের মুসলমান সহপাঠীরা ঠাট্টা করত। তারা বলত, গাঁজা বয়কট করলে তোদের দেবাদিদেব মহাদেবের পেট ফুলবে। তোদের অধর্ম হবে।

গাঁজার দোকানের সম্মুখে যে রাস্তা সেটা দিয়েও হাঁটিস না যেন। আর মদের দোকান? ওতো কারণ। হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিস না ভাই। মা কালীর পূজা হবে কি দিয়ে? তোদের নেতাদের গলা ভিজবে কেমন করে? তোরা যা পারিস না আমরা তা পেরেছি। তোদের ধর্মরক্ষা করতেই তো আমরা পিকেটিং করিনি।

কেমন গোলমাল হয়ে যেত। ব্যঙ্গটা বুঝেও চুপ করে যেতাম।

আরেকজন মুসলমান সহপাঠীকে জাতীয়তাবাদ বোঝাতে গিয়ে বেকুব হতে হয়েছিল। বন্ধুটি বলেছিল, তোদের মত আমরা যখন এগিয়ে যাব শিক্ষাক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষেত্রে, তখন আর বলতে হবে না। আমরা হলাম বাদশাহের জাত। আমরা বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে জানি, তার জন্য গাঁজার দোকানে পিকেটিং করতে হবে না। দেখবি মুসলমান তার কৌমের প্রেস্‌টিজ কি করে বজায় রাখে।

এসব পুরানো দিনের বিভিন্ন মতের ঝগড়া লিখতে বসিনি। আজ পানুদিদির কাহিনীটাই বলব। পানুদিদি তো একক সত্বা নয়, তার সঙ্গে অনেক ভালমন্দ জড়িয়ে আছে। ফেলে-আসা দিনের ছবিগুলো মনের কোনায় ভেসে উঠলেই তখন আত্মহারা হয়ে যাই। পানুদিদির ছাপটা বড়ই গভীরে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার জীবনের অনেক উত্থান-পতনের ঘটনা। পানুদিদির কথা মনে হলেই অনেক সাইড টক্ করতে হয়, তবুও মনে হয় পানুদিদির জীবন আরম্ভ তার বিয়েকে কেন্দ্র করে। কবে যে পানুদিদির প্রভাব আমার জীবন থেকে লোপ পাবে তা বলা সম্ভব নয়।

কলেজে পড়ি।

ছুটিতে বাড়ি এসেছি। বসন্তলালের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে গেছি। সেদিন বসন্তলাল কি যেন বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না।

হঠাৎ বলল, বড়দির বিয়ে।

আগ্রহ নিয়ে বললাম, কবে রে, কবে?

দিন ঠিক হয়নি। আজ বরপক্ষ আসবে সন্ধ্যার গাড়িতে। দিন ঠিক হবে। পাকা দেখা হয়ে গেছে।' কাউকে যেন বলিস না। ভাংচি দেবার লোক তো কম নেই। এগার জায়গায় কথা হয়েছে, কথা ভেঙ্গেছে বেনামী চিঠিতে। এবার এ্যার টাইট্, স্পীক্ নট্।

আমি খবরটা দাঁতে দাঁত চেপে গোপন করে রেখেছিলাম।

অগ্রহায়ণের শেষে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। নেমতন্ন চিঠি বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছে। এই বিয়ের সাতদিন আগে বাড়ি এসেছি। বসন্তলালও এসেছে। তখন আর গোপন করার কিছুই নেই। সবাই জানে। বসন্তলালদের বাড়িতে কর্মব্যস্ততা। সবাই বিয়ে নিয়ে মত্ত।

আমি এসেছিলাম পানুদিদির চিঠি পেয়ে। ছোট্ট চিঠিখানায় পানুদিদি লিখেছিল, শুনছি সাতাশে অগ্রহায়ণ আমার নাকি বিয়ে। তুই বিশ তারিখের মধ্যে আসবি।

পানুদিদি চিঠি পেয়ে এসেছি অথচ পানুদিদির সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। প্রথমদিন আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলেছিল, ভালই হল। তা হলে এসেছিস ননা।

আমি হরবর করে কিছু বলার আগেই পানুদিদি পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

বিয়ের তিন দিন আগে পানুদিদির এতেলা পেয়ে ছুটে গেলাম।

পানুদিদির নীচুগলায় বলল, হ্যাঁরে ননা, সত্যদার সঙ্গে তোর দেখা হয়?

দুদিন দেখা হয়েছে।

একটা কাজ করতে পারবি?

কি কাজ?

সত্যদাকে একবার আমার কাছে ডেকে আনতে পারবি?

তা কেন পারব না। এখুনি যাচ্ছি। তবে সব সময় সত্যদা

তো এক জায়গায় থাকে না। একেবারে খরগোস। এই এখানে, ঐ সেখানে। পায়ে যেন চাকা লাগানো। খুঁজতে হবে আরকি!

পান্নুদিদি খুশ মেজাজে বলল, তাই হয়। যারা দেশের কাজ করে তাদের ঐ রকমই ছুটতে হয়। তোকে এই ধাবমান অশ্বকে ধরে আনতে হবে।

পান্নুদিদিকে খুশী করতে আমি টাট্টু ঘোড়ার মত ছুট দিলাম।

সত্য সরকারকে আবিষ্কার করলাম অমিয় তরফদারের বাসায়। সত্যদা আর অমিয় তরফদারের ছোট বোন বিমলা কি যেন গভীরভাবে আলোচনা করছিল। আমাকে দেখেই সত্যদা বলল, কি খবর ননা?

পান্নুদিদি তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে।

সত্য সরকার উদাসভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই কথা। আচ্ছা যাব।

এখুনি চল।

এখন সময় নেই। কাল পরশু সময় করে দেখা করব।

আমি সংবাদ বাহক। এরপর আমার কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। আমি ফিরে এসে পান্নুদিদিকে সংবাদ পৌঁছে দিলাম।

পান্নুদিদির মুখের চেহারা পাল্‌টে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাইতো। আচ্ছা। কাল সকালে একবার আসিস ননা। তখন একটা কাজ করে দিস। কেমন?

বললাম, আচ্ছা।

সত্য সরকার ছিল মেয়ে মহলে ফিস্‌ফিস্‌বাজ স্বদেশী করা লোক। আমাদের বলত, নারী জাগরণ না হলে দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। সেজন্য মহিলা সমিতি গড়তে চেষ্টা করছি।

আমরা বিশ্বাস করতাম, আবার করতামও না। সত্য সরকারকে দেখেছি তার স্বদেশী করা বন্ধুদের সেয়ানা বোনদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে। তাই সত্য সরকারের ওপর আমার ব্যক্তিগত

কোন আস্থা ছিল না, তবুও প্রতিবাদ করতাম না। সত্যদা যুব সমাজের একটা অংশের ছোটখাট নেতা। তার মুখের ওপর কিছু বলতে ইতস্তত করতাম।

পরদিন সকাল বেলায় পানুদিদির কাছে যেতে পারিনি। খুব সকালে মা ডেকে বললেন, দীনেশ দাসের বাড়ি তল্লাস করছে পুলিশ।

কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। দীনেশ দাস সত্য সরকারের সহকর্মী। গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে সত্য সরকারের সঙ্গে ছয়মাস জেল খেটেও এসেছে। দীনেশ দাস মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতেও এসেছে, পানুদিদির কাছেও যেত। হয়ত সত্য সরকারের বাড়িও তল্লাস হচ্ছে, হয়ত পানুদিদির বাড়িতেও তল্লাসী চলছে। কোন কিছু না বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তলালের ডাকাডাকিতে উঠতে হল।

কানের কাছে মুখ রেখে বসন্তলাল বলল, দীনেশ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। সে নাকি বিপ্লবী।

বিপ্লবী শব্দটা বহুবার শুনেছি। বিপ্লবীকে নিজের চোখে দেখিনি। বিপ্লবী কেমন হয় তা জানতাম না। দীনেশ দাস সাক্ষাৎ বিপ্লবী শুনে মনটা দমে গেল। বিপ্লবীর যে ছবি মনে ছিল তা ঝাপসা হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে কি ?

না। তবে এবার আমাদের টার্ণ।

কেন ?

জানিনা। তোকে বড়দিদি যেতে বলেছিল। যাসনি কেন ? তোকে ডাকতে পাঠিয়েছে। চল।

সাহসে ভড় করে বের হলাম।

সোজা গেলাম পানুদিদির কাছে।

পানুদিদি ছোট্ট খামে মোড়া একটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে

বলল, এটা সত্যদাকে চুপি চুপি দিবি, পারবি তো? জানাজানি যেন না হয়।

নিশ্চয় পারব।

বলেই পান্নুদিদির চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপল। চিঠিখানা অতি সন্তর্পণে খুলে ফেললাম। নিভৃতে একটা গাছতলায় বসে পড়লাম। চিঠির সব কথা আজ মনে নেই, তবে মূল কথা হল, এখনও সময় আছে। সত্য সরকারকে অনুরোধ করেছে কোন একটা ব্যবস্থা করতে যাতে এ বিয়ে না হয়। আরও অনেক কথা ছিল তাতে। তিন পৃষ্ঠার চিঠি। হাবিজাবি কত কি যে লিখেছে। দুত্তোর। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝলাম, এগারটা জায়গায় বিয়ের কথা ঠিক হবার পর পান্নুদিদির যে বিয়ে ভেঙ্গেছে তার মূলে রয়েছে পান্নুদিদি স্বয়ং। বেনামী চিঠিগুলোর লেখক স্বয়ং পান্না ল্যাহিড়ি।

চিঠি পড়ে আবার তা মুড়ে খামে ভর্তি করে খামের মুখ বন্ধ করে গেলাম সত্য সরকারের সন্ধানে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পেলাম অমূল্য বাগচির বাড়িতে। পেছনের একটা গোপন ঘরে বসে সত্য সরকার কি যেন লিখছিল। চিঠিখানা দিলাম তাকে। সত্য সরকার চিঠিখানা পড়ে আবার মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে হবে কি?

শুকনো হাসিতে মুখ ভর্তি করে সত্য সরকার বলল, না। যা বলার আমি-ই বলব।

আমার কোন বক্তব্য থাকতে পারে না, বাহক মাত্র এবং বিষয়বস্তু আমার অজ্ঞাত মনে করা যেতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই। আমি নীরবে উঠে গেলাম। পান্নুদিদিকে বলে এলাম, চিঠি যথাস্থানে দিয়ে এসেছি।

পান্নুদিদি বলল, চিঠি পড়েছে কি?

হাঁ। আমার সামনেই খাম খুলে চিঠি পড়েছে।

কিছু বলল ?

না। বলল, যা বলার আমি-ই বলব।

পানুদিদি মুষরে গেল।

তবুও পানুদিদি বোধহয় সত্য সরকারের পথ চেয়ে বসেছিল। কিন্তু সত্য সরকার পানুদিদির সঙ্গে আর দেখা করেনি। বিয়ের নেমতন্ন রক্ষা করতেও আসেনি।

বিয়ের দিন এসে গেল।

আমরা খুবই ব্যস্ত। মহকুমার ছোট শহরে কলকাতার মত তো প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়না। ইলেকট্রিকও ছিল না। সেখানকার বড় কাজ ছাঁদনা বাঁধা, বিয়ের বাজার করা। বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়ন করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নিজেকে এই কাজে ডুবিয়ে দিয়েছি। পানুদিদির সঙ্গে দেখাই হয় না। পানুদিদিও আমার কাছে যেচে এসে কোন কথাই বলে না।

বিয়ের দিন সকাল বেলায় পানুদিদি বলল, একবার সত্যদার কাছে যাবি ?

বললাম সত্যদা নাকি শহরে নেই।

কি করে জানলি ?

শহরে পোস্টার দিয়েছে। নবীপুরে কৃষক সভা। সত্যদা প্রধান বক্তা। সত্যদা নবীপুরে গেছে।

পানুদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ফর্সা মুখখানা লাল টক্‌টকে হয়ে গেছে। চোয়াল দুটো কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে। নিজের মনেই বলল, আজই নবীপুরে যেতে হল আরও তো অনেক দিন ছিল যাবার মত।

শীতকালের সকালে ঘেমে উঠেছিল পানুদিদি। আমি অবাক হয়ে পানুদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পানুদিদির চোখ দুটো

চক্‌চক্‌ করছিল। হঠাৎ কি যেন হল। পানুদিদি ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে পানুদিদি বলল, শোন ননা, সত্যদার সঙ্গে দেখা হলে বলিস সেই হাঁড়িটা আমাদের খিড়কি পুকুরের উত্তর দিকে যে কাঁঠাল গাছ, তারই গোড়ায় পোঁতা আছে।

আমি কিছুই না বুঝে বললাম, আচ্ছা।

হাঁড়ি! কিসের হাঁড়ি! কেমন একটা সন্দেহ হল। কোন গুপ্তধন হাঁড়িতে রাখা আছে। মনের মধ্যে বারবার পাক খেতে থাকে অদৃশ্য সেই হাঁড়িটা।

বেলা দুটোর সময় বর এল।

ছুটে গেলাম বর দেখতে।

বরের পরিচয় সামান্য ছিল নেমতন্নপত্রে। পুরো পরিচয় এমন কি বরের বাসস্থানের ঠিকানাও ছিল না। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী মুরলীধর চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীমান মনোমোহনের সহিত আমার প্রথমা কন্যা ইত্যাদি। নৃপেনকাকা বিয়েতে ভাংচি দেবার ভয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে নেমতন্নপত্র ছেপেছিলেন।

এবার পরিচয় পেলাম। সবাই বলছে, বর দেখতে ভাল, কাজ-কর্ম ভাল, অর্থ সম্পদ ভাল, পানুদিদি সুখেই থাকবে। সবার কথা শুনে মনে মনে আনন্দিত হলাম।

পানুদিদির সঙ্গে দেখা হতেই হাসতে হাসতে বললাম, জামাইবাবু বেশ দেখতে। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমন লম্বা চওড়া। তবে গায়ের রং তোমার মত নয় পানুদি।

পানুদিদি কোন জবাব দিল না, উৎসাহ দেখাল না, এমন কি নববধুর সলাজ হাসিও দেখলাম না তার মুখে। অসম্ভব গম্ভীর মনে হল তাকে।

বিয়ে বাড়ি তখন লোকজন ভর্তি। হ্যাজাক লাইট জ্বলছে

গোটা বাড়িটায়। সানাই বাজছে। দেশী ঢোল কাড়াও বাজছে। উৎসব মুখর সবাই। এমন সময় বসন্তলাল ছুটে এসে আমার কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে বলল বড়দি তোকে ডেকেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে ?

তা জানিনা। বড়দির মনের কথা জানব কি করে। চল শীগগীর চল। বিয়ে তো মাঝ রাতে। এখনই দিদি কোন ফরমাইস করবে। হয়ত শেষ ফরমাইস। এবার আমাদের ফরমাইস খাটাও শেষ হবে। এরপর তো বড়দির সঙ্গে খুব বেশি দেখা হবে না। সেই হবিগঞ্জ, বাপরে বাপ্, সে কি এখানে। বাবার যে কি, এত জায়গা থাকতে সেই ধাপ্ধারা গোবিন্দপুর। আর কোথাও বুঝি পাত্র ছিল না। চল, শীগগীর চল।

বসন্তলালের সঙ্গে ভেতর বাড়িতে গেলাম। পানুদিদি একাই ছিল ঘরে। তখন তাকে নববধুর সাজে সাজানো হয়নি। হলুদ ছোপানো লালপেড়ে শাড়ী পরণে।

আমরা উপস্থিত হতেই পানুদিদি বসন্তলালকে বলল, তুই যা। ননার সঙ্গে কটা কথা আছে। তোর শুনে কাজ নেই।

বসন্তলাল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পানুদিদি দরজা বন্ধ করে দিল। বুঝলাম কথাটা অতীব গোপনীয়।

আমি তার কথা শোনার জন্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পানুদিদি আমার হাত দুটো টেনে কাছে নিয়ে বলল, আজ আমার মরণ তাই তোকে ডেকেছি।

পানুদিদি যে কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে বোকার মত তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্রমেই পানুদিদি আমাকে কাছে টেনে নিতে থাকে। ধরা ধরা গলায় বলল, এ-বিয়েতে আমার মত নেই রে ননা। ওরা জোর করে আমার বিয়ে দিচ্ছে। আমার মরাই উচিত।

বলতে বলতে পানুদিদি আবেগের সঙ্গে আমাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল।

সত্যদাকে বলিস। কেমন!

আমি তখন যৌবনের প্রথম অধ্যায়ের পাঠ নিয়েছি। নারী-দেহের স্পর্শ যে পাগল করে তোলে তা আগে জানা ছিল না। সেই দিনই প্রথম অনুভূতি জাগল আমার মনে ও দেহে। আমার পুরুষ সত্ত্বা আমাকেও যেন উন্মাদ করে তুলতে থাকে।

কোন রকমে পানুদিদির হাত ছাড়িয়ে বললাম, হাঁ বলব।

তাকে বলিস, আমি মরব না। তার মত বেইমানকে আমি কখনও ক্ষমা করব না।

দরজায় ধাক্কা পড়তেই পানুদিদি দরজা খুলে দিল। পাড়ার দুটো মেয়ে এসেছে পানুদিদিকে বিয়ের সাজে সাজাতে। পানুদিদি তাদের দেখে একটু হাসল।

এ হাসি আমি চিনি।

আমি তখনও হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। পাশের বাড়ির সুমিতা-দিদি আমাকে দেখে বলল ননা তুই এখানে। তোকে নৃপেনকাকা খুঁজছে।

আমি যেন বাঁচলাম।

কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। এতক্ষণে আমি যেন আমাকে ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

এরপর পানুদিদিকে দেখলাম বিয়ের পিঁড়িতে। সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। সাজগোজ করলে পানুদিদিকে এত সুন্দর দেখায়? বসন্তলাল ও আমি অন্য কয়েকজনের সঙ্গে সাতপাক ঘুরিয়ে পানু-দিদিকে ছাঁদনা তলায় বসিয়ে দিলাম। পুরুতমশাই তখন মন্ত্রপাঠ করছেন। পানুদিদিকে মনে হল পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তি।

পরদিন আমি বাসী বিয়ের সময় হাজির হতেই পানুদিদি ইসারা

করল। বুঝলাম পানুদিদি কিছু বলতে চায়। সময়মত দেখা করতে হবে।

পানুদিদিকে নিরিবিলি পেলাম স্নানের আগে।

হেসে বললাম, জামাইবাবু লোকটা বেঁশ মাই ডিয়ারী লোক।

পানুদিদি চোখ পাকিয়ে বলল, একটা পশু।

না বুঝে বললাম, কি যে বলছ তুমি।

কিছুকাল পরে বুঝবি। আজ আমি চলে যাব। তুই হাঁড়িটার কথা সত্যদাকে বলিস। ভুলিস না যেন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

বিকেলবেলায় সিরাজগঞ্জ যাবার গাড়িতে পানুদিদিকে তুলে দিয়ে এলাম। গাড়ি চলা শুরু হতেই তাকিয়ে দেখি জানালার দিকে মুখ করে পানুদিদি মাঝে মাঝে চোখ মুছছে।

এসব ঘটনার জন্য পানুদিদির বিয়ে এমন কিছু বিরাট নয়। পরের ঘটনাগুলোই পানুদিদির বিয়েকে আমার মনে দোলা দিয়ে আসছে আজও। যেমন নিম্নবিত্তের হিন্দু বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়ে থাকে পানুদিদির বিয়েতে তাই হয়েছিল। নতুনত্ব কিছু ছিল না।

পানুদিদি সত্য সরকারকে ভালবাসত।

সত্য সরকার অন্তত ভালবাসার অভিনয় করত। অথবা সমাজের চোখ রাঙ্গানীকে এড়িয়ে চলতে সত্য সরকার পানুদিদিকে চিরকালের জন্য এড়িয়ে গেছে। তবে সত্য সরকারকে পরবর্তীকালে যেভাবে পেয়েছি তাতে তার ভালবাসা যে নিছক মৌখিক তা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

সেদিন পানুদিদির স্পর্শ আমার দেহ ও মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, রক্তের উষ্ণতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেটাও ভুলে যাবার কথা নয়।

পানুদিদি কেন যে 'পশু' বলেছিল তাও ভেবে ঠিক করতে

পারিনি। আজ বুঝতে শিখেছি, তাই পান্নুদিদিকে বিশ্লেষণ করতে পারছি। আজ আর মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

বিয়ের হাঙ্গামা মিটল।

সামনে বড়দিনের ছুটি।

বসন্তলালকে বললাম, পান্নুদি একটা গোপন কথা বলে গেছে, তোকে বলা দরকার মনে করছি। কাউকে বলিস না যেন।

বসন্তলাল বলল, যদি বিশ্বাস না করিস তা হলে বলিস না।

নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

বসন্তলালকে হাঁড়ির সংবাদ দিলাম।

আমার কথা শেষ হতেই বসন্তলাল বলল, ওটা দেখতে হবে।

বললাম, আমারও সেই ইচ্ছা। আজ রাতেই।

সেই রাতে চুপি চুপি দুজনে কাঁঠাল গাছের গোড়া খুঁড়ে হাঁড়ি বের করলাম। হাঁড়ির মুখটা বেশ ভাল করে বন্ধ ছিল। ঢাকনা খুলেই তাজ্জব হয়ে গেলাম।

একটা রিভলবার আর ছয়টা কার্তুজ। সঙ্গে রূপোর একশত কুড়িটি টাকা।

পান্নুদিদির জিম্মায় সত্য সরকার এই সব বস্তু রেখেছিল। পান্নুদিদি নিরাপদ স্থানে ওগুলো পুঁতে রেখেছিল। সত্য সরকারকে খবর দিয়েও যখন দেখা পেল না তখন আমাকে জিম্মাদার করে বলে গেছে।

বস্তুগুলো দেখেই আমার মত জিম্মাদারের বুকের রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকে। বললাম, তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দে বসন্ত। কেউ দেখলে শ্রীঘর বাস নিশ্চিত।

বসন্তলাল বলল, দিচ্ছি। আগে কটা টাকা বের করে নেব।

পরের টাকা!

হোক পরের টাকা। এতটা মেহনত করলাম তার মজুরী নিতে হবে।

বসন্তলাল কয়েকটা টাকা বের করে নিল। হাঁড়িটাকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এলাম। যেন বাঁচলাম।

পরের দিন পান্নুদিদির নির্দেশ মত সত্য সরকারকে খবর দিলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এই প্রথম রিভলবার দেখলাম। তাও ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখার সাহস ছিলনা সেদিন। কোন রকমে ওটাকে মাটিতে পুঁতে রেখেও ভয় কাটছিল না।

এসব আমার নিজস্ব ব্যাপার।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তিনদিন পরে।

রাতের বেলায় অমিয় তরফদার ও অবিনাশ কর্মকার যখন কাঁঠালগাছের তলা থেকে সেই হাঁড়ি খুঁড়ে তুলছিল তখন পুলিশ তাদের ঘেরাও করে, বমাল গ্রেপ্তার করে।

সকাল বেলায় খবরটা শুনে আমি ও বসন্তলাল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকি।

ঘটনাটা জানতাম আমি, বসন্তলাল আর সত্য সরকার। আর জানে পান্নুদিদি। পুলিশের পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয়। কেউ খবর না দিলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারত না নিশ্চয়ই। কেমন সন্দেহ জাগল আমাদের মনে। ভাবলাম, বসন্তলাল তো এই অপকাজ করেনি। আবার বসন্তলালও হয়ত ভাবছে, ননা এই অপকাজ করেনি তো!

কারও পক্ষেই এটা সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে এই ঘটনা ঘটবে, এটা আমাদের তুজনের জানা থাকা মোটেই সম্ভব নয়। তা হলে কি সত্য সরকার?

ভাবছি, কে এই বেইমান! এই প্রশ্ন আমার মনে বার বার উঁকি দিতে থাকে। আমরা তুজন যুক্তিতর্ক দিয়ে স্থির করলাম, সত্য

সরকার ভিন্ন আর কেউ-ই এ কাজ করতে পারে না। এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যখন বসন্তলালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে।

বসন্তলালকে কেন গ্রেপ্তার করেছিল তা আজও কেউ জানে না। তবে সুদীর্ঘ তিনটি বছর তাকে অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল বিনা অপরাধে।

মাঝে মাঝে সত্য সরকার আমাদের কয়েকজনকে ডেকে সারগর্ভ বক্তৃতা দিত। ইংরেজ কি ভাবে আমাদের দেশকে শোষণ করছে, কি রকম অন্যায় অত্যাচার করছে তার ফিরিস্তি শোনাত। নানা দৃষ্টান্ত নানা ভঙ্গিমায় তুলে ধরত আমাদের সামনে। আমরা মনোযোগ সহকারে শুনতাম। কোন মতামত দিতাম না।

সত্য সরকার বলত, বিপ্লব চাই। বিপ্লব না হলে ইংরেজ এদেশ থেকে কখনই যাবে না।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি রোজই বিপ্লবের কথা বলে থাক। আচ্ছা সত্যদা, বিপ্লব বলতে তুমি কি বুঝাতে চাও।

সত্য সরকার চোখ বড় বড় করে বলেছিল, বিপ্লব বুঝিস না। তোরা তো লেখাপড়া শিখছিস অথচ বিপ্লব জানিস না। আরে শহীদ ক্ষুদিরামের নাম শুনেছিস তো। সেই ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী। ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবী হতে হবে, বিপ্লব হল সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। সোজা কথায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া। আমাদের সেই কাজ করতে হবে।

মনে মনে হাসলাম। সত্য সরকার নিজেই জানে না বিপ্লব কাকে বলে। এরজন্য সত্য সরকার দায়ী নয়। যারা এদেশে বিপ্লবের প্রবক্তা তারাও হয়ত জানে না বিপ্লব বলতে কি বুঝায়।

আগে বসন্তলালের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। এখন বসন্তলাল নেই। আজকাল মাঝে মাঝে টেনি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করি। টেনি চক্রবর্তী ম্যাট্রিক পাশ করতে না পেরে স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। খদ্দরের মোটা

ধুতি সার্ট পরে। তবে সব সময়ই আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। গা বাঁচিয়ে চলা তার রীতি। গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার সময় টেনি চক্রবর্তী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করত, কখনও নিজে এগিয়ে যেত না। আজকাল টেনি চক্রবর্তী হয়েছে তাত্ত্বিক, তথাকথিত জাতীয়তা-বাদী পত্রিকা ফেরী করে, আমাদের মত মূর্খজনকে তত্ত্ব শেখায়।

সত্য সরকারের বিপ্লব যে কি বস্তু বুঝতে না পেরে টেনি চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সত্যদার বিপ্লবটা কি তা বুঝেছ টেনি?

টেনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন? এর মধ্যে না বুঝবার মত কিছু নেই। কোনটা কঠিন কথা?

কথাটা কঠিন নয়, কিন্তু অর্থটা বড় গোলমেলে।

দেখ ননা, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমাদের হাতিয়ার সংগ্রহ করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। তারজন্য জেল-ফাঁসি হাসিমুখে সহ্য করতে হবে।

টেনি চক্রবর্তীও আমাকে তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিল।

বললাম, সব বুঝলাম। ওসব আমার কাজ নয়। আমি জেল ফাঁসিকে বড়ই ভয় করি। তবে তোমরা যদি পথ দেখাতে পার তাহলে একবার ভেবে দেখতে পারি। মনে হচ্ছে, বিপ্লব করা আমার কাজ নয়, সম্ভবও নয়।

কেন, কেন?

তোমাদের হাতিয়ার চাই, টাকা চাই। টাকা সংগ্রহ করছ ডাকাতি করে। দেশের লোক তোমাদের টাকা দেয় না।

যাদের টাকা আছে তারা কি টাকা দেয় কখনও?

ভাল কাজে, দেশের কাজে, স্বাধীনতার জন্য টাকা দেবে না কেন? ওরা তা হলে স্বাধীনতা চায় না।

টেনি মুরুব্বীর মত বলল, অর্থবানরা ইংরেজের দালাল। ওরা কিছুতেই টাকা দেবেনা। জোর করেই টাকা আদায় করতে হবে।

সবাই যদি দালাল হয় তা হলে স্বাধীনতার জন্য কেউই আগ্রহী নয়। সবাই পরাধীন থাকতে চায়। আমি-তুমি এই দালালদের জন্য প্রাণ দেব কেন? আমি তো দেখছি, তোমাদের কাজে সবাই বাধা দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কাজ দেশের লোকদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে স্বমতে আনা। সে কাজ কতটা করতে পেরেছ? রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামেতিক হারে আর তোমাদের বিপ্লবীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে সেই অনুপাতে।

তাও তো কাজ করছি। করেছি বলেই আমাদের এই ছোট শহর থেকে আশীজন সত্যাগ্রহী জেলে গেছে?

বার হাজার লোকের শহরে আশীজন কত পারসেণ্ট টেনি? আইন অমান্য করে জেলে যারা গেছে তারা ফিরে এসে আবার আইন অমান্য করছে কি? আইন অমান্য করে যদি দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ণ সম্ভব হত তা হলে তোমাদের বিপ্লবের দরকার হত কি?

দুটোই দরকার। ইংরেজ জেলখানার খরচ চালাতে চালাতে হয়রাণ হয়ে যাবে। তখন বাপ্ বাপ্ বলে ইংরেজ পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যাবে।

হেসে বললাম, তোমার অর্থনীতির জ্ঞানটা দেখছি বেশ টনটনে। জেলখানার খরচ ইংরেজ লণ্ডন থেকে আনে না। আমাদের টাকা দিয়েই খরচ চালায়। যদি অসুবিধা হয় তাহলে নতুন করে ট্যাক্স বসিয়ে আমাদের পকেট কাটবে। আমার বিশ্বাস আইন অমান্যের প্রহসনে কোন লাভ হবে না।

টেনি চক্রবর্তী কিছুটা ভেবে বলল, আমারও সেই বিশ্বাস। তবে আর তো পথ নেই। ইংরেজকে মেরে হটানো তো সহজ কাজ নয়। অতশত বুঝি না। তবে বিপ্লব দরকার।

কাকে নিয়ে বিপ্লব করবে?

কেন? আমি তুই আরও সব ইয়ংম্যানদের নিয়ে। আমরাই তো দেশের ভবিষ্যত। আমরা সব কিছু পারি।

না, পারি না। এই তো তোমাদের সামনে প্রমাণ আছে। আইন অমান্য করে যারা জেলে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছাব্বিশজন আণ্ডারটেকিং দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওরা সারা জীবনে কোনকালেই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করবে না বলে দাসখত লিখে দিয়ে এসেছে, হয়ত বেশ কয়েকজন গুপ্তচরের কাজ হাতিয়ে নিয়েছে। এরা হুজুগে জেলে গিয়েছিল হুজুগ থেমেছে এবার ঘরের সুবোধ বালক হয়ে ঘরে বসে আছে।

নারে না। ওরা বুঝেছে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করলে দেশ স্বাধীন হবে না। মাষ্টারদার মত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাই কোন রকমে জেল থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবের প্রস্তুতি করছে।

হেসে বললাম তোমাদের সত্য সরকার বুঝি তাদের ট্রেনিং দিচ্ছে।

টেনি চক্রবর্তী বিরক্তির সঙ্গে বলল, সত্যদার মত ত্যাগী নেতা দেশের গৌরব। তবে নানা দল উপদল হয়েছে। সবাই তো সত্যদার দলের নয়।

বললাম, তা হলে কিছু লোক বেঁচেছে।

টেনি চক্রবর্তী বলল, মানে ?

সে কথা না-ই বা শুনলে। তবে তোমাদের বিপ্লব হবে না টেনি। যার মূলে গলদ তার মাথায় পাতা গজায় না। বিপ্লব আমি বুঝি না। দু একটা সাহেব মেরে বিপ্লব হয় না। ডাকাতি করে বিপ্লব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর নেই। আমাদের মত ইয়ংম্যান অনেক কাজ যেমন করতে পারে তেমনি তারা অনেক অনেক বেশি কুকাজ করতে পারে। তাই ইয়ংম্যানদের বিশ্বাস করা যেমন যায় না তেমনি তোমাদের মত স্বদেশীওলাদের আবার বিশ্বাস করি না।

টেনি চক্রবর্তী আমার বক্তব্যকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল তা জানা গেল কয়েকদিন পরে। আমি কলেজ হোষ্টেলে ফিরে যাবার

আগেই কানাকানিতে শুনতে পেলাম এর মধ্যেই টেনি চক্রবর্তী বাজারে চাউর করেছে, ননা একটা স্পাই।

অনেকে বিশ্বাস করল। যারা অন্যদলের তারা বলল, ননার মত কাওয়ার্ড আর নেই।

আমার সমর্থক দু চার জন জুটে গেল। এরা কেউ ইংরেজ ভক্ত নয় তবে তারা বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাজ করে। এইটুকুই বুঝেছিলাম। অযৌক্তিক কোন কিছু আমরা মেনে নেব না এটা হল আমাদের যুক্তি। বিপ্লবীদের চোখে আমার পজিশ্যনটা ভাল করেই বুঝলাম। সত্য সরকার জাতীয় বিপ্লবীদের যে চোখে দেখতাম তাও নিজের কাছে স্পষ্ট।

এবার কলেজের ছুটি হলেই বাড়িতে না এসে গেলাম মামার বাড়িতে। পদ্মার ওপারে মামার বাড়ি। নৌকায় পদ্মা পার হয়ে জলঙ্গীর ঘাটে এসে গরুর গাড়ি চেপে মামার বাড়ি পৌঁছলাম। পুরো একটা দিনের পথ অথচ দূরত্ব পঁচিশ তিরিশ মাইলের বেশি নয়। তখন তো আজকের মত পথঘাট চলাচল ব্যবস্থা ছিল না। সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাপ করা যেত না।

পদ্মার একটা খাড়ি মামাদের গ্রামের পাশ দিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। বর্ষাকালে খাড়িটা ভীষণ আকার ধারণ করত। গ্রীষ্মে খাড়ির মুখে চর জাগত, মূল নদীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকত না। খাড়ির জল তখন পুকুরের জলের মত নিস্তরঙ্গ। খাড়িতে থাকত প্রচুর মাছ। মামার বাড়িতে গেলেই খেপ্‌জাল নিয়ে প্রায় রোজই নেমে পড়তাম খাড়ির জলে। রোজই খালুই ভর্তি মাছ নিয়ে আসতাম। খয়রা মাছ পেতাম বেশি।

মামাদের গ্রামে মাত্র চার পাঁচ ঘর হিন্দুর বাস। বাকি সবাই মুসলমান। মামাদের দু শরীকের দুটো বাড়ি একই চত্বরে। যেদিন মাছ মারার ইচ্ছা থাকত না সেদিন বিকেলে খাড়ির কিনারায় গিয়ে বসতাম সূর্যাস্তের কিছু আগে। ডুবন্ত সূর্যের লাল আভাটা খাড়ির

জলে প্রতিবিম্বিত হত। আমি অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখতাম সেই আলোর ঝলমলানি। গ্রামের মুসলমান চাষীদের বউ ঝিরা খাড়ি থেকে জল নিয়ে যেত। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় খাড়িতে স্নান করে ভেজা কাপড়ে মাটির কলসী কাঁখে করে মেয়েরা ফিরে যেত নিজের নিজের ঘরে। তাদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হত রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি পংক্তি, "নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি," ভাবতাম, কবি নিশ্চয়ই বোটে করে বেড়াবার সময় ঐই মনোরম স্নিগ্ধ ছবি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

আমার কাছে মাঝে মাঝে এসে বসত জোলাপাড়ার নিয়ামত। আমার চেয়ে দু' এক বছরের বড় হবে। ছোটবেলা থেকেই নিয়ামতের সঙ্গে পরিচয়। মামার বাড়িতে গেলেই সবার আগে নিয়ামতের সন্ধান করতাম। আমি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম সে বছরেই নিয়ামত আমার কাছে প্রস্তাব করল, ননাবাবু আমাকে একটু পড়তে শেখাবে।

মামাদের গ্রামে তো কোন পাঠশালা ছিলই না, দশ মাইলের মধ্যে পাঠশালা বলতে সেই জলঙ্গী মাইনর স্কুল। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোক বলতে আমার মামাদের পরিবারের কয়েকজন। মুসলমানদের কেউই লেখাপড়া জানে না, জানার সুযোগও ছিল না।

নিয়ামত যখন লেখাপড়া শিখতে চাইলো আমি বললাম, বই কোথায়? বই কিনে আনতে হবে জলঙ্গীর হাট থেকে।

নিয়ামত খুবই দুঃখিত হল। তার পক্ষে পয়সা ব্যয় করে বই শ্লেট কেনা সম্ভব নয় তা বুঝেই বললাম, বেশ ঠিক আছে। আমি বই তৈরী করে দেব।

সেই দিনই কয়েক তা কাগজ নিয়ে বর্ণপরিচয়ের মত একটা বই তৈরী করলাম।

বিকেল বেলায় নিয়ামত আসলেই তাকে নিয়ে বসতাম অক্ষর জ্ঞান দিতে। নিয়ামত মেধাবী না হলেও পরিশ্রমী। সাত দিনের মধ্যেই

'অ' থেকে 'ঁ' পর্যন্ত মুখস্ত করে অক্ষরগুলো আঁকা বাঁকা লিখেছিল। আকার উকার আরম্ভ করেছিলাম। তখনও যুক্তবর্ণ অনেক দূরে। এরই মধ্যে ছুটি শেষ হতেই বলেছিলাম, এবার তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করবে। জলঙ্গী থেকে চার পয়সা দিয়ে একটা বই আর আড়াই আনা দিয়ে একটা শ্লেট জোগাড় করবে। যদি পূজার ছুটিতে এখানে আসি তা হলে তোমাকে এগিয়ে দিতে পারব। নইলে আসছে বছর পরীক্ষার পর যখন আসব তখন তোমাকে পড়াব।

নিয়ামত দুঃখিত হল। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। মামার বাড়ির পুরুষ মহিলা সবাই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে কিন্তু নিয়ামতকে লেখাপড়া শেখাবার মত একজনও ছিল না। আর পদ্মার চরে বসে পড়াবার মত শিক্ষক বোধহয় আমি একাই ছিলাম। ক্ষেত মজুরের ছেলে নিয়ামতের ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ ছিল না।

তারপর আরও কতদিন কেটে গেছে। বছরের পর বছর কেটেছে। নিয়ামতের পড়াশোনা কতটা এগোল তা জানি না। তবে নিয়ামত বিয়ে করেছিল। কয়েক বছর পর মামার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম নিয়ামতের কথা। নিয়ামত নিজেই এসে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল।

তার বউ চোদ্দ বছরের শ্যামবর্ণের একটা রোগা মেয়ে। হাতে তার দুগাছা রুপোর চুড়ি, নাকে রুপোর নোলক আর কানে রুপোর ঝুমকো। আমাকে দেখেই এমনভাবে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকেছিল তা মনে হলে এখন হাসি পায়। অজ্ঞ মুসলমান ঘরের মেয়েদের ছোটবেলা থেকে যা শেখানো হয় তার একটি হল দাসত্ব জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। সেদিন এর চেয়ে বেশি উন্নত মহান কিছু ভাবতে পারিনি। অসংযত পুরুষকে লাগাম দেবার কোন ব্যবস্থা যখন সমাজ করতে পারে না তখন সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে আঘাত করে, এক্ষেত্রেও তাই মনে হয়েছিল। তবুও সেই ছোট্ট মেয়েটার লজ্জানত মুখখানা

আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমার ছোট বোন নেই, থাকলে তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারতাম।

এবার মামার বাড়িতে এসেছি বিপ্লবীদের বিপ্লব শিক্ষা এড়াতে। নিয়ামতের সঙ্গে দেখাও হয়েছে কয়েকবার। নিয়ামত কেমন বদল হয়ে গেছে। আগের মত আন্তরিকতা যেন নেই। আগে রাতের বেলায় খাড়িতে নৌকা ভাসিয়ে নিয়ামত বাঁশী বাজাত। আমি বসে বসে শুনতাম। আমার কাছে সে-ও দেশ বিদেশের গল্প শুনত। বলত তাদের সমাজের নানা সমস্যার কথা। এবার যেন নিয়ামত আলাদা মানুষ।

মামার বাড়িতে থাকতে পারলাম না বেশি দিন। ফিরে এলাম বাড়িতে।

এসেই শুনলাম পানুদিদি এসেছে। সেই অগ্রহায়ণ মাসে পানুদিদি বরের সঙ্গে গেছে আর ফিরেছে এই আষাঢ় মাসে। বর্ষণ সবে চোখ পাকিয়ে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে।

পানুদিদির সঙ্গে দেখা করার খুবই ইচ্ছা। কেমন একটা লজ্জায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি। ক' দিন পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। সামনে টেস্ট, ঠিক পূজার পরে। অবশ্য কলেজ তখনও খোলেনি। বলতে গেলে পরীক্ষার তখনও এক বছর বাকি। তবুও হঠাৎ পাঠে মনোযোগী হয়ে উঠলাম। আজকাল বিকেলে খেলার মাঠে যাই না। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা তোফাজুল মিঞার আম বাগানের ধারে বসে থাকি। আমাকে যারা সমর্থন করে এমন যে দু' চারজন সঙ্গী ছিল তাদের কাছেও যেতাম না। আমার ছোট ঘরটাই ছিল আমার রাজত্ব। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামলে তাকিয়ে থাকতাম জানালা দিয়ে। আকাশের কান্না দেখতে খুবই ভাল লাগত।

সেদিন বুধবার। সারাদিন আকাশে ছিল কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছিল। মঙ্গলবার রাত থেকে বৃষ্টি। মা বললেন,

শনিতে সাত, মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। তিন দিন ধরে বৃষ্টি চলবে এই অনুজ্ঞা পেয়ে বর্তে গেলাম। তিন দিন ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে বইয়ের পাতা উল্টতে ভালই লাগবে।

এক নাগারে ঘণ্টা খানেক বৃষ্টি হয়ে থামছিল, নইলে টিপ্ টিপ করে পড়ছিল। আবার ঝমাঝম বৃষ্টি শুরু হচ্ছিল। এখন আর কোথাও যেতে হবে না। বেশ নিশ্চিন্ত। দর্শন শাস্ত্রের বই কখানা নাড়াচাড়া করছিলাম, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ। মুখ তুলে তাকালাম। পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে পানুদিদি। ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে পানুদিদি দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ছাতাটা একপাশে রেখে এগিয়ে এল আমার বিছানার কাছে।

পানুদিদি বিনা ভুমিকায় বলল, এসেই তোর খবর নিয়েছি। তুই তো শুনলাম মামার বাড়িতে গিয়েছিলি। কাল শুনলাম তুই এসেছিস। কদিন থাকতে পারব এখানে তার ঠিক নেই, তাই তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম।

পানুদিদির কথা শেষ হতে না হতেই ঝমাঝম বৃষ্টি আরম্ভ হল। তার কথাগুলো কিছুটা দূর থেকে হয়ত শুনতেই পেতাম না।

বললাম, আমাকে খবর দিলেই যেতাম। গেলবার রেজাণ্ট ভাল হয়নি। এবার যাতে রেজাণ্ট ভাল হয় তার চেষ্টা করছি।

আমাদের বাড়িতে, মানে বাবার বাড়িতে ডেকে পাঠালে নিরিবিলি কথা বলতে পারতাম না। তাই নিজে এলাম। তোর পড়ার ঘরটা বেশ নিরিবিলি। এখানে কেউ আসেও না। তোর দাদা তো এ পথই মাড়ায় না। তাই নিজেই এলাম অনেক দিন পর মন প্রাণ খুলে গল্প করতে, বুঝলি।

পানুদিদি আরও কিছু বলতে চেয়ে থেমে গেল। গম্ভীর তার মুখের চেহারা। চোখ দুটো ছল ছল করছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল।

আমি বললাম, তোমার হাঁড়ির খবর সত্যদাকে দিয়েছিলাম।

সেটা নিয়ে গেছে কি?

না। নিতে পারে নি। নেবার জন্য যাদের পাঠিয়েছিল তাদের হাতে নাতে ধরেছিল পুলিশ। হাঁড়িতে নাকি রিভলবার আর কার্তুজ ছিল।

মাথা নেড়ে পানুদিদি বলল, হাঁ। কিন্তু ওতে যে রিভলবার ছিল তা তো আর কারও জানার কথা নয়। জানতাম আমি আর সত্য সরকার। তুই জানতি কিন্তু কি আছে তাতো জানতি না।

মাথা নীচু করে বললাম, আমারও কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আমার বিশ্বাস তোমার সত্যদাই অমিয় আর অবিনাশকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। সত্যদা পুলিশের ইনফরমার। পুলিশের কাছ থেকে টাকা পেয়ে নিজের দলের লোকদের ধরিয়ে দিচ্ছে। বসন্তলালকে কেন গ্রেপ্তার করল বলতে পার? ঐ সত্য সরকার। তোমার ওপর শোধ নিতে বসন্তলালকে ধরিয়ে দিয়েছে। এবার আমার পালা। আমি অনেক কিছু জানি যা সত্য সরকারের মৃত্যুবান। আমাকে ঠিক আওতায় পাচ্ছে না। আমি সত্য সরকারকে যতটা চিনেছি ততটা তুমিও চিনতে পারনি পানুদি। এই সব নেতারা জওয়ান ছেলেদের 'বিপ্লব বিপ্লব' করে ময়দানে নামায় আর নিজের পকেট ভর্তি করতে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সত্য সরকার আমাকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি কারণ তার দলে আমি নাম লেখাইনি। বসন্তকে বলতাম, তুই সত্যদার কাছে যাস না। শোনেনি, এবার কষ্ট ভোগ করছে। আমি জেলে যেতে রাজি তবে অকারণে নয়। বীরের মত লড়াই করে, মেষের মত ঠেলতে ঠেলতে বহরমপুরে পাঠাবে তাতে আমি রাজি নই।

পানুদিদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যই আমি সত্য সরকারকে তোর মত করে চিনতে পারিনি। মানুষ চেনা তো সহজ কাজ নয়। চার দেওয়ালের মধ্যে আটক থেকে জীবনের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু ছিল। তখন স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করতাম। কল্পনায় সত্য সরকারকে

নিয়ে ঘর বাঁধতাম। এত বড় একজন ত্যাগী দেশপ্রেমিক! আহা! লেখাপড়া জানা লোক! তখন ভাবতাম, আমরা দুজন যদি কায়মনোবাক্যে দেশের জন্য নিজেদের নিবেদন করি তাহলে আমাদের বন্ধন হবে দেশের আদর্শ। যাক্ ওসব কথা। সত্য সরকার আমার কাছে মৃত। মৃত সত্য সরকারকে ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করি, মনে করি সত্য সরকার হল বেইমানীর প্রতীক ও প্রেতাত্মা। এরাই সর্বনাশ ডেকে আনবে এই দেশের। সাবধান থাকতে হবে ননা। ওর আওতায় গেলে নিষ্কৃতি নাই।

আমি কোন কথা না বলে হাসলাম।

আমার জীবনে বড় ট্রাজেডি হল আমার বিয়ে। বিয়ে ভাঙ্গানীর ঠেলায় গোপনে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা, আমাকেও কোন কিছু জানতে দেননি। নিজেও কোন খবর করেননি। এবার সময় পেয়েছি নিজের ওপর শোধ নেবার। আদর্শ, উচ্চাশা সব কিছু তলিয়ে গেছে অপ্রার্থিত একটা জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এই ক'মাসেই দেহ-মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারি।

বললাম, আমি তোমাকে কি পরামর্শ দেব? আমার মাথায় ওসব প্রবেশ করে না।

আমাকে একটা রিভলবার এনে দিতে পারিস?

আত্মহত্যা করবে বুঝি?

নারে বোকা ছেলে। রিভলবারটা আমাকে দিয়েই পুলিশে খবর দিবি। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করুক। পাঁচ বছর শ্রীঘর বাস করি। তা হলে আমি বাঁচতে পারব।

আমি অবাক হয়ে গেলাম পানুদিদির কথা শুনে। বললাম, এই দুটো কাজের একটাও আমি করতে পারব না পানুদি।

সত্য সরকারকে বলতে পারিস?

তাও পারব না। সত্য সরকারকে আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা

করি। তোমার সঙ্গেই বেইমানী করেনি পানুদি। অমিয় তরফদারের বোন বিমলা কোথায় গেছে জানো? নবদ্বীপে গেছে। সেখানে নাকি জারজ সন্তানদের জন্য আশ্রম আছে, সেখানে গেছে সত্য সরকারের সন্তানকে জমা দিতে।

বলিস কিরে?

হাঁ পানুদি। উড়ো খবর নয়। বিমলা নিজেই আমাকে বলেছিল। সত্য সরকার বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়ে শেষ অবধি তার সর্বনাশ করেছে। উপরন্তু সত্য সরকার একটা পাকা বিশ্বাসঘাতক। আমার মন্তব্য একটু রূঢ়, হয়ত সবাই বিশ্বাস করবে না। তার কথায় যে নাচবে সেই জেলখানায় পচবে আর সত্য সরকারের পকেট ভর্তি হবে। সত্য সরকার হল হাড়িকাঠ, যে মাথা দেবে তারই ঘাড়ে খড়গাঘাত অনিবার্য। এই রকম সত্য সরকারের সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব নয়। যেদিন এদের সংখ্যা জানা যাবে সেদিন আমার মত বোকা লোকদেরও গালে হাত দিয়ে ভাবতে হবে। যদি কোন দিন সত্যিই ইংরেজ চলে যায় সেদিন এর হিসাব প্রস্তুত হবে। ইংরেজ যাবে ঠিকই কিন্তু যাবার আগে সত্য সরকারের মত কয়েক হাজার চোর, শোষক, বেইমান, লম্পট তৈরী করে দিয়ে যাবে। এরাই তখন সমাজের মাথায় বসবে। দেশের দুর্দিনকে ডেকে আনবে।

পানুদিদি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনতে শুনতে বলল, এসব তো অন্যের কেচ্ছা। আমি কি ভাবে বাঁচব বলতে পারিস? আমি যেন বড়ই অসহায় হয়ে পড়েছি।

বললাম, তুমি নিজেকে অসহায় কেন ভাবছ পানুদি। শুনেছি মেয়েরা সব অবস্থা মানিয়ে নিতে পারে। তুমি-ই বা পারবে না কেন?

উত্তেজিতভাবে পানুদিদি বলল, আমি পারিনি। পারব না।

আচ্ছা, আমিই মানিয়ে নেব। কিন্তু সেই মানানোর চেহারাটা আলাদা হবে। দেখবি আমার কি দশা হয়েছে?

কথা শেষ করেই পানুদিদি পট্ পট্ করে ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলল। তার উন্মুক্ত বুকে হাত রেখে বলল, এই দেখ। পশু, পশু নির্মম নিষ্ঠুর জন্তু।

পানুদিদির গৌরবরণ বুকে কালো কালো আঁচড়ের দাগ। বুকের একটি দিকের স্তনমুলে কাঁচা ঘা। তখনও ঘা শুকোয়নি।

কামড়ে কি করেছে তা দেখছিস। আঁচড়ে কামড়ে আমার বুকটা ক্ষতবিক্ষত করেছে। আর কিছু তোকে দেখাতে পারব না। এরপর তোরা কি বলবি মানিয়ে নিতে। অন্য কথা আমি বলতে চাই না। সব কথা বলাও যায় না। একটা মেয়ে যখন লজ্জার মাথা খেয়ে এই ভাবে নিজেকে অপরের সম্মুখে তুলে ধরে তখন নিশ্চিয়ই বুঝতে পারছিস কত অসহ্য জীবন যাপন তাকে করতে হয়।

কথা বলা শেষ করে কেমন চুপসে গেল পানুদিদি। শাড়ী দিয়ে দেহটা ঢেকে চুপ করে বসে রইল। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুনের ঝলকানি ফেটে পড়ছে তখন। আমি বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার মানসিক অবস্থা যে কি হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। পানুদিদি উত্তেজিত ভাবে বলল, একটা মদ্যপ, লম্পট। আমার আদর্শ, আমার বিশ্বাস, আমার ভবিষ্যত সব তছনছ হয়ে গেছে। এ আর চলতে দেব না।

প্রবোধ দেবার মত জ্ঞানবুদ্ধি আমার ছিল না। আর প্রবোধ বাক্য শুনিয়েই বা কি হবে! পানুদিদি আমার কথা শুনবে এটাও আমার বিশ্বাস ছিলনা।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে।

সামনের দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছে। উঠে গিয়ে দরজা

বন্ধ করে দিলাম। পানুদিদি হাত-পা ছড়িয়ে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোকে কিছুই করতে হবে না। সবকিছু ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকল। তবে মনে রাখিস, আর একটা দিনও এসব অনাচার সহ্য করব না। আমার সঠিক ঘর আমি খুঁজে নেব।

পানুদিদি হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

আমি কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। এমন কি আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত নেতিবাচক কোন শব্দও মুখে এল না।

পানুদিদি হতাশা নিয়েই ফিরে গিয়েছিল। আমি কিছুই করতে পারিনি। করার যোগ্যতাও আমার ছিল না। পানুদিদির মনের কথা তো আমি জানি না। পানুদিদি চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে বসে বলল, আচ্ছা চলি।

বৃষ্টি থামুক।

বৃষ্টি এখন থামবে না। আমি চললাম।

পরের দিন পানুদিদি আমাকে ডেকে পাঠাল। গেলাম তার কাছে।

কিছু ভেবেছিস ননা?

বললাম, ভেবে কূলকিনারা করতে পারিনি পানুদি। এসব আমি বুঝি না। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করব তা মগজে খেলছে না। আমাকে ক্ষমা কর পানুদি।

পানুদিদি গম্ভীর ভাবে বলল, আচ্ছা।

এরপর পানুদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রায় ছয় বৎসর পর। তখন পানুদিদির অন্য চেহারা। সে সব কথা পরে বলব।

পানুদিদির প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারিনি। পুলিশের হাতে তাকে তুলে দিতে পারিনি। এরজন্য আমি মনে মনে আনন্দ অনুভব করেছি। তার প্রস্তাবমত কাজ করতে হলে আমার ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করতে হত, তা আমি পারিনি বলেই আজও গর্ববোধ করি। ছয় বছর পরে পানুদিদির সঙ্গে যখন আবার দেখা হল তখন

সত্য সরকার বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের আইন সভার মাননীয় সদস্য। আইন সভায় দাঁড়িয়ে সত্য সরকার মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করে। কংগ্রেস মহলে সত্য সরকারের পসার ভাল। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে তার নাম ছাপা হয়।

পানুদিদি তার স্বামীর ঘর করতে পারেনি।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন থিতিয়ে গেছে। হিজলী, দেউলি, বক্সায় বন্দীশালার অকথ্য অত্যাচারের ঘটনা মাঝে মাঝে লোমহর্ষণ ঘটায়। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে গান্ধীজি গঠনমূলক কাজে মন দিয়েছেন। হরিজন উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এমন সময় পানুদিদি কি ভাবে কি করে হঠাৎ পিতৃগৃহ থেকে অদৃশ্য হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল তাও কারও জানা ছিল না। তবে পানুদিদির গৃহত্যাগ মুখরোচক কেচ্ছা তৈরীর চাটনীতে পরিণত হয়েছিল। পানুদিদি যে একটা নষ্টা মেয়ে সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না।

সাঁইত্রিশ সালে রাজবন্দীরা মুক্তি পেতে থাকে। বসন্তলালও মুক্তি পেয়ে ফিরে এল। সত্য সরকারের সহচররাও মুক্তি পেয়ে ঘরে ঢুকেছে। বসন্তলাল জেলখানা থেকে আইনের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা পাশ করে এসেছে। আমিও আইন কলেজে পড়ছি, সঙ্গে এম-এ পরীক্ষাটাও দেবার চেষ্টায় আছি।

বসন্তলালের মুক্তি সংবাদ পেয়েই তার কাছে গেলাম।

সামান্য একটু হেসে বসন্তলাল বলল, তুই প্রথম বন্ধুব্যক্তি যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আর কেউ এখন পর্যন্ত দেখা করতে আসেনি।

আসবে না। ওরা তোকে ভয় করবে। ওরা যে ভাল ছেলে। ভাল ছেলেদের ভবিষ্যত আছে, তোর তো নেই। আমারও নেই। এবার কি করবি ?

আইনটা পাশ করতে হবে। আমাকে সরকার চাকরি দেবে না, বে-সরকারী চাকরি পাওয়ার ভরসা নেই। তার চেয়ে ওকালতী করলে দিন চলবে। তুইও তো ওকালতীর পথ দেখছিস। ভালই হবে। দু জনে কোথাও বসে যাব।

এর পর দু জনে বিকেলবেলায় বসে বসে নানা আলাপ আলোচনা করতাম। কথায় কথায় সত্য সরকারের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল।

বললাম, পঁয়ত্রিশ সালের আইন অনুসারে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে সত্য সরকার আইন সভার সদস্য হয়েছে।

বসন্তলাল গম্ভীরভাবে বলল, দেশের সর্বনাশ সমাসন্ন। এমন লোকের সমাগম কি করে সম্ভব হল !

আশ্চর্য হবার কথা নয়। এটাই আমাদের প্রাপ্য ছিল। তবে ভাই, অশুভের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আমিও সেই কথাই ভাবছি রে ননা। এরা যদি নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা পায় তা হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। এরা বিশ্বাস-ঘাতক, দালাল, দেশদ্রোহী অথচ কেমন ভণ্ড; দেশের মানুষ বিচার না করেই ভোট দিয়েছে। কংগ্রেসের নামে কলাগাছ দাঁড় করালেও কার্যসিদ্ধি হত। আজ বিচার করার ক্ষমতা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ।

আসল সমস্যাও সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে অতসী কাঁচ দিয়ে বড় করে দেখে ওরা হিন্দুদের মনে এমন ভাবে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়িয়েছে যার ফলে ব্যক্তিকে বিচার করার অবসর কেউ পায় না। কংগ্রেস সৃষ্ট এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হিন্দুরা এইসব অসদাচারীকেই আইন সভায় পাঠিয়েছে।

বসন্তলাল বলল, যে হুজুগ চলছে তাতে আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ভারতের দু'হাজার বছরের ইতিহাস হল দাসত্বের

ইতিহাস। আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পেয়ে থাকি একমাত্র রাজা মহারাজার বীরত্ব কাহিনী। সে সময় দেশের মানুষ ছিল দাস। তাদের মনিব বদল হয়েছে। তাতে আপশোষ করেনি কেউ-ই, প্রতিবাদ জানায়নি একজনও। সেই মনোভাব আজও বর্তমান। আজও সমাজ পরিচালনা করছে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা। কোথাও কেউ প্রশ্ন করে না, এদেশে মুষ্টিমেয় রাজা মহারাজা আমীর সুলতান বাদশাহ বাদে যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের কোন ব্যক্তিসত্ত্বার উন্মেষ কেন হচ্ছে না। এই পুরাণো রক্ষণশীল মনটা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে সাধারণ মানুষের জীবনধারাকে।

বললাম, ক'দিন আগে সত্য সরকার এসেছিল আমাদের বাড়িতে। এবার সত্য সরকার খাঁটি গান্ধীবাদী, গঠনমূলক কাজে আমাদের যোগ দিতে ডেকেছে।

তুই কি বললি?

বললাম আমার ল পরীক্ষা সামনে। আমার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

সে কিরে! বললেই পারতি, অবশ্যই তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করব।

ঠকাতে পারলাম না। সত্য সরকারের মত ঠগকে ঠকাতে খুব মেহনত করতে হয় না। আমি জানি সত্য সরকার শত শত অসত্য কথা বলে দেশের আরও সর্বনাশ করবে, আমাদের ক্ষীণ প্রতিবাদে কোন ফললাভ হবে না। নীতিগতভাবে লোকটাকে যখন ঘৃণা করি তখন ওর সাহচর্য ত্যাগ করাই ভাল। অনর্থক ওকে চটিয়েও লাভ নেই।

আমার বক্তব্য সঠিক স্বীকার করেও আমার নন-কো-অপারেশন মনোভাবকে সমর্থন করতে পারলনা বসন্তলাল।

আমরা ভালছেলের মত কলকাতায় এলাম

পর পর আইনের পরীক্ষাগুলো টপ্‌কে চলছি।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

যুদ্ধের ধাক্‌কা ঠিক মত তখনও ভারতে পৌঁছয়নি। অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক। তবে প্রচার চলছে যুদ্ধ ভারতের জাতীয় সংগ্রাম। প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করেছে যারা তারা ভারতীয় এবং সমাজের শীর্ষব্যক্তি বলেই সবাই জানে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ভারতীয়দের হাতে আংশিক ক্ষমতা তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কার্যকালে যে ক্ষমতা দিয়েছিল তাতে ভারতীয় নেতারা খুশী হতে পারেনি। সেজন্য আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে পঁয়ত্রিশ সালের ভারত আইন। এই আইনে কয়েকটি বিশেষ অধিকার নিজেদের হাতে রেখে ভারতীয়দের হাতে কিছু শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। গত নির্বাচন এই আইন অনুসারে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দল হল কৃষক পার্টি। নেতা ফজলুল হক। পরবর্তী দল হল কংগ্রেস, তার পরই মুসলীম লীগ। নির্বাচনের পরে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য ফজলুল হক কংগ্রেসের দ্বারস্থ হলেন সমর্থন লাভ করতে।

সরকার গঠনে কংগ্রেস সহযোগিতা করবে কিনা, এটাই স্থির করতে পারেনি নেতারা। ফজলুল হক সুযোগ সন্ধানী। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন না করে মুসলীম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে ভবিষ্যত বাংলার জন্য দুঃখ দুর্দশা জমা করে রাখলেন।

মির্জাপুরের একটা মেসে থাকত বসন্তলাল। আমিও থাকি একটা জায়গায়। থাকি বললে ভুল হবে। আমি থাকি না কোথাও। পাইস হোটেলে খাই আর একটা স্কুল বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাতের বেলায় স্কুলের দুটো বেঞ্চ জোড়া দিয়ে শুই। সকাল বেলায় বেঞ্চ দুটো যথাস্থানে রেখে স্নান করে বেরিয়ে পড়ি।

ভেজা কাপড়টা দারোয়ানের হেপাজতে থাকে। অবসর সময় কাটে বসন্তের মেসে।

ল ফাইন্যাল দিয়ে বাড়ি যাবার চেষ্টায় আছি। এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। আমি পাশ করলেও বসন্ত পাশ করতে পারেনি।

আইন ব্যবসাকে যখন জীবিকা বলে স্থির করেছি তখন এম-এ পাশ-ফেল এমন কিছু ঘটনা নয়।

বসন্তলাল বলল, বাড়ি যাব না রে। ল-এর রেজাল্ট নিয়ে তবেই যাব।

থাকতে হল।

দুটো টুইশনি জোগাড় করেছি নিজের খরচ চালাবার মত।

মোটামুটি বেশ দিন কাটছিল। মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে যেতাম, কখনও কখনও চার আনার টিকিট কেটে সিনেমা দেখতাম।

এমন সময় একদিন বসন্ত খবর দিল, বড়দি কলকাতায় এসেছে। যাবি দেখা করতে?

খবরটা শুনে চমকে উঠলাম।

আমার সেই রক্ষণশীল সুপ্ত মনটা যেন বলে দিল, নষ্টা মেয়ে।

তাড়াতাড়ি বসন্তলালের কথার জবাব দিতে পারলাম না।

আমতা আমতা করে বললাম, বড়দি মানে পানুদি। ঠিকানা জানিস? তা যেতে পারি। তুই যাবি তো?

কেমন একটা আশঙ্কা।

পানুদিদি যে পরিবেশে আছে সেটা কতটা শোভন ও রুচিসম্মত তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। সে জন্য অসহায় বোধ করে বসন্তলালকে আঁকড়ে ধরলাম।

আমি তো যাবই। তুই যাবি কি?

জোরের সঙ্গে বললাম, হাঁ যাব।

পরদিন সকালে মুরারীপুকুরে পানুদিদির বাসস্থান খুঁজে বের করলাম।

আমাদের দেখেই পানুদিদি খুশীতে ডগমগ।

আমি পরিবেশটা ভাল করে দেখছিলাম। ইঁটের দেওয়ালে টালির ছাউনি। বাড়িটার চারদিকেই এই রকম ঘর। মাঝে উঠোন। উঠোনে চৌবাচ্চা। অন্য তিন দিকে ক'য়কটি মেহনতী মানুষের পরিবার। এক দৃষ্টিতে মনে হল অতি নগণ্য বস্তি বাড়ি।

পানুদিদি আবেগের সঙ্গে বলল, তোরা যে আসবি তা জানতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবি এটা ভাবতে পারি নি। নে চল, ঘরে বস।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। একটায় রান্না হয়, অপরটি শোবার।

পানুদিদি বলল, দুটো ঘরের দরকার নেই, তবুও নিয়েছি। আবার কোন ভাড়াটিয়া আসবে। তার সঙ্গে বনিবনা নাও হতে পারে। একটা উনুন কিনেছি, সেটাই আমার সম্বল। পাশের ঘরখানায় সামান্য ভাঁড়ার সাজানো। শোবার ঘরে এই তক্তপোষটায় আমার শয্যা।

বসন্তলাল বলল, এই ভাবে সংসার পেতেছ কার জন্য?

বসন্তলালের প্রশ্নটি স্বার্থক। উত্তর দেওয়ার উপর নির্ভর করছে পানুদিদির বর্তমান অবস্থাকে জানা। পানুদিদি বোধহয় প্রশ্নটাকে বুঝতে পেরেছিল। সহজভাবে বলল, একা মানুষের আবার সংসার। খেতে হয়, মাথা গুঁজতে হয়, এসব শুধু দেহের সঙ্গে প্রাণটা রক্ষা করতে।

আমি দেখছিলাম পানুদিদির সংসার।

একটা কম্বল পাতা রয়েছে তক্তপোষে। মশারিটা দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলছে। দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। তারই পাশে দড়িতে পানুদিদির কাপড়-জামা। বাসনপত্র বলতে একটা ছোট

এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি। ছোট একটা লোহার কড়াই, দুটো য়্যানামেল করা থালা। একটা বালতি আর একটা মগ।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম।

পান্নুদিদিকে এভাবে দেখতে পাব এটা আশাও করি নি।

আমাদের বসতে দিয়ে পান্নুদিদি বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গেলাসে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, নে চা খা।

আমার বিস্ময় তখনও কাটেনি।

পান্নুদিদি বসন্তকে বলল, তোকে তো অনেক দিন আগেই রিলিজ করেছে, কি বলিস?

তা এক বছর হয়ে গেছে।

কোথায় ছিলি?

প্রথমে বহরমপুরে, তারপর বক্সায়। বক্সা থেকেই খালাস পেয়েছি।

তোকে কেন যে গ্রেপ্তার করল তা বুঝতে পারিনি। তুই কি জানিস?

জানি। আমার অপরাধ হল আমি তোমার ভাই। সত্য সরকার দয়া করে আমাকে তুলে দিয়েছিল পুলিশের হাতে।

তুই ঠিক জানিস তো?

একটুও বেঠিক নয়। আমাদের শহরে সত্য সরকারের সব সঙ্গীকেই আমার মত জেলখানায় বছরের পর বছর ধরে পচতে হয়েছে নীরদবরণের কাছে টাকা খেয়ে সত্য সরকার হেন অপকার্য নেই যা করেনি।

পান্নুদিদি হেসে বলল, তবুও ননা বেঁচেছে। সত্য সরকারের থাবা ওকে আঘাত করতে পারেনি। সত্য সরকারের খবর রাখিস?

বললাম, সত্য সরকার খুব ভাল আছে, বর্তমানে শক্তিশালী কংগ্রেসী এম-এল-এ।

পান্নুদিদির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে

থেকে বলল, দেশের দুর্দিন সামনে। দুর্ভাগ্যের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। যাক্ ওসব কথা। এ বেলায় খেয়েদেয়ে যাবি। শীতকাল, গরম গরম খিঁচুড়ি আর আলু-ডিম ভাজা মন্দ লাগবে না। হাঁরে বস্‌না, বাবা কেমন আছেন ?

খুব ভাল নয়। তুমি চলে যাবার আঘাতটা বাবার মন ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমি তখন জেলখানায়। ঠিক অবস্থাটা আমি বলতে পারব না। তবে বাবা যে ভেঙ্গে পড়েছিলেন তা বুঝেছিলাম তার চিঠিতে। একবার বাবা লিখেছিলেন, পান্নার মত মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে যদি না দিতাম তা হলে পান্না এভাবে ঘর ছেড়ে পালাত না।

শহরে খুব সোরগোল হয়েছিল কি ?

ঠিক জানি না। বলে বসন্তলাল থেমে গেল।

আমি বললাম, অবশ্যই। আমাদের হিসাব যাই হোক, ওদের হিসাবে নারীর পক্ষে গৃহত্যাগ কলঙ্কের কারণ। তবে ওরা খুঁজে পায়নি এমন একটা লোক যার সঙ্গে পান্নাদি পালিয়ে গেছে। সেজন্য ওদের খুব আপশোষ। অবশেষে ওরা সিদ্ধান্ত করল, অবশ্যই এর পেছনে কোন দুশ্চরিত্র লোক আছে। সত্য সরকার মাঝে মাঝে বলত, আমি জানতাম মেয়েটা নষ্টা।

পানুদিদি হো-হো করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ একটানা হেসে দম নিল। তারপর সহজভাবে বলল, সত্য সরকারের সার্টিফিকেটের দাম কম নয়। ভাগ্যি আমরা সত্য সরকারকে ভাল করে চিনি ও জানি। নইলে ঐ সার্টিফিকেট গলায় বেঁধে আমাকে বিমলার মত নবদ্বীপে ঘর বাঁধতে হত। শোন ননা, তোর ল পরীক্ষার রেজাল্ট তো শীগ্‌গীরই বের হবে।

বললাম, আমাদের দুজনেরই একই অবস্থা।

তোরা কি করবি ? ওকালতী ?

বসন্তলাল বলল, আমার তো কোন উপায় নেই। বাবার

সেরেস্তায় বসতে হবে। অবশ্য বাবা যদি অন্যমত না করেন। সরকারী চাকরী তো পাব না। বে-সরকারী চাকরিও পাওয়ার আশা কম। যারা বে-সরকারী চাকুরীদাতা তারা তো আরও বেশি ভয় করে আমাদের। আজ আমাকে ভাবতে হচ্ছে। কিসের প্রেরণায় দেশের জওয়ান ছেলেরা জেল-জুলুম-ফাঁসি অগ্রাহ্য করে এগিয়েছে, যাদের স্বার্থে ওরা ত্যাগ স্বীকার করছে তারাই অপাংক্তেয় মনে করছে এই সব দেশপ্রেমীদের। জান দিদি, জেলখানা থেকে যখন খোলা আকাশের তলায় এলাম তখন আমার সহপাঠীরাও আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত। এখনও সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। একমাত্র ননাই আমাকে অচ্ছুৎ মনে করেনি। বুঝতেই পারছ, আমার মত লোককে বেসরকারী কায়েমীস্বার্থের পাহারাদাররা কোনক্রমেই কোন কাজ দেবে না। আর তো কোন পথ নেই, ওকালতী করাই বোধহয় একমাত্র পথ।

আমি বললাম, করার তো অনেক ইচ্ছা ছিল। বাবা থাকলে একবার কালো কোট গায়ে দিয়ে আদালতে যাবার চেষ্টা করতাম কিন্তু পানুদি, দাদারা আমার পড়ার খরচই দিচ্ছে না। আমাকে গিয়ে হচ্ছে খুবই অসুবিধার মধ্যে। এম-এ পাশ করেছি, তবে কে কি তো খুব ভাল নয়। কলেজের মাষ্টারী তো পাব না। চেষ্টা, তাক হয়ত কোন স্কুলে চাকরি পেতে পারি। নিজের সমস্যা ও মেটাতে হবে। সরকারী চাকরি আমিও পাব না। পড়তে আই-বির খাতায় আমার নামটা নিশ্চয়ই তুলে দিয়েছে। রেজাল্ট চাকরি খুঁজতে হবে এমন জায়গায় যেখানে আমার পেটে করলে জোটে। এদিকে আবার হিন্দু-মুসলমানের রেশিও আছে। ভাবে এখনও কিছুই স্থির করতে পারিনি। ভাগ্যকে যাচাই কার হবে পানুদি।

ভাগ্য, বলেই পানুদিদি চুপ করে গেল। মুখ ঘুরিয়ে বাহিরটা দেখে বলল, তোরা গল্প কর, আমি উনুনে আগুন দিয়ে আসি।

পান্নুদিদি উঠে গেল।

বললাম, বসন্ত এবার পান্নুদিকে বাড়ি নিয়ে যা। পান্নুদি কি করছে তাও জানি না। কি করে চলছে তাও জানি না। কিন্তু এই পরিবেশে পান্নুদিকে মোটেই মানাচ্ছে না। আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে।

উদাসভাবে বসন্ত বলল, বড়দিকে নিয়ে যেতে চাইলেই যে বড়দি যাবে এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি? উপরন্তু আমি বড়দিকে জানি কিন্তু বাবা সামাজিক কুৎসাকে অগ্রাহ্য করে বড়দিকে কাছে টেনে নেবেন এমন কোন ভরসা নেই। আগে পথ প্রস্তুত করতে হবে। বাবার মতামত জানতে হবে, তারপর ব্যবস্থা।

বললাম, পান্নুদির জীবিকা যে কি তাও তো বুঝছি না।

সেটাও আমার মনে খোঁচা দিচ্ছে। বড়দির গায়ে তো গয়না দেখছি না। বিক্রি করে হয়ত নিজের ব্যয় মেটাচ্ছে। তবে খুব স্বচ্ছন্দে যে নেই তাতো বুঝতেই পারছিস।

পা। পান্নুদিদি ফিরে আসতেই আমাদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

ওদের খুব ঢুকেই পান্নুদিদি বলল, কি ভাবছিস বসন্ত? তোর দিদিকে পেছনে দেখবি তা বোধহয় ভাবতেও পারিস নি।

বলত, আকে ঐ কথাটাই বলছিলাম।

আমি যে তোদের খবর রাখি তা বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই, নইলে র ঠিকানা পেতাম কি?

বসন্ত আমতা আমতা করে বলল, আমি ভাবছি তোমার কাজ তুমি করেছ। আমি আমার কাজ করতে পারিনি। তবুও জানতে ইচ্ছা করছে। তোমার চলছে কি করে।

তোদের ভগবান চালায়। জানিস বসন্ত, যে চলতে চায় সে অচল হয়ে থাকে না কোনকালেই। ভাল-মন্দ পথ পাওয়া যায়-ই। আমি চলতে চেয়েছি তাই কোন অবস্থাই আমাকে অচল করতে পারেনি।

বললাম, তোমার কথাগুলো কেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে পান্নুদি।

হেঁয়ালি! তা বটে। জানিস ননা, যেদিন বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম সেদিন আমার সম্বল ছিল দুটো জিনিস, প্রথমটি আত্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়টি ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট। বাবা মনে করেছিলেন, অসহায় মেয়েদের ভার বহন করতে পারে একমাত্র পুরুষরা। তাই অবলম্বন খুঁজে দিয়েছিলেন। বাবাকে দোষ দিতে পারি না। পৃথিবীতে নিম্নবিত্তের ছা-পোষা সব বাবাই কন্যার ভবিষ্যত এই ভাবেই গড়ে দিতে চায়। আমি তো রাজার ঘরের মেয়ে নই। ভাগ্য আমাদের সম্বল। আমাদের রক্তে থাকে গতানুগতিকতা। তোরা যাকে বলিস ঐতিহ্য। আমার বাবা নিম্নবিত্তের মানুষ, যে দিকে জল গড়ায় সেদিকে গা এলিয়ে দেন। এই নিম্নবিত্ত চরিত্রকে পরিহার করা বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ আমি ছিলাম লাগাম ছেঁড়া তেজী ঘোড়ার মত প্রাণ প্রাচুর্যে চঞ্চল।

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু।

দেখ ননা, জীবনটা 'কিন্তু' দিয়ে বরবাদ করতে আমি রাজি নই। সেদিন পৃথিবীকে ভাল করে জানতাম না। পৃথিবীর সব জটিলতার প্যাঁচে হাঁসফাঁস করছিলাম। ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে যেদিন পথে গিয়ে দাঁড়ালাম সেদিন বুঝলাম, ঐতিহ্যের অভিশাপ মানবতাবোধকে কি ভাবে হত্যা করে। আমরা ট্রাডিশ্যনকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তার কারণ আমরা ট্রাডিশ্যনের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারি না কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থকে অটুট রাখতে। যার ফলে আমরা জীবনের বৃহত্তর ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যেতে বাধ্য হই। আমার জীবনটাই হল একটা এক্সপেরিমেণ্ট। সত্য সরকারকে ভাবতাম একজন মহান আদর্শবান ত্যাগী দেশপ্রেমী। তার মুখোসটা খুলে গেল, তার নগ্ন চেহারাটা দেখে আঁতকে উঠলাম। আরও জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, এই বোধ যেদিন জাগল সেদিন জন্মাল আত্মবিশ্বাস। মায়ের কোলে শায়িত উলঙ্গ শিশুর সৌন্দর্য আর জওয়ান মানুষের কুৎসিৎ দর্শন উলঙ্গ চেহারা যে এক নয় সেই উপলব্ধি আমার মনে

শক্তি জুগিয়েছিল। তাই পান্না লাহিড়ি সমাজে ফিরে এসেছে তার যোগ্য আসন খুঁজে নিতে।

থেমে গেল পানুদিদি। উঠে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনটা ঘরে নিয়ে এল। রান্নার জোগাড় করে নিতে থাকে।

বললাম, তোমার সময় কি করে কাটে?

কাজ করে। সে সব কথা পরে হবে ননা। অনেক দিন পরে দেখা। কয়েক ঘণ্টা হয়ত এখানে থাকবি। সব কিছু এই কয়েক ঘণ্টায় ফুরিয়ে গেলে আর আসবি কি? বরং জমা থাক। মনের একটা নিঃসঙ্গ দিক আছে। সেই নিঃসঙ্গতাকে আমি আঁকড়ে ধরেছি বলেই আমার সময় কাটে নির্বিবাদে।

পানুদিদি তারপর আর কোন আলোচনা করে নি। গুরুতর বিষয়কে পাশে ঠেলে দিয়ে কেমন নির্লিপ্তভাবে রান্নার কাজে আত্মনিয়োগ করল।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল তক্তপোষের তলায় সাজানো একগাদা বইয়ের দিকে। বইগুলো ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, ওগুলো কি বই?

কত রকমের বই আছে। কোনটা অর্থনীতির, কোনটা সমাজ-নীতির, কোনটা চিকিৎসাশাস্ত্রের। উপন্যাস—কবিতা নয়। এবার যেদিন আসবি সেদিন দেখবি। আজ খিঁচুড়ি খাওয়ার দিন। আজ অন্য কোন কাজ করা হবে না।

খেয়েদেয়ে সেদিন ফিরে আসার আগে বসন্তলাল জিজ্ঞেস করল, তোমার টাকার দরকার আছে কি বড়দি?

পানুদিদি হেসে বলল, টাকার দরকার সবারই থাকে। আমারও আছে। তুই কি উপায় করিস? নিজে যেদিন উপায় করবি সেদিন তোর কাছে টাকা নিতে বাধবে না। তবে মনে রাখিস, অন্যের টাকা ব্যয় করাটা যত সহজ নিজের টাকা ব্যয় করা অত সহজ নয়। বিশেষ করে দান-খয়রাত করতে হলে স্বোপার্জিত অর্থভাণ্ডারের বন্ধ দরজাটা

সহজে খোলা যায় না। তবুও তুই যে আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিস সেটা চিরকাল মনে থাকবে।

পান্নুদিদির কাছ থেকে ফিরে এলাম কিন্তু মনটা বেশ অপ্রসন্নই থেকে গেল। কি যেন খুঁজেছিলাম, তা খুঁজে পাইনি। ফিরে আসার সময় ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, আবার আসব।

বলে এসেছি অথচ যেতে পারিনি। না যাবার কারণ এমন কিছু নয়, মানসিক আলস্য।

বসন্তলাল দেশে গেছে। তার ছোট ভাই সুমন্তলালের খুব অসুখ। যাবার সময় বলে গেছে, বড়দিকে যেন বলিস না সুমুর অসুখ।

ভেবেছিলাম বসন্তলাল ফিরে না আসা অবধি পানুদিদির কাছে যাব না। দু জনে আবার এক সঙ্গেই যাব।

আমি যতটা বিলম্ব করতে চেয়েছিলাম, অতটা বিলম্ব করতে পারেনি পান্নুদিদি।

আমার আস্তানায় এসে উপস্থিত হল পানুদিদি। এসেই বিনা ভূমিকায় বলল, এই বুঝি তোর 'আবার আসব'?

লজ্জিতভাবে বললাম, কথা রাখতে পারি নি সেজন্য দুঃখিত। বসন্তলাল দেশে গেছে, মনে করেছিলাম সে ফিরলে দু জনে এক সঙ্গেই যাব। তারই অপেক্ষা করছি।

কৃতার্থ হলাম, এবার উঠে পড়। আমার সঙ্গে চল।

কোথায়?

সেটা অগ্রিম না-ই বা শুনলি।

আমার যে টুইশনিতে যেতে হবে।

না-ই বা গেলি আজ। একদিন কামাই হলে বেদ অশুদ্ধ হবে না।

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে পানুদিদি যে ভাবে কথাগুলো বলল তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে পানুদিদিকে যে চোখে দেখেছি সেই চোখ আজ নেই। চোখের দৃষ্টিও বদল হয়েছে। মনের দিক থেকে নতুনত্বও এসেছে। পান্নুদিদির কথা

বলার ভঙ্গী এবং চোখমুখের চেহারা আমাকে মোহাচ্ছন্ন করল। প্রতিবাদ করতে পারলাম না। পান্নুদিদির পেছন পেছন বের হলাম।

রাস্তায় এসে পান্নুদিদি বলল, অনেকটা দূরে যেতে হবে রে ননা।

তোমার পরিচালনায় পথ চলব, মোটামুটি বরকন্দাজের ভূমিকা আমার। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।

কলেজ ষ্ট্রীট থেকে ট্রামে উঠে সোজা গেলাম ধর্মতলায়। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলাম তালতলার একটা মুসলমান বস্তিতে।

পান্নুদিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কেন ?

মুচকি হেসে পান্নুদিদি বলল, আবার প্রশ্ন। বললাম যে অগ্রিম না-ই বা শুনলি।

আমি নীরবে পান্নুদিদির পেছন পেছন চলছি।

বস্তির একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পান্নুদিদি ডাকল, সখিনা।

ভেতর থেকে জবাব ভেসে এল, উঁ। দরজা খোলা আছে। চলে আসুন দিদি।

দরজা ঠেলে দু জনে ভেতরে ঢুকলাম।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘরে জানালা নেই। টালির ছাদের তলায় ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি, সেটাই আলো-বাতাস যাতায়াতের একমাত্র পথ। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারে প্রবেশ করে সবই ঝাপসা হয়ে গেছে চোখের সামনে। অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নজর করে মনে হল একজন মহিলা মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে।

পান্নুদিদি বলল, কেমন আছ সখিনা ?

সখিনা উঠে বসল। দরজা দিয়ে যেটুকু আলো প্রবেশ করছিল তাতেই সখিনাকে মোটামুটি দেখতে পেলাম। অনুমানে বুঝলাম মহিলার বয়স তিরিশের নীচে কিন্তু চেহারাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। উঠে বসে হাঁপাচ্ছিল।

পান্নুদিদি ব্লাউজের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ বের করে তা থেকে তিনটে টাকা সখিনার হাতে দিয়ে বলল, এতেই তোমার দশটা দিন চলে যাবে।

আর টাকা দিয়ে কি হবে দিদি। আমি কি দশদিন বাঁচব?

তুমি সেরে উঠবে সখিনা। চিকিৎসা তো চলছে। ওষুধপত্র তো পাচ্ছ। নিয়মমত ওষুধ খেও। সুনীল ডাক্তার নিয়মমত ইনজেকশনও দিচ্ছে। আমরা ভাবছি বেশি আলো-বাতাসযুক্ত ঘরে তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।

সখিনা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কথা শেষ করেই পান্নুদিদি বলল, আজ চলছি। কাল আবার আসব।

পান্নুদিদি আর দেরী করল না। তখুনি আমাকে সঙ্গে করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

রাস্তায় এসে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটা কে?

আমার একজন বন্ধুর স্ত্রী।

হাসপাতালে দাও না কেন?

স্থান নেই। চেষ্টা তো করছি। যক্ষার হাসপাতাল তো মাত্র একটা। সেখানে যা রোগীর ভীড়। ওদের দোষ নেই। জায়গা থাকলে একটা ব্যবস্থা হত।

রাস্তায় পান্নুদিদি মুখ খোলেনি। বাসায় এসে পান্নুদিদি ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে আমাকে পাশে বসতে বলল।

আমার চালচলন তোর কাছে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে, নারে?

হেসে বললাম, ধোঁয়া কেটে আগুন দেখা যাবে আশা করছি।

তোর এসব ভাল লাগছে না?

খারাপও লাগছে না। এও তো সমাজসেবা। ভগবানেরও সেবা।

পান্নুদিদি হেসে বলল, ভগবান টগবান বুঝি না ননা। সেবা

করি। জানি আমার এই সেবা সমাজের সামান্যতম উপকারও করবে না। সেই ঐতিহ্য। সেই পুরাতন রক্ষণশীল মন, জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আমি চুপ করে বসে রইলাম, উত্তর দিলাম না।

চা খাবি?

দরকার নেই।

দরকারে কি সব কাজ হয়? অ-দরকারেও অনেক কাজ করতে হয়। চা খাওয়াটাকে অ-দরকারী কাজ মনে করতে পারিস অথচ তা খাবি।

তোমার সখিনার কথা তো বললে না।

ভারতের কোটি কোটি মেয়ের একজন হল এই সখিনা। এর তো ইতিহাস নেই। কটা মেয়ের ইতিহাস আছে বলতে পারিস? সখিনা সেই মেয়েদের একজন যারা না খেতে পেয়ে এইভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে। সমাজের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করে। এদের জীবনে না থাকে রোমান্স, না আছে উচ্চাশা, না আছে বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠিত করার মত মানসিকতা। সেই প্রাচীন প্রবাদের থোড়-বড়ি-খাড়া। আমি যখন কাশীতে নার্সিং-এর ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন সখিনার সঙ্গে পরিচয়।

সখিনা তো কাশীর মেয়ে নয়। সখিনাতো বাঙ্গালী মুসলমান

বোধ হয় তাই। মুসলমানরা নিজেদের প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আটতে রাখতে চায় না। তারা নিজেদের মুসলমান বলতে পারলেই বর্তে যায়। এমন কি ভারতীয় বলতে চায় না। তবে সখিনা আলাদা জাতের মেয়ে।

বলতে থাকে পানুদিদি।

একদিন হাসপাতালে এল একজন রুগী। বাঙ্গালীর ছেলে। কাশীতে বাঙ্গালীর তো অভাব নেই। বাঙ্গালী রুগী অনেক আসে। এও তাদেরই একজন। আমি তখন শিক্ষার্থী।

তার বেডের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতাম।

মাঝে মাঝে রুগীদের চার্ট দেখতাম।

দেখলাম রুগীর নাম নীরদবন্ধু বিশ্বাস।

নিজে যেচেই বাংলা ভাষায় কথা বললাম।

হাসপাতালে বাঙ্গালী সেবিকা পেয়ে নীরদও খুশী হল।

সেই থেকে নীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

নীরদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, স্বদেশী আন্দোলনকে নীরদ অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মাঝে মাঝেই নীরদ বিপ্লবের বাণী শোনাত। আমি ঘরপোড়া গরু। নীরদের মতিগতি দেখে চিন্তিত হলাম।

একদিন বললাম, এভাবে বিপ্লব হয় না নীরদ। দু-চারটি ইংরেজ মেরে বিপ্লবসাধনা হয় না। সংগঠন গড়ে তোল সর্বাত্মক আক্রমণ করতে। কার কথা কে শোনে। নেশায় মেতেছে এই সব যুবকরা।

নীরদ বলত, সংগঠন দরকার নেই। আমাদের ছোট সংগঠন যা আছে তাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের মানুষ আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে।

বলেছিলাম, পৃথিবীর ইতিহাস বড় অকরুণ। পেশাদার রাজনীতিক কোন দেশেই বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। সৌখীন বিপ্লবী পারে। কাজের সময় তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বিপ্লব ঘটায় খেটে-খাওয়া বন্ধনহীন মানুষ। তাদের কাছে তোমরা পৌঁছতে পারনি। এমন কি মুসলমানরা তোমাদের সমর্থন জানায় না। অন্ত্যজ হিন্দুরা তোমাদের পাশে আসে না। উচ্চ বিত্তের মানুষের কথা বাদ-ই দিলাম। তারা নিজেদের কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখতে বিপ্লব চিন্তাকেও ভয় করে। ওরা যখন বুঝবে কায়েমীস্বার্থ বজায় থাকবে, অথচ নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না তখন ওরা গোপনে আর্থিক সাহায্য

দেবে। যদি কোনদিন দেশ স্বাধীন হয় তখন এই সব কায়েমী-স্বার্থের সেবকরা এগিয়ে আসবে লায়ন শেয়ার নিতে। তোমরা ভুল পথে চলছ। আদর্শ ভুল নয়, কর্ম পদ্ধতি ভুল।

নীরদ জোর দিয়ে বলেছিল, তোমার যুক্তি উদ্ভট।

আমি বলেছিলাম, হয়ত তাই। তবে বিপ্লব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তা কি জানো?

নীরদ বলল, তুমি জান?

জানি। তোমরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছ তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

নীরদ বলেছিল, তুমি দেশের স্বাধীনতা চাও না?

চাই। কিন্তু বিপ্লবের প্রহসন দিয়ে দেশ স্বাধীন হতে পারে না। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজাদের রাজ্য ছিল তখন রাজারা ছিল স্বৈরাচারী। রাজার হাত থেকে দেশের মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। তখনও বিপ্লব ঘটেছে। সেই বিপ্লব ঘটেছিল কায়েমীস্বার্থের অর্থবানদের ইঙ্গিতে, কখনও তাদের পরিচালনায়। তখন গরীব মানুষরা ছিল কামানের ফিডার। তারা পয়সা পেত রাজাদের কাছ থেকে রাজ্য কায়েম রাখতে। আবার অর্থবান তাদের পয়সা দিত রাজার বিরুদ্ধে লড়তে। বিনিময়ে উভয়পক্ষের গরীব মানুষরা বুকের রক্ত দিত রাজাকে রক্ষা করতে অথবা অর্থবানদের স্বার্থ বজায় রাখতে। মরত, জখম হত এই গরীবরা। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যেত হয়ত রাজার পরাজয় ঘটেছে। অর্থবানরা তখন বিপ্লবের গালগল্প ছড়িয়ে দিত। গণতন্ত্রের নামে ওরা পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করত। তোমরা কি চাও এই বিপ্লব ঘটুক?

নীরদ বলল, না। আমরা আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে দিতে চাই, সেজন্য এই বিপ্লব।

বলেছিলাম, আমার কথার জবাব ঠিক হল না নীরদ। বুর্জোয়া বিপ্লব দিয়ে কোন কালেই আপামর জনসাধারণের মুক্তি আসে না।

তোমরা সেই ভুল পথে পা দিয়েছ। এই বিপ্লব যদি কোন কালে সফলও হয় তার ফলভোগ করবে একটা বিশেষ শ্রেণী। তোমরা একদল শোষককে হটিয়ে সেখানে আরেকদল শোষককে বসাতে চলেছ। শুধুমাত্র গায়ের রং বদল হবে, কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারবে না। আজ যারা তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে, আজ যাদের সাহায্যে ইংরেজ তোমাদের দমন করছে তারাই দেখবে কষ্ঠার্জিত স্বাধীনতার সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, তোমরা হবে অপাংক্তেয়। ওদের অর্থ আছে, অর্থ থাকলেই ভাড়াটিয়া মানুষ ভীড় করবে সেই সব বেইমানদের আশেপাশে। এই বেইমানদের কথাই হবে বেদবাক্য। তোমরা তখন নারকেলের ছিবড়ের মত আস্তাকুঁড়েতে আশ্রয় পাবে।

নীরদ জোর দিয়ে বলেছিল, নিশ্চয় নয়। আমাদের দাবী সবার আগে মানতে হবে। আমাদের ত্যাগকে ওরা যদি অসম্মান করে তা হলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।

হেসে বলেছিলাম, তাই মনে হয় নীরদ। বাস্তব বুদ্ধির জন্য মেয়েদের সুনাম আছে। আমি আবার ঘরপোড়া গরু। তাই তোমার কাজকে সমর্থন করতে পারছি না।

নীরদ আই-এ ক্লাশে সিভিক্স পড়েছিল। সে বলল, আমাদের স্বাধীন দেশে আসবে democracy, government by the people, of the people for the people, এটাই আমাদের আদর্শ।

বলেছিলাম ডেমোক্রাসী চিরকালই হিপোক্রাসী। তোমরা সেই প্রহসনের অভিনেতায় পরিণত হলেও আশ্চর্য হব না। সংগঠন গড়ার দিকে মন দাও। এমন সংগঠন চাই যাতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। তুমি যাও সেই সব অবহেলিত মানুষের কাছে, তাদের সঙ্গে কাজ কর, তাদের দুঃখের অন্ন ভাগ করে খাও, তাদের সঙ্গে বাস করে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হও।

তাদের বুঝিয়ে বল স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাদের জানাও তাদের মুক্তিই মানবতার মুক্তি, মনুষ্যচেতনার উন্মেষ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সব কিছু নয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমমর্যাদা লাভ হল স্বাধীনতা। নইলে সব ব্যর্থ হবে।

নীরদ আমার কথা শোনেনি। তখন সে নেশায় পাগল।

কাশী রেল স্টেশনে নীরদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। যারা অত্যাচার করেছিল তারা কিন্তু ইংরেজ নয়। তারা সবাই ভারতীয়। তুই বোধহয় জানিস, চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর চট্টগ্রামের হিন্দু নরনারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার যারা করেছিল তাদের একজনও অ-হিন্দু নয়। ননী দাশগুপ্ত নামক কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের নির্দেশে এই অত্যাচার করা হয়েছিল। যদি কোনদিন দেশ স্বাধীন হয় সেদিন এই ননী দাশগুপ্ত শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীরাই স্বাধীনতার অমৃতফলের ষোল আনা অংশীদার হবে।

থাক ওসব কথা। নীরদ গ্রেপ্তার হবার কয়েকদিন পর সখিনা এল কাশীতে। নীরদের কাছে আমার নাম-ঠিকানা নিশ্চয়ই পেয়েছিল। আমাকে খুঁজে বের করে বলল, আমি নীরদ বিশ্বাসের স্ত্রী।

বরিশালের মেয়ে সখিনা। সামান্য কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল। কিভাবে নীরদের সঙ্গে পরিচয় তাও জানিনা। সখিনাও কোনদিন বলেনি।

বিচারে নীরদের দীর্ঘমেয়াদের জেল হল।

সখিনা তাতেও দমেনি। আপীল করল।

আপীলের ফল বের হবার আগেই জেলখানায় নীরদ মারা গেল।

এইবার সখিনা ভেঙ্গে পড়ল।

নানা দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে সখিনা ফিরল দেশে।

প্রথমে গেল শ্বশুরের কাছে। শ্বশুর অনাদিশরণ সখিনাকে পুত্র-

বধু বলে স্বীকারই করল না। এক রাত্রি শ্বশুরবাড়ির গোয়ালঘরে কাটিয়ে পরদিন গেল তার পিতৃগৃহে।

আপ্যায়িত যে হয়নি সেটা বুঝতেই পারছ। তবুও আশ্রয় পেয়েছিল বাবার কাছে।

সখিনা ভালবাসত নীরদকে। এই ভালবাসাকে অসম্মান করেনি নীরদ। বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিল বাগমারীর একটা ভাড়াটিয়া বাড়িতে। নীরদের হাতে কিছু টাকা ছিল। সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিল সখিনার নামে।

মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন তো জান। নীরদের স্ত্রী সখিনা এটা সখিনার বাবা স্বীকার করত না। সখিনার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে। সখিনার খালাতো ভাই আমীর আলিকেই উপযুক্ত পাত্র স্থির করে বিয়ের দিনও ঠিক করেছিল।

সব কিছু ভেস্তে দিয়ে সখিনা আত্মরক্ষার তাগিদে পাড়ি জমালো কাশীতে। হাজির হল আমার কাছে।

আমি আগে মনে করতাম বাংলার দূষিত পচা সমাজের ওপর আমার আঘাত বোধহয় অভিনব। কিন্তু রক্ষণশীল ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজের একটা মেয়ে কি করে হিন্দুর ছেলেকে বিয়ে করে সংসার করেছিল তা ভাবতেও পারিনা। কেমন একটা শিহরণ অনুভব করতাম সখিনার এই দুঃসাহস দেখে

সখিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর সখিনা?

মোটামুটি ঘটনাগুলো বলা শেষ করেই কাঁদতে লাগল সখিনা।

বলেছিলাম, তোমার চোখে জল, এতো আশ্চর্য ঘটনা। আমরা বাঁচতে চাই। তুমিও যেমন আমিও তেমন, আমরা লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়িয়েছি। পৃষ্ঠপ্রদর্শনের আর কোন সুযোগ নেই। তুমি স্বামী হারিয়ে আশ্রয় খুঁজছ বাঁচতে। আমিও স্বামী পরিত্যাগ করে আশ্রয় খুঁজছি বাঁচতে। বাঁচাটা হল প্রশ্ন; সেই বাঁচা যেন বাঁচার মত হয়। আমি মর্যাদার সঙ্গে বাস করছি। তুমিও পারবে।

গত বছর সখিনা বলল, দিদি এবার নিজের নসীব নিজেকে দেখে নিতে হবে। আমার মায়ের মামা থাকে কলকাতায়। বুড়োর কেউ নেই। ডকে কাজ করত। এখন আর পারেনা কোন কাজ করতে। তার কাছেই যাব। কলকাতায় থাকলে বাঁচার অনেক পথ তেমনি শেখারও কিছু পাব।

আমি সরাসরি জবাব দিতে পারলাম না। পরের দিন বলে-ছিলাম, বেশ।

সখিনা কোলকাতায় পৌঁছে সংবাদ দিয়েছে। মাঝে মাঝে পত্রও পেতাম। শেষপত্র পেলাম, আমার ক্ষয়রোগ হয়েছে।

ছুটে এলাম কলকাতায়।

ইচ্ছা ছিল ওকে কাশীতে নিয়ে যাব। হিন্দু ঘরের বউ। বিশ্বেশ্বরের পায়েই আশ্রয় নিক। তা হল না। বিশ্বেশ্বরের ওপর যেমন আমার কোন বিশ্বাস নেই, তেমনি বিশ্ব চিকিৎসার আধার খোদার নামে ছেড়ে দেওয়াটা পাশবিক অত্যাচার মনে হল।

কাশীর চাকরি ছেড়ে এলাম এখানে। ইচ্ছা ছিল, সখিনাকে কাছেই রাখি। তার বুড়ো নানা বাদ সাধল। ঐ ঘরটায় সখিনা থাকে, পাশের বারান্দায় থাকে বুড়ো জব্বার মিঞা। তবুও বুড়ো তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওষুধপত্র পথ্য এনে দিচ্ছে।

পানুদিদি কথা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইল।

বললাম, তোমার কাছে আনলেই ভাল করতে।

তা জানি! কাশী থেকে এসেই তো আমি কাজ পাইনি। কাজ পেয়েছি মাত্র কয়েকমাস আগে। কর্পোরেশনের মাতৃসদনে কাজ পেয়েছি। একবার ভাবছি সখিনাকে নিয়ে আসব। কিন্তু ওকে রাখবার মত ব্যবস্থা তো চাই নইলে সবাইকেই অকালে মরতে হবে।

পানুদিদি বিছানা ছেড়ে সংসারের কাজে নেমে পড়ল।

আমি বললাম, এবার আমার ছুটি।

পানুদিদি মৃদু হেসে বলল, ছুটির দরখাস্তটা আগে করলে ভাল হোত।

বিলম্বিত আবেদন কি মঞ্জুর হবেনা ?

নিশ্চয়ই হবে, তবে বিলম্বে। রান্নার ব্যবস্থা করেছি, এবার রান্না চাপাব। রান্না হবে তার পর খেয়েদেয়ে ছুটি।

আমার ছেলে পড়ানো আছে তা তো জান।

সে তো রাতের বেলায়।

আজ দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে যাব। ল-এর রেজাল্ট বের হবে শুনেছি।

তাতেও অসুবিধা হবেনা। আইন পাশ করেই বা কি করবে। আইনের পরীক্ষায় পাশ করলেই আইনজ্ঞ হয়না। আমার বাবা মোক্তারী করেন। ফৌজদারী মামলায় মহা-মহা উকীলকেও ঘায়েল করে দিতেন। পাশটা দরকার। তবে যোগ্যতাটা নির্ভর করে নিজের মেধার ওপর। রেজাল্ট এমনই বস্তু যা আটকে থাকবে না। বের হলে সংবাদ ঠিক পৌঁছে যাবে তোর কাছে। এবার বসন্তলাল এলেই তাকে নিয়ে আসবি এখানে।

তাকে আনতে হবে কেন, সে নিজের গরজেই আসবে।

বোধহয় আসবে না। আমাকে মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি বলেই মনে হয়েছে সেদিন। হয়ত অভিমান ভাঙ্গতে সময় দরকার।

তোমার ওপর অভিমান কেন হবে ?

সে অনেক কথা। সে সব যাক। অভিমান থাকা ভাল। শিক্ষার অভিমান থাকলে মানুষ বড় হয়, সে কখনও নোংরা কাজ করতে পারে না। দীক্ষার অভিমান থাকলে অপসংস্কৃতির দাসত্ব করে না। যাদের আত্ম-অভিমান থাকে তাদের প্রশংসা করি। অভিমানকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। তুই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস। আমি শুধু সেদ্ধভাত করে নেব। দোকান থেকে এক

বাটি মাংসের ঝোল আনিয়ে নেব। দুজনে বসে বসে খাব আর গল্প করব।

নিরুপায়ের মত বললাম, অগত্যা।

স্নান তো করবি? শাড়ি পরে স্নান কর।

বললাম, বহুৎ আচ্ছা। যেমন আদেশ করবে তেমন তা পালিত হবে।

সামনের ঐ চৌবাচ্চা ভর্তি জল। চল দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্নান করি। ওমা, তুই লজ্জা পাচ্ছিস? এটা যে বস্তিবাড়ি। দেখবি কেমন মেয়েরা গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে স্নান করছে ওখানে। লজ্জাটা বাইরের জন্য, ঘরে ওদের লজ্জা কম।

পানুদি কথা শেষ করে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অবাক হচ্ছিস? আমার উল্টো দিকে যে থাকে সে মিস্ত্রীর কাজ করে। জলকলের মিস্ত্রী। কটক জেলার লোক। ওর বউটা হল বাঁকুড়ার মেয়ে।

বললাম, তাতে তোমার আপত্তি আছে কি?

মোটেই নয়। একজন পুরুষ ও আরেকজন মহিলা যদি স্বামী স্ত্রী হিসেবে সুখেস্বচ্ছন্দে বসবাস করে তাতেই যথেষ্ট। তারজন্য কতকগুলো মন্ত্রপাঠ অথবা উৎসবের কোন প্রয়োজন হয় না। সেটা আমার বক্তব্য নয়। এদের রুচি ও আচার ব্যবহার আমাদের সমাজ-সম্মত নয়। তারজন্য ওদের অনেক সময়ই অসভ্য ইতর মনে করি। অথচ ওটাই ওদের স্বাভাবিক জীবন। সেই অসভ্য ইতর চেহারা তুই দেখবি এখানে। নে চল, এবার স্নান করে আসি।

সার্বজনীন চৌবাচ্চা। স্নানের কোন আব্রু নেই। পানুদিদি কথিত দম্পতির মহিলাটি চৌবাচ্চার উল্টোদিকে বসে সাবান মেখে স্নান করছিল। তার পরিধানে একটা গামছা ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র না থাকায় দৃশ্যটা কদাকার মনে হল। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। পানুদিদি আমার অবস্থা বুঝে মৃদু হাসল।

আমরা মগে করে জল ঢালছি মাথায়। স্নান তখনও শেষ হয়নি।

পানুদিদি বলল, আমাদের সেই যাদববাবুর পুকুরের কথা মনে আছে তোর? সেই যে নবাবী আমলের ইট দিয়ে বাঁধানো ঘাট, সেই বিরাট পুকুর, কালো জল। আমরা সাঁতরে এপার-ওপার হতাম।

বললাম, খুব মনে আছে।

তোদের ভাষায় আমি ছিলাম গেছো মেয়ে। সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া সে সময় মেয়েদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। নষ্টা মেয়ে বলেই সবাই আমার কপালে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে সময় অন্য মেয়ের মত যদি ঘরকুনো হয়ে থাকতাম তা হলে আজ আমি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাস করতে পারতাম না। আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হত।

আমি কোন জবাব না দিয়ে স্নান শেষ করে ঘরে ঢুকলাম।

পানুদিদির কথা যেন শেষ হতে চায় না।

খেতে বসে মাঝখানে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পানুদিদি, আমি তো বাইরের লোক। আমি কে, কেন এসেছি, এসব এরা জানতে চাইবে কি?

হো-হো করে হেসে উঠল পানুদিদি। হাসির ধাক্কায় মুখের ভাত ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। হাসি থামিয়ে বলল, কেন জানতে চাইবে? ওদের বাড়িতে যারা আসে তাদের কথা জিজ্ঞেস করার আমার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি ওদেরও প্রয়োজন হয় না আমার কথা জানার। এইসব বস্তিবাড়িতে সারা ভারতবর্ষকে খুঁজে পাবি। কেউ উড়িয়া, বউ তার বাঙ্গালী; কেউ বাঙ্গালী, বউ তার খোট্টা; কেউ মাদ্রাজের, কেউ পাঞ্জাবের, কেউ আবার আফগানিস্থানের। কারও সঙ্গে কারও কোন সামাজিক বন্ধন নেই, সামাজিক স্বার্থ নেই, অর্থনৈতিক লেনদেন নেই। এরা কেন জানতে আসবে অপরের বিষয়।

খাওয়ার পর পানুদিদি দরজা বন্ধ করে বলল, শুয়ে পড়, বিশ্রাম কর।

আমি বললাম, তুমি শোও, আমি মেঝেতে মাদুর পেতে নিচ্ছি।

পানুদিদি হো হো করে হেসে উঠল। যেন কত হাসির কথা। হাসি থামিয়ে বলল, তুই বিছানায় শো, আমি তোর পাশে শুচ্ছি। কি ভাবছিস? এক বিছানায় নারী-পুরুষ পাশাপাশি শুলে সম্পর্কটা কটু মনে হবে? তুই সেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগেই আছিস। যৌনচিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা করতে শিখিস নি বুঝি? পৃথিবীতে অনেক কাজ করার আছে। যৌনজীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এটা শাশ্বত তবে বিলাস নয়। যৌনবিলাসে ঘেন্না ধরে গেছে। পুরুষমানুষ যদি নারীর দুর্বলতার সন্ধান পায় অথবা কোন অধিকার লাভ করে তা হলে তা যে কত কুৎসিৎ হয় তা তুই বুঝবি না। তুই ভয় পাসনা, ননা। তোর পানুদি পাথর হয়ে গেছে, তার গায়ে আঁচড় কাটার মত হাতুড়ি-বাটালি-ছেনি এখনও তৈরী হয়নি।

অমিয় তরফদারকে অমিয়দা বলে ডাকতাম। আমাদের চেয়ে দু'-তিন বছরের সিনিয়র।

পরীক্ষার ফলের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছি। পাশ করলে কি করব তাও ভাবছি। ভাবছি কিম্ অতঃপরম্। মানসিক ভারসাম্য কিছু হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় অমিয় তরফদার এসে হাজির হল বসন্তলালের মেসে। আমিও ছিলাম সেখানে। অমিয়দাকে দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাদের সুপরিচিত বিপ্লবীর বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তবুও উৎসাহের সঙ্গে বললাম, আরে অমিয়দা যে, কি খবর?

অমিয় তরফদার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক্, শেষ অবধি তোদের হদিশ বের করেছি। রীতিমত কলম্বসের মত আবিষ্কার।

তা তো বুঝলাম। হঠাৎ আমাদের ওপর তোমার নেক নজর পড়ল কেন ?

একটা জরুরী কাজে এসেছি ভাই। বসন্তের সঙ্গে শেষ দেখা সেনট্রাল জেলে। আমার ট্রায়াল হচ্ছিল আর বসন্ত বহরমপুর যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। জেল থেকে এসে দেখি কে কোথায় চলে গেছে।

তা তো বুঝলাম। তোমাদের নেতা সত্যদা তো বহাল তবিয়তেই আছে। দরকার মেটাতে সত্য সরকারের মত যোগ্য লোক আর নেই। সেখানে যাওনি কেন ?

সেই জন্যই তো এলাম।

ভাল কথা। এবার একটু চা খাও। সুস্থির হয়ে বস। তারপর কথা হবে।

চা খেতে খেতে বলল, জানিস তো যুদ্ধ চলছে।

খুব জানি। রাতের বেলায় রাস্তার আলোতে ঠুলি পরানো দেখে যুদ্ধকে ভালভাবে জানতে পারছি। ওদিকে জাপানীবাবুরা এবার বাঁশী বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। শহরের মানুষ তো ছুটছে বাইরে কোথাও যদি মাথা ও জান বাঁচাবার মত আশ্রয় পায়।

অমিয় তরফদার বলল, এই যুদ্ধ কত দিন চলবে রে ভাই ?

তা কে বলতে পারে।

গিয়েছিলাম সত্যদার কাছে।

কেন ?

কোন কাজকর্মের সন্ধানে। সত্যদা বলল, তুমি তো ম্যাট্রিক পাশও করনি, তোমাকে কোন কাজে ঢোকাব বল।

বসন্ত হেসে বলল, স্বদেশীওলাদের একটা কোয়ালিফিকেশনের দরকার, সেটা হল কোনক্রমে ম্যাট্রিক পাশ ? এই তো সত্য সরকারের বক্তব্য বিষয়।

আহা শোন আগে। সত্যদা বলল, সরকারী চাকরি তোমার

হবে না, ভরসা প্রাইভেট জব। তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল কর্পোরেশন কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ না হলে সেখানেও ঢোকানো সম্ভব নয়।

তুমি কি বললে?

আমার আর বলার কিছু থাকতে পারে কি? সত্যিই তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে জেলে গেলাম দেশসেবার অপরাধে, দোষ তো আমার। পড়ার সময় পেলাম কোথায়? অবশেষে সত্যদা বলল, দেখি কোন অফিসে পিওন-টিওনের কাজ যদি পাওয়া যায়।

বসন্তলাল হো-হো করে হেসে উঠল।

আমি বললাম, আমি যদি সত্যদার কাছে চাকরির উমেদারী করতাম তাহলে সত্যদা বলত, 'তুমি ওভার কোয়ালিফায়েড্। তাইতো! কোথায় তোমাকে ঢোকাব ভাবতে হবে। দেখি কি করা যায়।' আরও কিছু মিঠে মিঠে কথা বলত। সে সব কথা শুনতে অভ্যস্ত নই; তাতে হয়ত ঘাবড়ে যেতাম। সত্য সরকার তার মিথ্যার পুঁজি নিয়ে আইন সভায় নির্বিবাদে যাতায়াত করত। আমি ডাস্টবিনে গিয়ে পড়তাম।

তা হলে তোমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

সে রকম দুর্ভাগ্য এখনও হয় নি। ভবিষ্যতে হতে পারে। তবে অমিয়দা তোমার উচিত সত্য সরকারের মারফৎ চাকুরি আদায় করতে আবার স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং ম্যাট্রিকটা পাশ করা।

ঠাট্টা করছিস নন্দা। জানিস আজকাল সত্যদার কি পজিশ্যন। তার পেছন ছাড়া উচিত নয়। একটা হিল্লে সে করবেই। পথও বাৎলে দিয়েছে।

পথটা পরে বলবে, একটা পুরানো কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, শুনবে? বলেই বসন্তলাল অমিয় তরফদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসন্তলাল আবার বলল, শোনা তোমার দরকার। সত্য

সরকারের মোহ ত্যাগ কর। একটু সাবধান হও। সেই কাঁঠাল গাছের কথা মনে আছে। আমাদের পুকুরপাড়ের কাঁঠাল গাছ।

অমিয় তরফদার হেসে বলল, ওটা কি ভুলতে পারি। কাঁঠাল গাছই আমার কাল হয়েছিল।

সত্য সরকার আমার দিদির কাছে একটা রিভালবার আর কার্তুজ রাখতে দিয়েছিল। দিদি তখন ঘোরতর বিপ্লবী। সে বোধহয় সত্য সরকারকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল, সেজন্য এই গুরুতর কাজটি করতে সাহস পেয়েছিল। দিদি ওগুলো ঘরে রাখতে সাহস পায়নি। একটা হাঁড়িতে করে কাঁঠালগাছ তলায় পুঁতে রেখেছিল। এই ঘটনা জানত একমাত্র আমার দিদি। দিদি শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে ওগুলো ফিরিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিল। সত্য সরকার কিন্তু দিদির সঙ্গে দেখা করেনি।

অমিয় তরফদার বিস্মিতভাবে বলল, এসব তো আমি জানি না।

জানা উচিত নয়। সত্য সরকার যখন এল না তখন দিদি ননাকে বলে গেল, কাঁঠালগাছ তলায় একটা হাঁড়ি পোঁতা আছে। এই খবরটা সত্য সরকারকে জানিয়ে দিতে বলেছিল। সেই হাঁড়িতে কি আছে তা ননাও জানত না। ননার সন্দেহ হয়েছিল। আমাকেও বলেছিল। আমরা মাটি খুঁড়ে বস্তুগুলো দেখে আবার মাটি চাপা দিয়ে রাখলাম। খবরটা সত্য সরকারকে গোপনে জানানো হল। অর্থাৎ সেই রিভালবারের ঘটনা জানতাম আমরা দুজন, সত্য সরকার আর আমার বড়দিদি। ঘটনা যা ঘটল তাতো তুমি হাড়ে হাড়ে জান। তোমরা মাটি খুঁড়ে রিভালবার আনতে গিয়ে পুলিশের হাতে পড়লে। কি করে পুলিশ জানল, অমুক দিন অমুক সময় কাঁঠালগাছ তলা থেকে তুমি আর অবিনাশ রিভালবার আনতে যাবে? এই বিষয়ে কখনও অনুসন্ধান করেছ কি?

অমিয় তরফদারের চোখ তখন ছানা বড়ার মত হয়েছে।

বসন্তলাল বলতে থাকে, আমরা যদি সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাস-

ঘাতকতা না করি স্বয়ং তোমাদের ভগবানের সাধ্য কি আমাদের খবর পায়। বড়দি ছিল না, বাকি থাকলাম আমি, ননা আর সত্যদা। আমার আর ননার পক্ষে দিন ক্ষণ জানা কোন মতেই সম্ভব নয়। বাকি থাকল সত্য সরকার। শুধু তুমিই নও অমিয়দা, তোমার মত অনেক অনেক অনুগামীকে সত্য সরকার জেলে পাঠিয়ে পকেট ভারী করেছে। এই সত্য সরকারের কাছে গিয়েছিলে কাজের প্রত্যাশায়। কেমন কাজ পাবে তাতো বুঝতেই পারছ।

অমিয় তরফদার ইতস্তত করে বলল, কিন্তু সত্যদা আমাদের নেতা ছিলেন, তার পক্ষে এসব করা কি সম্ভব।

অসম্ভব নয়। বিপ্লবী আন্দোলনে সত্য সরকারকে কখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করে নি। গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেই একবার ছয়মাস জেলে ছিল। বেইমানী করার পুরস্কার পেয়েছে সত্য সরকার, এম-এল-এ হয়েছে। আমরা দুর্ভাগ্যের পদধ্বনি শুনছি। তোমরা এখনও শুনতে পাওনি, আশ্চর্য! তুমি মনে করছ অসম্ভব! অমিয়দা, তুমি ভুলে যেওনা আমরা হলাম নিম্নবিত্তের মানুষ। আমাদের ধর্ম হল জলের স্রোতে গা ভাসিয়ে স্বার্থরক্ষা করা। কোন দেশেই এই সব মানুষ বিপ্লব ঘটায় নি, ঘটাতে পারে না। অথচ বিপ্লবে আমাদের ঘরের ছেলেরাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। সেটা হল ব্যতিক্রম। তোমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে। যদি সফলও হোত তা হলে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হত না। উপকৃত হত সত্য সরকার জাতীয় লোকেরা আর যারা চিরকাল বিপ্লব বিরোধী।

আমি বললাম, অমিয়দা ম্যাট্রিকটা পাশ তোমাকে করতে হবে। এই যুদ্ধেই ইংরেজের পতন ঘটবে। দেশ স্বায়ত্বশাসন পাবে অথবা স্বাধীন হবে। সেদিন এইসব সত্য সরকার দধির অগ্রভাগ ভক্ষণ করবে, ওদের হাতে ক্ষমতা যাবে, তোমরা অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে। সেদিনও তোমাকে ও বলবে ম্যাট্রিক পাশ করনি, তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না ভাই।

অমিয় তরফদার প্রশ্ন করল, এই যুদ্ধে জার্মান জিতবে বলতে চাও।

বললাম, আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। ইংরেজ হারবে বললে জার্মানের জয় হবে এটা কেন মনে করছ। জার্মান জিততে পারবে না। ইংরেজ চেষ্টা করবে যুদ্ধকে টেনে দীর্ঘস্থায়ী করতে। জার্মানরা চাইবে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে। ইংরেজ জানে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তার বিশাল সাম্রাজ্য শোষণ করে অর্থসম্পদ জনবল দিয়ে জার্মানকে পরাজিত করতে পারবে। জার্মান পড়বে অর্থ সঙ্কটে। তখনই ইংরেজের জয়। ইংরেজ এই জয়ের জন্য যে মূল্য দেবে তারপর কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সামর্থ্য তার থাকবে না। তার বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গবে, ইংরেজেরও পতন ঘটবে।

তাই বল।

সেই জন্যই তো তোমাকে বলছি ম্যাট্রিকটা পাশ করে নাও।

সেই স্বদেশী অন্দোলনের সময় ওরা বলেছিল, লেখাপড়ার দরকার নেই। সংগ্রাম কর। লেখাপড়া শেখার অনেক সুযোগ পাবে দেশ স্বাধীন হলে।

আমি হেসে অমিয় তরফদারকে আপ্যায়িত করলাম।

বসন্তলাল বলল, যেমন সুযোগ সত্য সরকার পেয়েছে।

অমিয় তরফদার বাধা দিয়ে বলল, আমি যে কাজে এসেছিলাম সেটাই বলা হয়নি। সত্যদার কথা বলতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেছে।

বললাম, তাই তো, তোমার দরকারী কথাটাই শোনা হয় নি।

অমিয় তরফদার ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলল, সত্যদা একটা প্রোপোজাল দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি প্রোপোজাল ?

বলেছে, যারা স্বদেশী করেছে তাদের সামনে একটা মহৎ পথ

খোলা আছে। সেটা তোমরা করতে পার। জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ?—গঠনমূলক।

বসন্তলাল হেসে বলল, চাঁদা তোল আর ভোজন কর। এর চেয়ে মহৎ গঠনমূলক কাজ আর কি আছে?

অমিয় তরফদার ক্ষুব্ধভাবে বলল, চাঁদা না তুললে আমরা কাজ করতে পারি কি। চাঁদা সংগ্রহ করতে হয় অন্য পথ না থাকায়।

আমি বললাম, সেটা স্বীকার করি। চাঁদার টাকা কোথায় যায় সেটা কি জানো? তোমরা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করেছ। সেই টাকা কোথায় গেছে? সে সব খবর রাখ কি? তোমরা বলবে বিপ্লবীদের ভরণ-পোষণ করতে, মামলা-মোকর্দমা চালাতে খরচ হয়েছে। অর্থাৎ বিপ্লবীরা দেশের মানুষের কোনরূপ সহযোগিতা যেমন পায়নি তেমনি সহানুভূতিও পায়নি। তোমাদের দুটো ভাত দিতে দেশের লোক এগিয়ে আসেনি। মামলা-মোকর্দমায় উকীল-মোক্তারদের পয়সা দিতে হয়েছে। এই তো তোমাদের অবস্থা ছিল। এ থেকে কি বুঝতে পারছনা কোথাও না কোথাও বিপ্লবচিন্তার গুরুতর ত্রুটি ছিল। সাম্প্রদায়িকতাও তোমাদের গ্রাস করেছিল। কালীবাড়িতে যে শপথ নিতে, সেখানে মুসমমান, ক্রীশ্চানদের প্রবেশ পথ ছিল রুদ্ধ। তাই তাদের তোমরা পাশে পাওনি। এবার গঠনমূলক কাজে নেমেছ। চাঁদা তুলবে। তাতে আপত্তি নেই তবে সত্য সরকারের মত কটা সৎলোক তোমাদের সঙ্গে আছে জানিনা। নেহাৎ কম হবেনা। তারা চাঁদার টাকা উদরস্থ না করে ছাড়বেনা।

অমিয় তরফদার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তা বটে। সত্যদা বললেন বৈজ্ঞানিক খামার কর। দেশের লোক যাতে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা শিক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা কর। গ্রামে গ্রামে সম্ভব হলে নাইট স্কুল কর। রোগীর সেবা কর। মৃতদেহের সৎকার কর।

বসন্তলাল বলল, উত্তম প্রস্তাব। এই সব কাজ করতে গেলে বন্ধন স্বীকার করতে হবে। বিপ্লবীদের জীবনে বন্ধন থাকা উচিৎ কি?

বন্ধনমুক্ত মানুষই তো বিপ্লবকে সফল করতে পারে। তোমরা আরও বন্ধন সৃষ্টি করতে চাইছ। এতে ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবে। দেশের স্বাধীনতা অনেক পিছিয়ে যাবে। তার চেয়ে জনতার সংগঠন গড়ে তুলতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দাও, তাদের জানতে দাও অর্থ-নৈতিক এই দুরবস্থার মূল কারণ। এটাই হবে বড় গঠনমূলক কাজ। সেকথা নিশ্চয়ই সত্য সরকার তোমাদের বলেনি।

অমিয় তরফদার এই সব কুট তর্কের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবুও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল, আমাদের এই সামাজিক কাজের মাঝে মানুষকে টেনে আনতে পারলে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব।

তোমরা প্রলোভন সৃষ্টি করতে চাও। এই মানুষগুলোর মনে যদি স্থান করে নিতে চাও তাহলে তাদের বাস্তব সাহায্য করার চেষ্টা কর। লোভে অথবা হুজুকে যারা আসবে তারা অবশ্যই তোমাদের ছেড়ে পালাবে। জন-জাগরণটা আসার ওটা পথ নয়।

অমিয় তরফদার বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোমরা এই প্রোপোজালকে সমর্থন করনা।

আমি বললাম, ঠিক তা নয়। আমরাও তোমার পাশে থাকতে রাজি। আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন হল জনসংযোগের মাধ্যমে জন-জাগরণ। সেটা এদেশে সম্ভব করার কোন থিসিস তোমাদের আছে কি? সেই থিসিস শোনাও। আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করলেই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। চাঁদা তোলা মহৎ কাজ নয়। যে সমাজে মহৎ কাজ করতে চাঁদা তুলতে হয় সে সমাজে ঘুণ ধরে সহজেই। চাঁদার খাতায় দেশ ভর্তি হয়ে যাবে। গৃহস্থ ঘর ছেড়ে পালাবে চাঁদার ভয়ে। রোয়াকবাজদের পোয়াবারো হবে।

বসন্তলাল বলল, তোমরা তো তোমাদের কাজ উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছ।

অমিয় তরফদার বলল, ইচ্ছা করে তা রাখা হয়নি। মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনা।

কেন করেনা? সে কারণটা খুঁজে দেখ। এটা সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি। অথচ রাজনৈতিক দল সম্প্রদায়িকতার উর্ধে। ধর্ম কেন রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করে সেটা ভেবে দেখ। দোষটা ওদের, না আমাদের সেটাও ভেবে দেখ।

অমিয় তরফদার রণে ভঙ্গ দেবার সুযোগ খুঁজছিল। বলল, এসব পরে আলোচনা করব। এবার চলি ভাই। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

বললাম, তোমার তো যাওয়া হবেনা। বসন্তলালের মেসে আমার আজ নেমতন্ন, তুমিও আমাদের সঙ্গে দুটি খেয়ে ফিরে যেও।

অগত্যা অমিয় তরফদার সম্মত হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অমিয় তরফদার একটা বিড়ি ধরিয়ে বসন্তলালের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বসন্তলাল বলল, আচ্ছা অমিয়দা তুমিতো এতকাল রাজনীতি করছ। ম্যাট্রিক পাশ না করলেও রাজনীতি-সমাজনীতি সম্বন্ধে তো তুমি অজ্ঞ নও।

অমিয় তরফদার বসন্তলালের বক্তব্য বুঝতে না পেরে একগাল ধুঁয়ো ছেড়ে উঠে বসল। বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, তা বলতে পারিস। এগুলো কিছু বুঝি।

ভারতবর্ষ বলতে তুমি কি বোঝ?

কেন? আসমুদ্র হিমাচল এই মহাভারতকে বুঝি।

বসন্তলাল বলল, অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষ।

জোর দিয়ে অমিয় তরফদার বলল, অবশ্যই।

আমি বললাম, ভারতবর্ষ কোন কালেই ভারতবর্ষ ছিল না। নানা ভাবে বিভক্ত ভারতকে শাসন করত নানা রাজা মহারাজা বাদশা সুলতানরা। ভারতবর্ষকে দেখতে ও চিনতে শিখিয়েছিল ইংরেজ। সাম্রাজ্যবাদী হস্ত প্রসার করে ইংরেজ উপমহাদেশের যতটা অংশ

দখল করেছিল বিগত শতাব্দীতে তারই নাম দিয়েছিল ভারত। তার সঙ্গে বর্মাও জড়িত। ধীরে ধীরে শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হল। অর্থনৈতিক স্বার্থে জড়িয়ে পড়ল বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের পাঞ্জাবের মানুষরা। অর্থাৎ এই এক কেন্দ্রিক শাসন ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা জন্ম দিয়েছিল ভারতকে।

অমিয় তরফদার বলল, ভারতবর্ষ ছিল না বলতে চাস ?

হাঁ অমিয়দা, যা ছিল তাকে বলা যায় ভারত উপমহাদেশ। তাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন সতত বৈরী ভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ নামক দেশ ও ভারতীয় নামক জাতীয়তাবোধের চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। ইংরেজের আগ্রাসন দেখেই রাজা রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন ভারত উপমহাদেশ আর খণ্ড-বিখণ্ড থাকবে না। তারই মনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর উদ্গম হয়েছিল। যে জাতীয়তাবাদের বড়াই আমরা করি তার জন্ম দিয়েছিল এই মহাপুরুষ।

অমিয় তরফদার বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি তো তোমার মত লেখাপড়া শিখিনি ভাই, এসব আমার জানা নেই।

তুমি রাজনীতি কর অথচ ভারতীয় রাজনীতির মূল কথা যে জাতীয়তাবাদ তারই ইতিহাস জান না ; এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছিনা।

ওসব কচকচি ছেড়ে দে। দেখছিস তো যুদ্ধের দামামা জোর বাজছে। এবার কি করব ভাই বল।

বোম্বের দিকে তাকিয়ে থাক।

মানে ?

মানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছে। গান্ধীজি পরম দেশভক্ত বিড়লা-পরিবারের রামেশ্বর বিড়লার বাড়িতে বসে বিড়লার সেবা গ্রহন করে গরীব ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আলাপ আলোচনা করছেন। আমাদের মত যারা দুর্দশাসম্পন্ন তাদের কি

ব্যবস্থা উনি করবেনই। হয় জেলখানায়, না হয় রাজপ্রাসাদে। বুঝলে অমিয়দা। আমরা যেমন সব চিন্তার ও সমস্যার আধার মনে করি পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে তেমনি আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের জন্য নির্ভর করি গান্ধীজির ওপর। তার ওপর নিজেকে ছেড়ে দাও অমিয়দা। একটা কিছু হবেই।

অমিয় তরফদার অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। আমিও বের হলাম পান্নুদিদির সঙ্গে দেখা করতে।

পান্নুদিদির বাড়ি গিয়েই ব্যস্ততা লক্ষ্য করে বললাম, এত ব্যস্ততা কেন পান্নুদি?

বাড়ি বদল করছি। ভালই হয়েছে তুই এসে গেছিস। এবার আমার কাজ কমল। খুব ভাল বাড়ি পেয়েছি রে ননা। বাড়িঘর ছেড়ে বাবুরা সব পালিয়েছে। এবার বাড়িওলাদের মাথায় হাত। যে বাড়ির ভাড়া ছিল চল্লিশ টাকা তা পেয়েছি আঠারো টাকায়। দু খানা শোবার ঘর। রান্নার জায়গা, কল পায়খানা আলাদা। সব গুছিয়েছি, একটা গাড়ি ডেকে ব্যবস্থা করে নিয়ে চল। ব্লাক-আউটের রাত। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে।

বললাম, তাতো বুঝলাম। কিন্তু কোথায় সেই বাসা?

পান্নুদিদি লজ্জিতভাবে বলল, তাইতো রে, সেই কালীঘাটের নকুলেশ্বর তলায়।

একেবারে মুরারীপুকুর থেকে কেওড়াতলা। বহুৎ আচ্ছা। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখছি। একটাতে হবে তো?

হাঁ, হাঁ হবে। যা শীগ্গীর। চারটে বেজে গেছে। তারপর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। যদি একটা ট্যাক্সি পাস ডেকে আনিস্। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। আমার বইগুলো নিয়েই যা অসুবিধা। আর সবই আমার ঐ বড় ট্র্যাঙ্কটায় ভর্তি করে দিয়েছি।

আমি ট্যাক্সি ডেকে আনলাম। মালগুলো উঠিয়ে গাড়িতে

বসলাম। পানুদিদি গাড়িতে উঠে বসল, সঙ্গে আরেকটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে।

মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে পানুদিদি বলল, এর কথা তোকে বলা হয়নি। বলবই বা কখন। তুই তো অনেকদিন আসিসনি। এর নাম চারুলতা, আমি নাম দিয়েছি ক্ষুদে। আমার সঙ্গেই রয়েছে প্রায় পনের-বিশ দিন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম। কোন কথা বললাম না।

কলেজ স্ট্রীট ধরে যখন গাড়ি ছুটছে তখন বললাম, তোমার সখিনার খবর কি?

সখিনার নাম করতেই পানুদিদির চোখ ছল-ছল করে উঠল। আঁচলে চোখ মুছতেই বুঝলাম সখিনা মারা গেছে। পানুদিদি কিছু বলার আগেই বললাম, আর বলতে হবে না। বুঝেছি।

পানুদিদি খেদের সঙ্গে বলল, বড়ই কষ্ট পেয়ে মরেছে রে। অনেককে লড়াই করতে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে কিন্তু এত বড় আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই করতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। মরাটাই ওর বাঁচা। মরেই বেঁচেছে।

পানুদিদি থেমে গেল।

ভাবছিলাম পানুদিদিও একটি মেয়ে। সে নিজে আত্মবিশ্বাস ও অদম্য দুঃসাহস নিয়ে পথে নেমেছিল বলেই সখিনার দুঃসাহসকে সম্মান দেখাতে পারছে।

যদুবাবুর বাজারের কাছে এসে বললাম, আবার মায়াতে জড়াচ্ছ কেন পানুদি?

ক্ষুদের কথা বলছিস? ঠিক মায়া নয় রে ননা, এটা সামাজিক কর্তব্য।

ভালকরে ক্ষুদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

পানুদিদি বলতে লাগল; ক্ষুদের বাবা কাজ করত রেল কোম্পানীতে। মা মরেছে ক্ষুদেকে জন্ম দিয়েই। বাবা হয়ত আবার

ঘর-সংসার পেতে বসত তার আগেই রেলের চাকায় ইহকালের ঋণ মিটিয়েছে। বাবা-মা হারা মেয়েটা ছিল মামার বাড়িতে। লেখা-পড়াও বিশেষ শেখেনি। মামার বাড়িতে ঝি-চাকরের সব কাজ করত। এই ড্রাইভার বাঁয়ে চল। এসে গেছি।

ক্ষুদের কাহিনী আর শোনা হল না। নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে যেতেই গল্পকথা না শেষ করেই মালপত্রের ব্যবস্থা করতে হল।

বেশ বাসা পেয়েছে পানুদিদি। নিরাপদে থাকার মত বাসা। বাড়িওলা তখনও কলকাতা ছেড়ে পালায়নি। অন্যান্য তিনজন ভাড়াটিয়া নিপাত্তা, তাদের ফ্লাটগুলো তালা বন্ধ।

সন্ধ্যা পর্যন্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পানুদিদি বলল, আজ খেয়ে-দেয়ে যাবি ননা। তাড়াতাড়ি খিঁচুড়ি আর ডিমভাজা করে নেব। ক্ষুদে এসব কাজে ওস্তাদ। পারবিতো ক্ষুদে?

ক্ষুদে মাথা নেড়ে বলল, খুব পারব। তুমি বরং বিশ্রাম কর দিদি, আমি ঘর-সংসার গুছিয়ে এখুনি তোমাদের গরম গরম খিঁচুড়ি খাওয়াচ্ছি। কাঠ-কয়লা উনুন সবই আছে। চাল-ডালও আছে। ডিম আছে কি?

আছে রে আছে। নীল রং-এর কৌটাতে তিনটে ডিম আছে। আলু-পেঁয়াজও আছে। তুই ওদিকে দেখ। আমি বিছানাপত্র সাজিয়ে গুজিয়ে নিচ্ছি।

আধঘণ্টার মধ্যে পানুদিদির সংসার সাজানো শেষ।

ক্ষুদে তখন রান্নায় ব্যস্ত।

বললাম, ক্ষুদের কাহিনী শেষ হয়নি পানুদিদি।

ঠিক বলেছিস। ক্ষুদেকে পেলাম হাসপাতালে। কার সঙ্গে এসেছিল জানিনা তবে হিস্ট্রি শিট দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার ছেলে কোথায়?

ছেলে তো নেই, বলেছিল ক্ষুদে।

কেমন বোকা বনে গেলাম। আফটার ডেলিভারী কেস। অথচ সন্তানের হদিস নেই। অন্তত ডেড লেখা থাকা দরকার।

ডাক্তার মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডাক্তার মুখার্জি বলল, ঘটনাটা খুব কমপ্লিকেটেড। এর বেশি জেনে কাজ নেই সিস্টার।

একদিন ক্ষুদে বলল, মামার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম দিদি। মামার শালা অসিত খুব আসা-যাওয়া করত। তারপর যা হয়। তার ধাপ্পায় আমার সর্বনাশ আমি নিজেই ডেকে এনেছিলাম। এই হাসপাতালে কখন ও কবে যে ভর্তি করে দিয়েছিল তা জানিনা। জ্ঞান হতে দেখলাম এই বিছানায় শুয়ে আছি।

ক্ষুদে ধীরে ধীরে সেরে উঠল।

ডাক্তার লিখে দিল, ডিসচার্জ।

ক্ষুদেকে বললাম, তুমি সুস্থ হয়েছ, এবার বাড়ি যেতে পার।

আমার তো কোন বাড়ি নেই। মামার বাড়ি যাবার উপায়ও নেই। ইচ্ছাও নেই। কোথায় যাব দিদি?

ভাবিয়ে তুলল ক্ষুদে। প্রথমে ভাবলাম দু'একদিন আমার কাছে রেখে কোথাও কোন ঘরের কাজে লাগিয়ে দেব। নিয়ে এলাম নিজের কাছে।

তারপর এমন করিতকর্মা মেয়েকে পথে ছেড়ে দিতে মন চাইলনা। রেখে দিলাম আমার কাছে। তারপর শুনলাম তার বাবার কথা মায়ের কথা। ছাড়তে পারিনি, পারব কিনা তাও জানিনা। ক্ষুদে সামান্য ভুল করেছিল। এবারে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেব।

আমি অভিনিবেশ সহকারে শুনছিলাম।

কি ভাবছিস?

ভাবছি তোমার ক্ষুদের মত কয়েক হাজার মেয়ে আছে বাংলা দেশে।

আমার যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে এই মেয়েদের এনে কাছে

রাখতাম। কাজ শেখাতাম, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতাম। মানুষ যা ভাবে সেতো কোন কালেই হয়না। যাদের করার মত সামর্থ্য আছে তাদের মন নেই। যাদের মন আছে তাদের সামর্থ্য নেই। কেমন একটা বাস্তব কন্ট্রাডিকশন, অবশ্য রাষ্ট্রের অনুদার ব্যবস্থাই এর জন্য বেশি দায়ী।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পানুদিদি।

ক্ষুদে এসে সিগন্যাল দিল, খিঁচুড়ি ডিম ভাজা রেডি।

পাশাপাশি খেতে বসেছি। ক্ষুদে নিপুণ গৃহিনীর মত পরিবেশন করছে। খেতে-খেতে পানুদিদি জিজ্ঞাসা করল, তোর বন্ধু বসন্তলালের খবর কি ?

বসন্তলাল আমার মত ধান্দায় ঘুরছে। বাগবাজারের দিকে একটা খালি বাড়ি পেয়েছে, সেটা লীজ নিচ্ছে। সুযোগ পেয়ে নসীব তৈরী করতে নেমেছে।

গোটা বাড়ি লীজ নিয়ে কি করবে ?

আবার যখন কলকাতায় লোক ফিরে আসবে তখন ভাড়াটে বসাবে। সাতাশ বছরের লীজ। তার ওপর নৃপেনকাকা নাকি তাকে লিখেছে, কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে। তারই পটভূমি তৈরী করছে।

পানুদিদি হেসে উঠল।

হাসছ কেন ?

বাবা হলেন ভবিষ্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। তিনি বুঝতে পেরেছেন তার অন্যান্য পুত্রকন্যাদের দায়-দায়িত্ব বহন করার যোগ্যব্যক্তি বসন্তলাল এবং তাদের মানুষ করে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল কলকাতা। তাই সর্বাগ্রে আস্তানা গড়ছেন। আরেকটা উদ্দেশ্য হল বসন্তকে রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করা। ছোট শহরে বসন্ত আবার রাজনীতিতে যত সহজে জড়িয়ে পড়বে অত সহজে জড়িয়ে পড়বেনা কলকাতায়।

সব বাবা চায় তার সন্তান বিপন্মুক্ত থাকুক। বিশেষ করে আমাদের মত ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের এটাই হল নিয়ম।

পানুদিদি গরম খিঁচুড়িতে ফুঁ দিতে দিতে বলল, তুই কি ঠিক করেছিস? কলকাতায় প্র্যাকটিশ করবি? তাহলে এই সুযোগে একটা বাড়ি লীজ নিয়ে নে।

বললাম, আমি কিছু ঠিক করিনি পানুদিদি। প্র্যাকটিশ করতে হলে দু'তিন বছরতো বিশেষ কোন উপায় হবেনা। উপার্জন প্রয়োজন মত করতে অনেক সময় দরকার হবে। ততদিন খরচ চালাতে পারব কি? কোট-প্যান্টের দামই হয়ত দিতে পারবনা। তার চেয়ে যুদ্ধের বাজারে একটা চাকরি হয়ত সহজেই মিলে যেতে পারে। কতকগুলো ব্যাঙ্ক-এর মধ্যেই গজিয়েছে, তাতেই ঢোকার চেষ্টা করব মনে করছি।

পানুদিদি গম্ভীর হয়ে গেল।

তার এই ভাবান্তর যে কেন ঘটল তা বুঝতে পারলাম না। একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে থাকি আর গরম খিঁচুড়ি মুখে তুলতে থাকি।

খাওয়া শেষ করে উঠবার আগে বললাম, আমি চাকরি করি তা বুঝি তুমি চাওনা?

অন্যমনস্কভাবে পানুদিদি বলল, না চেয়ে তো উপায় নেই। বসন্ত তার পিতৃস্নেহ পাবে। পিতার আর্থিক সাহায্য পাবে। তোরতো এসব কিছু নেই। তোকে লড়াই করতে হবে। তার জন্য এক্ষেত্রে চাকরি করা ভিন্ন পথ কোথায়। জানিস ননা, আমার বাবা যতই রক্ষণশীল হোন তার বৈষয়িক বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনা। পৃথিবীতে যাই ঘটে ঘটুক আমার সন্তানদের গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। আমার বাবাও দেশপ্রেমিক, বাবাও চান ইংরেজ বিদায় হোক। তারজন্য ত্যাগ স্বীকার করুক অন্যের সন্তান, নিজের ঘরে যেন বেনো জল না ঢোকে। তোকেও সেই পরামর্শ দিতে পারতাম, কিন্তু তোকে তো চিনি। তুই মানিয়ে চলতে পারবি কি?

তোমার কথা অস্বীকার করতে পারছিনা। তুমিতো মানিয়ে চলতে পারনি, সেজন্য তোমার ভয় বেশি। আমিও হয়তো মানিয়ে চলতে পারবনা, তবে সামনের দিনের দিকে তাকিয়ে ধৈর্যহানি না ঘটাবার দুরন্ত চেষ্টা করব। তবে আদালতে যাবার আমার কোনই ইচ্ছা নেই।

কেন? গান্ধিজীর মত মিথ্যা মামলা নেবনা প্রতিজ্ঞা করেছিস বুঝি?

তা নয় পানুদি। বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রি যদি করতেই হয় তা করব সমাজের মঙ্গলের জন্য, কোন অন্যায়কারী অথবা আসামীর ভাড়াটিয়া লোক সেজে কথার পাহাড় তৈরী করবনা; এটাই আমার ইচ্ছা।

পানুদিদি ঘর পরিষ্কার করে শোবার ঘরে আসতেই বললাম, এবার ছুটি।

অবশ্যই। তবে এই রাতে গাড়ি পাবি কি? ব্ল্যাক-আউটের রাতে বাইরে না যাওয়াই ভাল।

তবুও যেতে হবে পানুদি। কাল সকালেই যে অনেক কাজ।

বছরের পর বছর কাটে। যুদ্ধের গতি ঘোরাল হতে থাকে।

বসন্তলাল গেছে তার লীজ নেওয়া বাড়িতে। আজকাল আদালতে যাচ্ছে। আমিও সোনার-ভারত ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছি।

সত্য সরকার আজকাল বেকার।

আইন-সভা বাতিল। মন্ত্রীসভা বাতিল; গভর্ণর কেসিসাহেব বাংলার প্রশাসন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।

জাপান বর্মায়, সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে।

ওদিকে মস্কোর দরজায় কানমলা খেয়ে জার্মান সৈন্য পিছু হটছে। স্টালিনগ্রাড অবরুদ্ধ।

রেড়িও সোনান থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের নিত্যকার ঘোষণা শুনছে দেশের মানুষ চুপি চুপি।

চট্টগ্রামে বোমা পড়েছে। খিদিরপুর ডক বোমার ঘায়ে কিছুটা বিপর্যস্ত। কোহিমায় আজাদ-হিন্দ বাহিনী এসে গেছে। মনিপুর থেকে ইংরেজ সৈন্য পালিয়ে এসেছে।

দুর্ভিক্ষে আর কালোবাজারে বাংলার জনজীবন স্তব্ধ।

এই নারকীয় ঘটনাগুলো শুনছি, দেখছি। সবচেয়ে কষ্টদায়ক হল তথাকথিত নেতারা যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে।

উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশের যে বাতাস সে বাতাসের পরিবর্তন হয়েছে বেয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে।

মাঝে মাঝে আমাদের বিতর্ক-সভা বসত বসন্তের বাসায়। কখনও কখনও বসত আমার মেসে। আলোচনা কখনও কখনও তুঙ্গেও উঠত। শ্রুতিরোচক গুজব ভিত্তি করে অনেক সময় আলোচনা বেশ গরম হয়ে উঠত।

আজকাল সত্য সরকার মাঝে মাঝেই আসে। যেদিন সত্য সরকার উপস্থিত থাকে সেদিন আসর জমজমাট হয়। সেদিন সত্য সরকার ঘরে ঢুকতেই বসন্তলাল বলল, যাক্, তোমার কথাই ভাবছিলাম সত্যদা।

কেন ? কেন ? বলতে বলতে সরকার চেয়ার টেনে বসল।

শুনেছ তো আমাদের সুভাষবাবু মনিপুর দখল করেছেন। তোমাদের জওহর পণ্ডিত বলেছেন, সুভাষ যদি আসে আমি তলোয়ার নিয়ে তাকে বাধা দেব।

এমন আক্রমণের জন্য সত্য সরকার প্রস্তুত ছিলনা। আমতা আমতা করে বলল, তোরা এসব খবর শুনিস কোথায় ?

প্রথমটা সোনান রেডিও থেকে আর দ্বিতীয়টা তোমাদের জাতীয়তাবাদী পত্রিকার দয়াতে।

আমি কিন্তু সোনান রেডিওর খবর বিশ্বাস করিনা। আর সুভাষ-বাবুর গলার শব্দ আমি চিনি। এ গলার শব্দ সুভাষবাবুর নয়। জাপানীরা প্রোপাগাণ্ডা করছে ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা পেতে। সুভাষবাবু যে কোথায় তা ভগবান জানেন।

অর্থাৎ ইংরেজের ভাষণ ও ভাষ্য এবং তোমাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় যে সব খবর ছেপে বের হয় তাই তুমি বেশি বিশ্বাস কর।

তাও ঠিক নয়।

যুদ্ধ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, আমরা সেই যুদ্ধের খবর পাচ্ছি লণ্ডন থেকে। যুদ্ধের ঠিক ঠিক অবস্থা আমরা কি করে জানব। ইংরেজের অনুগ্রহে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য চালুনি ছাঁকা যে সংবাদ আমাদের দেওয়া হচ্ছে, সেটুকুই সত্য মনে করছ। আচ্ছা সত্যদা, তোমাদের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো দুর্ভিক্ষের খবরটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল কেন বলতে পার?

সরকার দুর্ভিক্ষের খবর বাইরে প্রকাশ করতে চায়নি।

অথচ সরকার এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। তাদের সহায়ক হল জাতীয়তাবাদী ভারতীয় কালোবাজারী চোরাবাজারীরা। কিন্তু ইংরেজ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের মুখপত্র স্টেট্সম্যান দুর্ভিক্ষের সচিত্র খবর প্রথম প্রকাশ করতে মোটেই ভীত হয়নি। তোমাদের সেই বর্মনষ্ট্রীটের আর বাগবাজারের জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজওলারা এই কাজটি করতে সাহস পায়নি। এই সব জাতীয়তাবাদী পত্রিকাওলারা জওহর পণ্ডিতের হাতে ভাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে সুভাষের পথ রোধ করতে এগিয়ে দিয়েছিল। এরাই কালোবাজার আর চোরাবাজারের ওকালতী করেছে পরোক্ষে। চারটা বছর ধরে যে সব কাণ্ড ঘটেছে তার হিসাব তৈরী করেছ কি?

কেন ইংরেজের অত প্রশংসা করছিস তোরা?

এটা ইংরেজের প্রশংসা নয়। এই সব জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজওলারা ইংরেজের টাকা খেয়ে যে সব অপপ্রচার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে তার চেয়ে নোংরা কাজ ইংরেজের খবরের কাগজগুলো করে না, এইটেই আমি বলতে চাইছি।

সুভাষবাবু যদি জাপানের সঙ্গে হাত মেলায় সেটা কি ভাল কাজ। ইংরেজ যেমন সাম্রাজ্যবাদী জাপানও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী। একজনের খপ্পর থেকে বাঁচতে আরেক জনের খপ্পরে মাথা গলিয়ে দেওয়া কি উচিত?

সত্যদা, তুমি যা বলছ তা কিন্তু রাজনীতির কথা নয়। শুচিবাই-গ্রস্থ বিধবা মহিলার মত তোমার কথা। রাশিয়া যদি ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে জার্মানকে শায়েস্তা করতে, তা হলে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সুভাষবাবুর পক্ষে জাপানের সাহায্য নেওয়া কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয়। রাজনীতিতে সবই সম্ভব।

যদি সুভাষবাবু ভারতবর্ষ দখল করেন তা হলে জাপানের তাঁবেদারী করতে হবে তাঁকে।

সুভাষবাবুকে চিনতে একটু ভুল করেছ সত্যদা। তোমাদের মত কংগ্রেসী তিনি নন। তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যারা জানে তারা তাকে ভয় করে। ভয় করে বলেই অবাঙ্গালীর সঙ্গে চক্রান্ত করে তোমাদের তথাকথিত নেতারা সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে হটিয়েছিল। তোমরা তো গণতন্ত্রের জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। জনির্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে হটিয়ে তোমরা যে গণতন্ত্রের নজীর স্থাপন করেছ, ভবিষ্যতে যদি তোমাদের হাতে ক্ষমতা যায় তা হলে গণতন্ত্রের নামে তোমরা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়বে না।

যুদ্ধের গতি দেখে ভাল লাগছে না রে ননা। ইংরেজই জিতবে মনে হচ্ছে।

তাতে তোমার আমার লাভ কি?

ইংরেজ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে ভাল করে।

না সত্যদা, ইংরেজের পতনপর্ব শুরু হয়েছে। এইবার ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে।

তা হলে 'ভারত ছাড়' অন্দোলনের সময় সবাইকে গ্রেপ্তার করতনা।

এ থেকে কি প্রমাণ হয় ইংরেজ এদেশ ছাড়বে না ?

ইংরেজ মোটেই বোকা নয়। তারা গ্যাঁট হয়ে বসবে।

তোমাদের পথ তো বুঝতে পেরেছি। ইংরেজকে তৈলমর্দন করবে আর কিছু কৃপালাভ করতে। পৃথিবীর ইতিহাস তোমাদের ব্যঙ্গ করবে সত্যদা। তারজন্য প্রস্তুত হও।

তোরা বড়ই কূট তর্ক করিস।

তুমি বিশ্বাস কর ইংরেজ এদেশে থাকবে ? আমরা তা বিশ্বাস করিনা। তুমি বিশ্বাস কর সুভাষবাবু জাপানের তাঁবেদারী করবে, আমরা তা বিশ্বাস করিনা। এগুলো কূটতর্ক হলেও অতি সহজ বিষয়। আচ্ছা সত্যদা, তোমরা তো বিপ্লব করতে চেয়েছিলে। ইংরেজের এই সসেমিরা অবস্থায় তোমাদের বিপ্লবী চেহারা তো দেখতে পেলাম না। দুর্ভিক্ষের দিনে একটা গুদাম লুট করতে তো পারনি। তোমায় পুলিশে ধরবে এই আতঙ্কে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকেছ।

বিপ্লব হবে। ইংরেজ বিপন্ন তাই ওদের আঘাত করতে চাইনি।

তোমরা যে আগষ্ট বিপ্লবের কথা কানে কানে শোনাও সেটা কি ? আমরা জানি এতে তোমাদের ভূমিকা সবচেয়ে লজ্জাজনক। একটা কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। বিপ্লব সাধনায় তোমাদের ভুলত্রুটি অসংখ্য, এমন কি জনগণ-বিপ্লবের সামান্যতম চিন্তাও তোমাদের ছিলনা জানি, তবুও একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে এই বিপ্লব সাধনা। বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ দেশের কথা ভেবেছে। তারা হয়ত সীমিত সংখ্যক ও বিশেষ সম্প্রদায়ের তবুও তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সেজন্য ভবিষ্যৎ বংশধররা সেই বিপ্লবকে শ্রদ্ধা জানাবে। যারা সত্যকার ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের শ্রদ্ধা করবে, বিশ্বাসঘাতকদের নয়। বিপ্লবীর মুখোস পরিধান করে যারা বিপ্লবীদের সর্বনাশ করেছে তাদের ঘৃণা করবে।

সত্য সরকারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, সব দেশেই বিপ্লবীদলে দু'চারজন বিশ্বাসঘাতক থাকে।

যারা ব্যক্তিস্বার্থকে জয় করতে না পেরে বিপ্লবের মুখোস পরিধান করে তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমার একজন পুলিশ বন্ধুর মুখে শুনেছি, ডাকাতির আসামীদের ধরিয়ে দিতে বেশি সাহায্য করে ডাকাতদের দলপতি। যখনই দলপতি তার স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখে তখন স্বার্থহানির আধার যাকে মনে করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারজন্য বেশ মূল্য আদায়ও করে। আমাদের দেশের বিপ্লবীখ্যাত দলের অনেক নেতাই অর্থের লোভে এই কাজ করেছে ও করছে।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে নীতীশ বাগচি উপস্থিত হয়ে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। টেবিলের ওপর জোরে একটা থাবা দিয়ে বলল, ওসব কথা থাক। তোমরা বল, হিটলারের এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত কি না?

সত্যদা বিপন্ন। হিটলারকে সমর্থন না করার অর্থ ইংরেজকে সমর্থন করা। হিটলারকে সমর্থন করার অর্থ কংগ্রেসী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। গায়ে খদ্দরের পান্‌জাবী চাপিয়ে কোন প্রাক্তন কংগ্রেসী এম-এল-এর পক্ষে এর কোনটাই করা সম্ভব নয়।

বসন্ত বলল, আমরা কাউকে সমর্থন করি না।

সত্য সরকার নীচু গলায় বলল, তা হলে তুই যুদ্ধ সম্বন্ধে কি বলতে চাস?

আমি বললাম, এটা স্বাভাবিক পরিণতি।

নীতিশ মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার এটা হেঁয়ালি।

হেঁয়ালি নয় নীতিশ। হিটলারের দ্বিতীয় কোন পথ ছিলনা। ধনতান্ত্রিক দেশে বেকার সমস্যা ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন ঘটলে, দুর্নীতি মাথা চাড়া দিলে তখন দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বজায় রাখতে রাষ্ট্রনেতারা ছকে বাঁধা কতকগুলো কাজ করে। জনমতকে বিপথে চালনা করতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দাঙ্গা বাধায়, ভাষার দাঙ্গা বাধায়, ঘৃণা সৃষ্টি করে। হিটলার ইহুদী ও কৃশ্চানদের মধ্যে বিভেদ

সৃষ্টি করেছিল তার স্বৈরাচারী শাসন বজায় রাখতে ও আত্মরক্ষা করতে। সেটাও যখন সফল হলনা তখন যুদ্ধ বাধিয়েছে। এদেশে ইংরেজ তার গদী কায়েম রাখতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধায়, বাঙ্গালী-বিহারীতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। অবশেষে যুদ্ধে নেমেছে। এটাই হল স্বাভাবিক পরিণতি। তবে এটাই শেষ অস্ত্র। এই অস্ত্রে বিরুদ্ধ ধনবাদী শক্তি যেমন ঘায়েল হয় তেমনি আঘাতকারী ধনবাদী শক্তিও জখম হয়।

নীতিশ বলল, ইংরেজ তো যুদ্ধ চায়নি।

তোমার কথাটা আংশিক সত্য। ইংরেজ তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য উপনিবেশগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। উপনিবেশগুলো যাতে হাত ছাড়া না হয় সেই ভয়ে ইংরেজ যুদ্ধে নামতে চায়নি। যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ যুদ্ধ পরিহার নয়। ইংরেজের দেশেও বহু সমস্যা। সে সব সমস্যা সমাধান করতে না পেরে ইংরেজকে হাতিয়ার হাতে করে ঘুরতে হচ্ছে উপনিবেশ-গুলোতে। দুর্বল পরাধীন জাতিকে দাবীয়ে রেখে ইংরেজের ঘরোয়া সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে। সেজন্য একথা বলা যায় না ইংরেজ যুদ্ধ চায়নি, ইংরেজ যুদ্ধকে বিলম্বিত করতে চেয়েছিল।

তোমরা বলতে চাও হিটলারের পতন হবে।

অবশ্যই হবে। আর এই শুভ কাজের আর বিলম্ব নেই।

ইংরেজ জিতবে?

ইংরেজও জিতবে না, আর হিটলারও জিতবে না।

তোমার মন্তব্য স্ববিরোধী।

না ভাই নীতিশ, মোটেই স্ববিরোধী নয়। হিটলার চরম সাফল্যলাভ করেছিল জার্মান জাতিকে সম্মোহিত করে। জার্মান জাতির যুক্তিবাদী মনকে হত্যা করেছিল হিটলার। কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। কারও প্রতিবাদ করার অধিকার থাকবে না। কাউকে ঘটনার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে দেওয়া হবে না,

—এই হল প্রাথমিক সাফল্য। এই সাফল্যলাভের জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়েছিল হিটলার। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা হিটলারকে দিয়েছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ। অপর দিকে আর্যরক্তের অহমিকা প্রচার করে পুরানো ঐতিহ্যের লেজুড় করে রেখেছে দেশবাসীকে। কথায় কথায় সমাজতন্ত্রের বুলি শুনিয়েছে হিটলার অথচ সে নিজেই সমাজতন্ত্রের অর্থ জানে না। বিপ্লবীরা এবং প্রগতিপন্থীরা যে সব শ্লোগান দিয়ে জনমনে প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেই রকম শ্লোগান দিয়ে হিটলার ফ্যাসীবাদ কায়েম করেছিল। যার ফলে বিশ্বজোড়া অশান্তির আগুন জ্বলেছে।

নীতিশ বলল, তোমার বিশ্বাস হিটলারের পতন ঘটবে।

বললাম, আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

ইংরেজ জিতবে?

না। ইংরেজেরও পতন হবে তবে আকৃতি ও প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজ এখনও বুদ্ধিজীবিদের ওপর সরকারী নীতির প্রভাব প্রসার করতে পারেনি। বুদ্ধিজীবিদের বিভ্রান্ত করে জার্মান সমাজ-জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে সে রকম শূন্যতা এখনও ইংরেজ সৃষ্টি করতে পারেনি। আধ্যাত্মবাদ, পুরানো ঐতিহ্যের দম্ভ, যুক্তিহীনতা, ধাপ্পাবাজী, আত্মকেন্দ্রিকতা, অসত্য ভাষণ, সেকেলে কুসংস্কার, বিকৃত' সাহিত্য ও সংস্কৃতি ও নীতিহীনতা আরও অনেক কিছু মিলিয়ে যখন শোষক তার স্বৈরাচারের রোলার টানে, সমাজে তখন এইসব আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সমাজের প্রতি দায়িত্ব ভুলে যায়, বুদ্ধিজীবিরা হারায় মর্যাদা ও যুক্তি, পশুবল পায় প্রাধান্য তখনই ফ্যাসীবাদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। হিটলার এই কাজগুলো করে সাময়িক যে সাফল্যলাভ করেছিল তার বুনিয়াদ ইতিমধ্যেই ধ্বসে পড়েছে। ইংরেজ কিছুটা র‍্যাশ্যানাল। হিটলারের মত হঠকারী নয় তবুও আর্থিক দেউলিয়াপণা তাদের পতন ঘটাবে, তারাও পরাজিত হবে।

সত্য সরকার ভ্রূ কুঁচকে বলল, তুই যে ভাবে ব্যাখ্যা করছিস নন্দা

তাতে আমার আপত্তি আছে। জাতীয়তাবাদকে অত ছোট করে দেখছিস কেন?

মোটেই ছোট করে দেখছি না। জাতীয়তাবাদকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব, তবে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আমরা সমর্থন করব না। যদি কোন দিন ভারতেও উগ্র জাতীয়তাবাদ শেকড় গেড়ে বসে সেদিন আমাদের অবস্থাও জার্মানদের মত হবে। আমাদের সামনেও তখন যুদ্ধ বিনা দ্বিতীয় পথ থাকবে না। উগ্র জাতীয়তাবাদ তৈরী করবে একটি আত্মকেন্দ্রিক দুর্নীতিপরায়ন শ্রেণী যারা নিজের ঘরের মানুষকে শোষণ করবে, বিরোধীকে হত্যা করবে। মমত্বহীন এই সব মানুষ মানবতাবোধকে হত্যা করে শেষ পর্যায়ে নিজেদের অপঘাত মৃত্যু ডেকে আনবে, জার্মান জাতির মত আমাদের জনসমাজ দুঃখ দুর্দশায় চরম গতি লাভ করবে।

সত্য সরকার বিরক্তির সঙ্গে বলল, থাম্। বিশ মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। ইংরেজ যাবে না, ফ্যাসীবাদও আসবে না।

নাচবে সত্যদা, নাচবে। অচিরেই দেখতে পাবে। তেল পোড়াতে অনেক মিঞাকে দেশের আনাচে কানাচে পাবে। তোমাদের গান্ধীজি আগাখাঁর প্রাসাদে আছেন রামেশ্বর বিড়লার প্রসাদ ছেড়ে। দেশ স্বাধীন হলে রামেশ্বর বিড়লার গোষ্ঠী কি দেশের রস শুষতে দেরী করবে। তোমরা গান্ধীজির শিষ্য বলে জাহির কর বলেই আমাদের ভয়। এরপর যেদিন ইংরেজ বিদায় নেবে সেদিন স্বদেশী পুঁজিবাদীদের মুখোস খুলে পড়বে। তারা যে দুহাতে কংগ্রেসকে সাহায্য করছে তা সুদে আসলে আদায় করবে।

তুই আজকাল মাত্রা হারিয়ে কথা বলিস ননা।

বসন্ত বাধা দিয়ে বলল, এতেই তুমি উত্তেজিত হচ্ছ সত্যদা। ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে ক্ষমতা গেলে দেশের মানুষের যে কি অবস্থা হবে তা আন্দাজ করতে পারছি। তোমার মত লোকেরাই তো শাসন ক্ষমতায় যাবে, তখন তোমরা বিরোধীদের গলা কাটতে

কসুর করবে না। যে দেশের পঞ্চাশলক্ষ লোক অনাহারে মরল ক'বছর আগে, সেদেশের জনপ্রতিনিধি সেজে তোমরা যা করেছ তা আমরা ভুলতে পারব না। তোমরা না করবে আত্মসমালোচনা, না পারবে অপরের সমালোচনা সহ্য করতে। তোমরাও একদিন হিটলারের মত বিরুদ্ধপক্ষের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে, হয়ত নেবেও। তোমরাও বুদ্ধিজীবিকে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করবে। এই দেউলিয়াপণা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে সেটাই দেখছি।

সত্য সরকারকে বেশ চিন্তিত মনে হল। আমাদের কথার প্রতিবাদ জানাতে সে কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই বললাম,—সত্যদা, বুকে হাত দিয়ে বলতো ব্যক্তিগত জীবনে তুমি তোমার নামের মর্যাদা কতটা রক্ষা করে থাক। শোন সত্যদা, জাতীয় আন্দোলন বল আর বিজাতীয় আন্দোলনই বল তাকে সার্থক করতে হলে আন্দোলনের উপযুক্ত চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তা নাহলে, লোক ঠকিয়ে বেশি দিন নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা যায় না। রাজনীতি এমন একটি ধর্ম যার কৃপায় গলায় যেমন ফুলের মালা জোটে তেমনি জুতোর মালাও জোটে। নেভিল চেম্বারলিনের মত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও শেষ পর্যন্ত ডাস্টবিনে স্থান পেয়েছে সেটা তো তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

সত্য সরকার উত্তেজিতভাবে বলল, আমরা যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সামীল হয়েছি তাদের কোন চরিত্র নেই বলতে চাও? এ তোমার ভুল ধারণা।

এই ভুলকে আমি সম্মান করি। ভারতের পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, খানসাহেব, খানবাহাদুর, ইত্যাদি খেতাব নিয়ে ইংরেজের সেবা করছে; সে কথা ভুলে যেওনা। তোমাদের আদর্শ হল স্বাধীনতা লাভ। পথ নির্দেশ কে দেয়? যারা

নির্দেশ দেয় তারা দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে রাজনীতির মেরুদণ্ডকে অপোক্ত করে তোলে। কারণ, তারা জানে স্বাধীনতার জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করছে, তারা শোষণকে ভবিষ্যতে বরদাস্ত করবে না। অথচ তোমাদের পথ নির্দেশকরা শোষকদের অর্থেই বলীয়ান। সেজন্য আদর্শ তোমাদের যা হোক, পথ তোমাদের কলঙ্কিত।

তুই কাম-নষ্ট পার্টির মত কথা বলছিস।

তা বলবনা সত্যদা। আমরা বলব তোমরা আদর্শবান হও, দশ জনের একজন হও। শ্রেণী-বিন্যাসকে ঘৃণা করতে শেখো। মুখে লম্বা-চওড়া অনেক কথা বলা যায় কাজের বেলায় কিছুই করা যায় না।

আমার মন্তব্য শুনে সত্য সরকার গম্ভীর হয়ে গেল।

নীতিশ বাগচি বলল, কি ভাবছ সত্যদা?

ভাবছি, এদের মানসিক অধঃপতন ঘটেছে। এক সময় এরাই ছিল স্বাধীনতা-যুদ্ধের মশালবাহক।

হেসে বললাম, কথাটা ঠিক হলনা সত্যদা। আমরা ছিলাম নেতাদের গামছা-ছাতা বহন করার কুলী। যেদিন চোখ ফুটল, সেদিন নেতাদের চেহারাটাও দেখতে পেলাম, আমাদের কাঁধে ছাতা-গামছা রেখে যে ব্যবসাটা চলছিল সেটা বন্ধ করতে নামতে হল। একটা কথার জবাব সেদিন তুমি দিতে পারনি সত্যদা; আজও সেই প্রশ্ন করছি। জবাবটা যদি দিতে পার তাহলে বুঝব তোমাদের আদর্শ কতটা বাস্তবপন্থী।

সত্য সরকার বলল, তুই তো অনেক প্রশ্ন অনেক দিন করেছিস, কোনটার উত্তর পাসনি তাতো জানি না।

বিপ্লব বললে তুমি কি বোঝ? বিপ্লব আর বিদ্রোহের কোন পার্থক্য আছে কিনা?

সত্য সরকার বলল, অল্প কথায় তো এসবের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

আচ্ছা বেশ, মনে কর তুমি লণ্ডনে গেছ। সেখানে সাহেব মেথর-মুর্দফরাস তোমার বাড়ির পায়খানা পরিস্কার করছে। এই দৃশ্য

তোমাকে নিশ্চয় আনন্দ দান করবে। এই আনন্দের ব্যাখ্যা করতে পার কি?

আমার কথা শেষ হতেই রসন্তলাল বলল, শোন সত্যদা, একজন দার্শনিক, অথবা একজন সাহিত্যিক অথবা একজন কবি অথবা একজন শিল্পীকে আমরা বিচার করি তাদের অবদানকে সামনে রেখে। তাদের সৃষ্টির সার্থকতা বিচার করে। তাদের ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। হয়ত তারা মদ্যপ-লম্পট কিন্তু আমরা বিচার করি সমাজকে তারা কতটা দান করেছে তাদের সৃজনীশক্তি দিয়ে। এরা প্রায়শই থাকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাদের নিজস্ব চিন্তারাজ্যে কিন্তু যাদের কাজ হল জন-সমাজকে নিয়ে, সকাল-সন্ধ্যায় যাদের জনতার সংস্পর্শে আসতে হয় তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তাই তো বিচার্য। তোমাদের মত যারা কংগ্রেসসেবী তাদের শতকরা কতজন মদ্যপ ও লম্পট তা তোমার অজানা নেই। তারা যখন জন-সমাজে হাজির হয় তখন তারা কতটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে তা ভেবেছ কি? তোমরা যখন বিপ্লবের কথা বল, স্বাধীনতার কথা বল তখন শুনতে খুবই ভাল লাগে; কিন্তু তোমাদের ওপর অনুগামীদের আস্থা নিশ্চয়ই থাকতে পারে না যদি ব্যক্তিচরিত্র কলুষিত হয়। ব্যক্তিচরিত্র বিকাশলাভ করে শ্রেণী-চরিত্রের ছায়াতে। তুমি যে শ্রেণীর সেই চরিত্র তোমার গায়ের গেঞ্জি নয়, ময়লা গেঞ্জি বদলানো সহজ, তৈরী মন বদলানো সহজ নয়; সেটা ভুলে যাও কেন।

নীতিশ বাগচি বলল, তোমরা যেন সত্যদাকে পেয়ে বসেছ। আঘাতের পর আঘাত করছ।

বললাম, তা হলে এখানেই ইতি। তবে বিপ্লবের ব্যাখ্যাটা সত্যদার কাছে শুনতে চাই।

নীতিশ বলল, তোমরা তো নিজেরাই তার ব্যাখ্যা করতে পার। সত্যদাকে আক্রমণ করছ কেন?

কারণ সত্যদা এমন একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি যাদের কাজ ছিল

জওয়ান বুদ্ধিজীবি তরুণদের বিপ্লবের কাল্পনিক মহত্ব শুনিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া, তরুণদের ইমোশ্যনকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা মহত্বের গদীতে বসে পকেট গরম করা :- এর প্রতিবাদ জানাতে চাই।

বসন্তলাল বলল, যারা বিপ্লব ঘটায় সত্যদার মত বিপ্লবীরা তাদের অতি যত্নে পরিহার করে এসেছে। যাদের রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে কায়েমী স্বার্থ তাদের বলেছ বিপ্লব করতে। যারা বিপ্লব ঘটায় সেই মেহনতী মানুষদের না পেরেছ রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে; না পেরেছ পথের সন্ধান দিতে। যারা যৌবনের নেশায় বুকের রক্ত দিয়েছে তাদেরও শ্রদ্ধা জানাতে শেখনি তোমরা। অথচ তোমরা চাও বিপ্লব ঘটাতে। ইতিহাসের চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নতুন প্রহসনের সৃষ্টি করতে চেয়েছ।

নীতিশ বলল, আমার আলোচ্য বিষয় ছিল ইংরেজ আর জার্মান। তোমরা মূল বক্তব্য এড়িয়ে সত্যদাকে আক্রমণ করছ। এটা কি উচিত।

বসন্তলাল বলল, ক্ষমা কর নীতিশ। মুখোসধারীদের কেন বা সহ্য করতে পারিনা। তিন-চার বছর জেলখানায় বাস করে এদের যে চেহারা দেখেছি সাধারণ কয়েদীদের চেহারা তার চেয়ে খুব নোংরা মনে হয়নি কোন সময়ই। জেলখানায় এরা দল করেছে, কুকার্য করেছে, নেশাভাঙ করেছে, গুপ্তচরের কাজ করেছে। যারা সত্যকার দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে তাদের বিপথে পরিচালনাও করেছে; আবার বাইরে এসেই ওরাই নেতা সেজে বসেছে।

সত্য সরকার কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল।

আমি উঠতেই বসন্তলাল জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললি ননা?

কালও ছুটি আছে। আমার একজন সহকর্মীর বাড়ি যশোরে।

খুব দূরে নয়, বনগাঁ থেকে কয়েক মাইল পথ যেতে হয়। তার সঙ্গে আজ বিকেলে যাব, আবার কালই ফিরে আসব।

সত্য সরকারের কথা শুনে কিছু বুঝলি?

বুঝলাম দুর্ভাগ্য নিকটবর্তী। দুর্ভাগ্যের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। ভারতের কপালে কত যে দুর্ভাগ্য জমা রয়েছে তা জানিনা কিন্তু তার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে বিপ্লবের কথা যারা বলে তাদের উদ্দেশ্য কতটা মহৎ তা তো জানই।

জানি মানে ভাল করে জানি। ভারতীয় বিপ্লব-চিন্তার অন্যতম পুরোধা মদনলাল ধিংড়া সম্বন্ধে তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন destestable crime। অথচ মদনলাল ধিংড়া তার বিবৃতিতে বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি পরাধীন জাতি সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই করছে। অস্ত্রহীন সেই পরাধীন জাতির পক্ষে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার সুযোগ থাকে না। আমি দেশমাতৃকার সামান্য সেবা করছি আমার রক্ত দিয়ে।" যাদের বিপ্লব সম্বন্ধে এই হল মতবাদ তারা বিপ্লবী চিন্তাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তাতো বুঝতেই পারছ।

বললাম, তাইতো বলছি অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

পানুদিদি জিজ্ঞেস করেছিল, চাকরি কেমন চলছে?

বললাম, চলছে। টাকার বাজার ফেঁপে উঠেছে; যাকে inflation বলে তাই হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে বে-হিসাবী টাকা ছেড়েছে ইংরেজ। সেগুলো জমা হয়েছে কালোবাজারীদের হাতে। তারা টাকা সামলাতে পারছে না। তাই নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে আর ফেঁপে ফুলে উঠছে। এও তো ব্যাং-এর ছাতা। আয়ু খুব বেশি দিন নয়। অন্যত্র কাজ খুঁজছি।

ব্যাঙ্কগুলো উঠে যাবে মনে করছিস?

মনে করার কিছু নেই। যুদ্ধ তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যুদ্ধ থামলেই দেখবে এইসব মাটিতে ব্যাঙ্ক গড়িয়ে পড়েছে। এর জন্য দুঃখ নেই পানুদি কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলো সবই বাঙ্গালীর টাকায় চলছে। এদের কোন capital money নেই। deposit-এর ওপর ভরসা। বাজারের বেশির ভাগ ওঁছা চোর জোচ্চোর এগুলোর মাথায় বসে deposit-এর টাকায় বড়লোকী করছে। যেদিন depositer দল বেঁধে আসবে সেদিন সব কুপোকাৎ হবে। বাঙ্গালী ছেলেরা বেকার হবে, কোন কোন গরীব বাঙ্গালীর সামান্য সঞ্চয় লোপাট হবে আর যারা এইগুলোর পরিচালক তারা বহাল তবিয়তে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আরও দুঃখের কথা হল, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীদের একটা অংশ এই চোরাই ব্যবসায়ে নেমেছে। এরা দেশের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

পানুদিদি বলল, প্রাক্তন রাজবন্দীদের কিছুটা গ্ল্যামার আছে, সেটাই তো ওদের capital। দেশের লোক না খেয়ে মরলেই বা কি, দেশে বেকার বৃদ্ধি পেলেই বা কি। আর পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মেরে যে কালো টাকা তারও সদ্‌গতি এই কালো পথেই হবে। ওসব শুনতে চাই না। তুই কাজকর্ম অন্যত্র দেখে নে, নইলে কালো কোট কিনে আদালতে হাজিরা দে।

তাও ভেবেছি পানুদি কিন্তু বর্তমান আবহাওয়া মোটেই ভাল লাগছে না। কেমন যেন চাপা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। হিন্দু পুঁজিপতি আর মুসলমাম পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতায় এগোতে পারছে না, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে অন্যভাবে, এটাই মনে হচ্ছে।

এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যুদ্ধের বাজারে যে হাহাকার দেখা দিয়েছে যুদ্ধ থামলে তার চেয়েও বেশি হাহাকার দেখা দেবে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হবে, লক্ষ লক্ষ টাকার নষ্ট সম্পদ আর উদ্ধার হবে না। দুর্ভিক্ষের জের চলছে, মহামারী ওঁত পেতে বসে আছে।

এসব চিন্তা করতে হবে। তাই বলছিলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এমন একটা profession খুঁজে নে যা সততাধর্মী হয় এবং সম্মানীয় হয়।

আমিও সেই চিন্তা করছি। অশুভ পদধ্বনি যা শুনছি তার জন্যই বেশি শঙ্কিত হচ্ছি।

পানুদিদির সঙ্গে সেদিন আর এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। বনগাঁর কাছে চাঁদপাড়ায় গিয়েছিলাম সহকর্মী নিত্যলালের বাড়িতে। তার বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছিলাম।

স্টেশন থেকে হেঁটে সামান্য পথ। সামান্য কয়েক ঘর বাসিন্দা। অবস্থা কারও তেমন ভাল নয়। সবাই কলিকাতামুখী। সকাল বেলায় কেউ আনাজ-তরকারী নিয়ে কলকাতায় যায়। কেউ যায় চাকরি করতে। নিত্যলালের ছোট্ট পরিবার। তিন ভাই কলকাতায় কাজ করে। বুড়ো বাবা সামান্য জমিজমা দেখে। দুটো বোন। সামান্য লেখাপড়া শিখেছে।

বড়টির বিয়ে প্রায় ঠিক। হয়ত আর দু এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হবে। পাত্রের যোগ্যতা গোবরডাঙ্গায় কিছু জমিজমা আছে। জমিদার বাড়ির মোহরার।

বৃদ্ধ পিতার মতে উত্তম পাত্র।

নিত্যলালের মত নয়। নিত্যলালের ভাইদেরও একই মত। ওরা কলকাতায় যাতায়াত করে। কলকাতার জীবনের সঙ্গে নিজেদের দৈন্যকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে। কলকাতার মেয়েদের চলাচল দেখতে অভ্যস্ত। সেখানে যে জৌলুষ আছে সেটা তারা অনুভব করে। জমিদারের মোহরারের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবার পক্ষপাতী ওরা নয়।

একটা বিরাট 'কিন্তু'র অনুচ্ছেদ আছে।

নামে লাবণ্য হলেও লাবণ্যের অভাব ছিল নিত্যলালের বোনের। উপরন্তু টাকা দিয়ে গছিয়ে দেবার সামর্থ্যও ছিল না। নিত্যলাল ম্যাট্রিক পাশ করে আশীটাকা বেতনে কাজ করে। ভাইয়েরা সামান্য

উপার্জন করে। এদিয়ে কালোবাজার আর দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করে তারা যে বেঁচে আছে এটাই যথেষ্ট। এরপর বিয়ের খরচ টানা সম্ভব নয়। বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধ পিতা সেজন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী পাত্র খুঁজছেন।

এসব ঘটনা আগেই শুনেছিলাম। নিত্যলালের বাড়ি যাওয়াটা এসব জানতে নয়। অনেকদিন গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে ছেদ পড়েছে। সেই ছেদ কাটাতেই নির্জন পল্লীতে একটা দিন কাটিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সেই কথাই বলেছিলাম পানুদিদিকে।

পানুদিদি বলল, বাঙ্গালী বর্ণ হিন্দু ঘরের মেয়েদের বিয়ের সমস্যা ক্রমেই জটিল হবে। তবে এই জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গন দেখা দেবে। ক্লেদাক্ত সমাজ-জীবনে নতুন জীবনের স্পন্দন দেখা দেবে।

সেতো অনেক দূরের কথা। লাখে একটা ঘটনা দিয়ে তো ভাঙ্গনকে মেনে নেওয়া যাবেনা। সেটা হবে ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমকে রক্ষণশীল সমাজ সহজে স্বীকার করবে না। যারা ব্যতিক্রম তারা অপাংক্তেয় হবে।

নারে না। আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ ক্রমেই শহরমুখী হবে। শহর হল বহুর সমাবেশ, বিচিত্র তার সমাহার, শহরের ছায়াপাত হবে গ্রামে, গ্রামগুলোও ব্যতিক্রমকে মানতে আরম্ভ করবে। সমাজের গণ্ডী যত ছোট তত বেশি রক্ষণশীলতা। শহরে সে উপায়টি থাকবে না। সেখানে বিরাট পরিসরে ব্যতিক্রমকে কেউ না কেউ মেনে নেবেই। এই কারণেই ভাঙ্গন থেকেই জন্ম নেবে নতুন সমাজ। তোরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিস, সেও তো ভাঙ্গনের মাঝ দিয়ে নতুন সমাজ পত্তনের পরিকল্পনা।

বললাম, অতশত জানিনা। লাবণ্য যদিও লাবণ্যহীন তবুও তো একটা নারী। মানুষ সমাজে পুরুষের সঙ্গী চাই একটি নারী ; আবার নারীরও সঙ্গী চাই একটি পুরুষ। অথচ সর্বত্র কেমন একটা বেচা-কেনার পরিবেশ। লাবণ্য বয়স্কা; সব বিষয়েই তার ইন্দ্রিয়গুলো

সজাগ। নিত্যলালের সামনেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার বিয়ে যদি দেরিতে হয় তা হলে কিছু অসুবিধা আছে কি? আমার প্রশ্ন অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক। লাবণ্য কোন উত্তর দিতে পারেনি, মুখ লাল করে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন চয়েস নেই। আমরা নারীত্বের এবং মাতৃত্বের মহিমা প্রচার করতে দিস্তা দিস্তা কাগজে প্রশস্তি লিখি। ছাপা কাগজে তা বের হয়। আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দি অথচ নারীর ব্যথা-বেদনা নিরসনের জন্য সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করিনা।

পানুদিদি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কোন জবাব দেয়নি।

এরপর পানুদিদির কাছে যেদিন গেলাম সেদিন ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদীরা বিজয় উৎসব করছে। জার্মানীর পতন হয়েছে, ইটালী তো আগেই আত্মসমর্পণ করেছে, শেষ বেলায় জাপান আত্মসমর্পণ করেছে বিনা সর্তে। ইংরেজ বিজয় উৎসব করছে। ফোর্ট উইলিয়মে বাজি পোড়ান হচ্ছে। দেশের মানুষও পিছিয়ে নেই, তারাও বিজয় উৎসবে মোটামুটি অংশ গ্রহণ করেছে।

পানুদিদির কাছে যেতেই পানুদিদি বলল, যাক্ এবার নতুন লড়াইয়ের পত্তন হবে।

হেসে বললাম, কারা লড়াই করবে?

ঘরে ঘরে। সুভাষবাবু একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করতে আরেকটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকেই সমর্থন করেনি, বিশেষ করে কংগ্রেসীরা ইংরেজ প্রেমে এতই গদগদ যে সুভাষবাবুকে 'নিকাল দাও' ধ্বনিও দিয়েছে। সুভাষবাবু সবই করতে পারতেন যদি দেশের অভ্যন্তরে সংগঠনকে জোরদার করতেন।

এটা আমিও ভেবেছি। যখন সুভাষবাবুর আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা পৌঁছেছিল তখন অন্তত পূর্ব ভারতের মানুষ অনেক কিছু করতে পারত। তা আর হলনা শুধুমাত্র সংগঠনের অভাবে। তার বিপক্ষে ছিল কম্যুনিস্টরা ও কংগ্রেসীরা। এরাই পারত দেশে বিপ্লব

ঘটাতে। সুযোগও ছিল। সে সুযোগ হারিয়েছে দেশের লোক তথাকথিত নেতাদের নেতিবাচক মনোভাবে।

ঠিক নেতিবাচক নয়। কংগ্রেস বিপ্লবকে ভয় করে। তারা যে ভাবে পুঁজিপতিদের ওপর নির্ভরশীল তাতে তাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটলে পুঁজিপতিদের সুরম্য সৌধ ভেঙে পড়বে, কংগ্রেস দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার আর সুযোগ পাবে না। অপর পক্ষে সোবিয়েতের সঙ্গে ইংরেজ গাঁটছড়া বেঁধেছে, সোভিয়েতকে সমর্থন করা কম্যুনিষ্টদের ধর্ম, সেজন্য ইংরেজের এই লড়াই হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই। এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলতে ওরা মোটেই দ্বিধা করেনি। অবশ্য আশা করছে, এর পুরস্কার ইংরেজ ওদের দেবে। নৈরাশ্য ওদের প্রাপ্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সোবিয়েত-ইংরেজ গাঁটছড়া আত্মরক্ষার তাগিদে। তার বদলে ভারতে কম্যুনিষ্টদের শেকড় গাড়তে দেবে এটা যদি ওরা মনে করে থাকে তা হলে বলা যায় ওদের বুর্জোয়া রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মোটেই পরিচয় নেই। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি। সেই অবস্থা হবে ওদের। ওসব থাক, সামনে লড়াই; সেটাই চিন্তার কথা।

বললাম, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই হল রাজনীতি। ইংরেজ চেয়েছে এদেশের কিছু লোককে হাতে রেখে কার্যসিদ্ধ করা, সেটা হয়ে গেছে। সুভাষবাবুও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি তা পারেননি। হয়ত পুঁজি প্রতিযোগিতা নিয়ে সমস্যা জটিল হত না যদি সুভাষবাবু সাফল্যলাভ করতেন। এখন যে সমস্যা দেখা দেবে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে পুঁজির প্রতিযোগিতা ও কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

পানুদিদি হেসে বলল, তাইতো বলছি, লড়াই সামনে। হিন্দু পুঁজিপতিদের সঙ্গে মুসলমান পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। ভারসাম্য রক্ষা করছে ইংরেজ পুঁজিপতিরা।

যেদিন ইংরেজ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করবে সেদিন এদের সংঘাতে ভারতীয় জনজীবন বিপর্যস্ত হবেই। অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েও যায় তা হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতকে দাসত্ব করতে হবে আরও বহু বিদেশী পুঁজিপতিদের।

বললাম, ইংরেজের ভূমিকা কি হবে?

ইংরেজ কোটি কোটি টাকা লগ্নী করেছে এদেশে। বেনিয়ার জাত, তার লগ্নী টাকার নিরাপত্তা চাইবে সবার আগে। চেষ্টা করবে বেচাকেনা করে নিরাপত্তা বিধান করতে। যতদিন সে পুঁজি গোটাতে না পারবে ততদিন ভারতীয় পুঁজিপতিদের লড়াইতে ইন্ধন জোগাবে তারপর একদিন সে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলবে। আজ বিজয় উৎসব তাতো জানিস।

জানি। জানি বলেই তো এলাম।

আমাদের উৎসব নয়। আমাদের আতঙ্কের দিন। আজ হাসপাতালে যা নমুনা দেখে এসেছি তাতে মনে হচ্ছে কোন দিন সত্যিই যদি প্রশাসন ক্ষমতা ভারতীদের হাতে যায় তা হলে আমাদের কি দুর্দশা ঘটতে পারে

এমন কি ঘটনা ঘটল?

হেয়ার ষ্ট্রীট থানার দারোগা দেলওয়ার হোসেন একজন ইহুদী যুবতীকে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে, সঙ্গে ছিল মেয়েটির বাবা। অভিযোগ গুরুতর। মেয়েটি কলকাতার কোন খ্যাতনামা হোটেলের রিসিপসনিষ্ট। হোটেলের বেশির ভাগ স্যুট মিলিটারী অফিসারদের অধিকারে। রাত নটায় ক্যাপটেন মালহোত্রা ফোনে ডাকল মেয়েটিকে তার স্যুটে। পরবর্তী ঘটনা অতি ভয়ঙ্কর। সেসব না-ই বা শুনলি। দারোগা ভদ্রলোক মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। আমাকে য়্যাটেণ্ড করতে হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম সব ঘটনা।

মেয়েটি তার নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়ে অঝোরে কাঁদতে

থাকে। আমি ভাবছিলাম, কোন দিন ভারত স্বাধীন হলে এইসব মিলিটারী অফিসারদের হাতে আমাদের দেশের মেয়েরা কিভাবে লাঞ্ছিত হবে। কোন ইংরেজ যদি এই ঘটনা ঘটাত আর তা প্রকাশ পেত তা হলে আমাদের কাগজওলারা তুলকালাম না করে ছাড়ত না। এই ঘটনা বোধহয় ধামা চাপা পড়বে। কেউ একবারও আহা-উঁহু করবে না।

জিজ্ঞেস করলাম দেলওয়ার হোসেনকে, আপনাদের কিছু করণীয় আছে কি?

দেলওয়ার হোসেন বলল, আইনে অনেক কিছু করার আছে কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে আমাদের সাধ্য নেই কোন মিলিটারী অফিসারের গায়ে হাত দেই। আমাদের জানাতে হবে এরিয়া কম্যাণ্ডারকে। তার অনুমতি পেলে তবেই আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারব। যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে জেনেছি এরা সব যাচ্ছে ইন্দোচীনে দখলকার বাহিনীর সঙ্গে। যখন এরিয়া কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে অনুমতি আসবে, অবশ্য যদি তা আসে তখন এই আসামী আর ভারতের মাটিতে থাকবে না দিদি।

তাহলে বিচার হবে না?

দেলওয়ার হেসে বলল, অপরাধীর বিচার শতকরা এক ভাগও হয়না।

ঘটনাটা বলেই পানুদিদি মন্তব্য করল, বিজয় উৎসবের প্রথম বলী।

আমি স্তম্ভিতভাবে শুনছিলাম।

পানুদিদি বলল, আমরা মেয়েদের সম্বন্ধে কত না বড় বড় নীতি-বাক্য বলে থাকি। ভারতীয় ঐতিহ্য হল মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আমরা কতটা অধঃপতিত তা বুঝতে পারছিস তো। এই পশুদের হাতে যেদিন আমাদের পড়তে হবে সেদিনের চিন্তা করলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ইহুদী যুবতীটি অবশ্যই জার্মান নয়, খাস ইংরেজের দেশের মেয়ে।

যুদ্ধ মিটে গেছে কিন্তু তার জের চলছে তখনও।

সংবাদপত্রের পাতা উল্টাতেই দেখি ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহ করেছে।

জলের হাঙ্গামা স্থলেও দেখা দিয়েছে।

কংগ্রেস নেতারা ছাড়া পেয়েছে বন্দীশালা থেকে।

শোনা যাচ্ছে আবার নির্বাচন হবে।

ওদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিদের বিচার হবে।

গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ধৃত ব্যক্তিদের বিচার হবে, কারও কারও মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

রাজনৈতিক গগন বড়ই উত্তপ্ত।

রতনলাল আজকাল কংগ্রেসের বড় সেবক। এতকাল সে ছিল পুলিশের সোর্স। চোর-গুণ্ডা-বদমায়েস তার এক্তিয়ারে বাস করে। প্রয়োজন মত তাদের ব্যবহার করে। রতনলাল নিজে কোন সমাজ-বিরোধী কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও যারা জুয়ার আড্ডা বসায় তাদের সঙ্গে তার শেয়ার আছে, যারা ছিনতাই করে তাদের লভ্যাংশের শরীক, পুলিশের সঙ্গে লেনদেন ও যোগসূত্র রক্ষা করা তার কাজ। থানার অফিসার-ইন্-চার্জ নতুন এলেই রতনলাল ভেট নিয়ে সেলাম করে বড়বাবুকে। সে যে বিশেষ অনুগৃহীতজন এবং পূর্বতন বড়বাবু যে তাকে বিশেষ সমাদর করত তাও জানিয়ে দিতে কসুর করত না। থানার সেপাই থেকে বড়বাবুরা তাকে খাতির করে। দুপয়সা আমদানীই তার মারফৎ হয় না, আরও কিছু কিছু কাজ হাসিল করতে রতনলালের সাহায্য দরকার হয়। বিশেষ করে গুরুতর খুন-খারাবী রাহাজানি ডাকাতি ইত্যাদি ঘটলে আসামীর হদিস করতে রতনলাল অদ্বিতীয়। অন্ধকার জগতে পুলিশের কম্পাস রতনলাল। অকারণে সে কংগ্রেসের ছত্রছায়ে ঘাঁটি করেছে এটা বলা ভুল।

হঠাৎ রাস্তার আলোগুলো ঘোমটা খুলে ফেলাতে অন্ধকার জগতে

কিছুটা বিভ্রাট দেখা দিল। অবশ্য কলকাতার জনসংখ্যা হঠাৎ স্ফীত হতে থাকে। যারা পালিয়েছিল বোমার ভয়ে তারা আবার ফিরতে শুরু করেছে, যারা অপেক্ষা করছিল সুদিনের তারাও ফিরতে শুরু করেছে। যুদ্ধের হিড়িকে যারা কর্মসংস্থান করেছিল তাদের অনেককেই কর্মচ্যুত হতে হয়েছে, তারাও ভীড় করছে। কলকাতা শহর মানুষকে খেতে দেয়, এই প্রবাদ যে সত্য তার প্রমাণ মিলছে। বাংলা ও বাংলার বাইরের পল্লী অঞ্চলে খাদ্যের অভাব থাকলেও কলকাতার রেশনিং থেকে নিয়মিত চাল-গম পাওয়া যায়, জীবিকা অর্জনের সুযোগ কিছু কিছু থাকেই। সেজন্য জনতার স্রোত কলকাতা অভিমুখী। রতনলাল এই অবস্থাকে ভালভাবে অনুধাবন করছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে তৈরী করে নিতেও সে জানে।

রতনলাল শিকারের খোঁজে গিয়েছিল ধর্মতলায়। বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। ছাত্রদের বিরাট মিছিল এগিয়ে চলেছে ময়দানের দিকে।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিদের বিচার করা চলবে না। এই শ্লোগান নিয়ে চলেছে ছাত্ররা।

একজন মিঞাসাহেব জিজ্ঞেস করল, কিসের জলুষ ভাইয়া?

উত্তর দিল একজন ছাত্র, রসিদ আলি ডে।

রসিদ আলি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতি। তাঁর বিচার হবে দিল্লীর লালকেল্লাতে। শুধু রসিদ আলি নয়, আরও অনেকের বিচার হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে মিছিল বেরিয়েছে।

রতনলাল এগিয়ে চলেছে ভীড় ঠেলে ঠেলে।

হঠাৎ চিৎকার, গুলির শব্দ, হৈ-হৈ ব্যাপার। হুড়মুড় করে জনতা পেছনের দিকে ছুটছে। জনতা ছোট ছোট গলির মধ্যে আত্মগোপন করছে। সবাইয়ের চোখে মুখে আতঙ্ক।

রতনলাল গলির মধ্যে আত্মগোপন করল।

আরে টুকু মিঞা, কি ব্যাপার বলত?

আর কহিও না দোস্ত, দো-তিন মর গিয়া হোগা। পুলিশ গুলি মারিস্। বদমাস খতম হো গেইলো।

রতনলাল চমকে উঠল।

কাহে, কাহে ?

উসব নেহি জানে। হিন্দুভদ্দরলোককা কাম। হামার বড়াবাবু খোন্দকার সাব হ্যায়, আউর সাহেবলোক হ্যায়। গোলমাল কুছ জরুর হুয়া। ছোড় ইয়ার ওসব বাত। শালা লোগ মরা তো হামার তুমার কিয়া হ্যায়। মোচিপাড়াকা সিরাজুল সাব কাল বোলায়াথা। ধান্দাকা বাত বোলা।

ইলিক্শ্যন্ আতা হ্যায়। কাম করনে হোগা। মুসলীম কৌমকে লিয়ে হামারা কাম করনা ইনসাফ হ্যায়, ফরজ হ্যায়।

রতনলাল গম্ভীরভাবে বলল, এহি বাত্।

টুকু মিঞা পকেট থেকে বিড়ি বের করে রতনলালের হাতে দিয়ে বলল, বাজার বহুৎ মন্দা ওস্তাদ। আবি কোই কুছ কাম তো করনা। বাবুলোগকো পাকিট তো খালি, হামলোগ তো ভুক্সে মরেগা।

ঠিক বলেছ টুকু মিঞা। আমাদের ধান্দা হল পয়সা কামাই করা। আমার ওখানে পঞ্চুবাবু এসেছে। বড়ই বে-আদব লোক। কামকাজ যারা করে তাদের বড়ই কষ্ট। আরে রেলের মাল না পাচার করলে দল রাখা দায়। বড়বাবুকে বললাম, বলল এসব আমার এলাকায় হবে না।

টুকু মিঞা বলল, হামারা শিয়ালদহমে সিরাজসাব লাইসিন দিয়া। কাম হোগা। লেকিন থোরা ঢিলা। তুম ওস্তাদ হামার এলাকায় আ যাও।

তা হয় না টুকু মিঞা। নিজের এলাকা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। আমার এলাকায় আমার তো কোন কাজ করতে হয় না, কমিশনটা রেগুলার মেলে। সেটা তো তোমার এলাকায় হবে না দোস্ত।

টুকু মিঞাকে এড়িয়ে রতনলাল ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট ধরে চলছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। রাস্তার আলো ধীরে ধীরে জ্বলছে। এগোতে এগোতে পার্ক ষ্ট্রীটে এসে থেমে দাঁড়াল। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। কয়েকজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জোয়ান ছেলেমেয়েকে হাত ধরাধরি করে যেতে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাদের চলাফেরায় বেশ শঙ্কার চিহ্ন। বিকেলের ঘটনা সারা শহরে বেশ একটা ভীতি সঞ্চার করেছে।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে একটা মিঠে পান কিনে মুখে দিয়েছে এমন সময় কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, অনেক রকম জমা আছে বাবু।

ইঙ্গিতটা রতনলাল বোঝে।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই হেসে ফেলল।

বক্তাও হেসে উঠল।

রোশন মিঞা যে। খদ্দের ভুল হওয়া তো তোমার উচিত নয়। অনেক দিনের কারবারী তুমি।

আমি ভাবতেই পারি নি ওস্তাদ তুমি এখানে আসবে। আজ বাজারে খদ্দের নেই। গুলিগোলা চলেছে, বাবু ভেইয়া কাপ্তানরা পালিয়েছে। ভাবলাম আজ বেফাজিল দিনটা যাবে তাই টোপ দিয়েছিলাম। মাপ কর ওস্তাদ।

রতনলাল হাসল। বলল, চল চা খেয়ে আসি।

ইলেকশনের বাজনা বেজেছে। আজ দরকার হয়েছে কাজের লোকের। রতনলালের মত কাজের লোক না পেলে ইলেকশনের কাজ হওয়া কঠিন।

টুকু মিঞার কথা মনে আছে রতনলালের। মুসলমান একটা আলাদা কৌম। কৌমের খেদমত করতে টুকু মিঞার দল ব্যস্ত হয়েছে। হিন্দু কৌমের জন্য রতনলালের কিছু করার তো আছে। প্রস্তাবটা এল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

রতনলালকে ডেকে পাঠাল গোবিন্দবাবু। জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী।

জান তো রতনলাল এবার আমাদের যদি হার হয় তা হলে বাংলাদেশটা মুসলমানদের রাজত্ব হবে। হিন্দুরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। ঘরের বউ-মেয়েকে টেনে নিয়ে যাবে মুসলমান গুণ্ডারা। হিন্দুর ছেলে আর চাকরি পাবে না। হিন্দুর ব্যবসা বাণিজ্য আর চলবে না। সেজন্য তোমাদের সাহায্য চাই। তোমার সাগরেদদের নিয়ে কাজে নামতে হবে।

আমি পারব না গোবিনবাবু। আমার সাগরেদদের অন্য কাজ। কাজ ছেড়ে কি এসব কাজে আসবে।

আমরা পুষিয়ে দেব। আমাদের কাজ হল দেশের কাজ। নিজের কাজ করেও তো আমাদের সঙ্গে দেশের কাজ করতে পারে।

রতনলাল ভেবেচিন্তে বলল, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে তবেই বলব। এখন কিছু বলতে পারছিনা গোবিনবাবু। তবে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।

মুসলমানদের হাত থেকেই বাঁচতে হবে এমন কথা নয় রতন। শালা কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে পান্‌জা কষতে হবে। শালারা ইংরেজের দালালী করেছে। এবার শালারা ভোটে দাঁড়াবে। যেমন করে হোক হটাতেই হবে ওদের।

কাজ আরম্ভ করলে কিছুই বলতে হবেনা গোবিনবাবু তবে ঐ কথাটা মনে রাখবেন।

কোন কথাটা?

পুষিয়ে দেবার কথাটা। আমরা তো জানেন যা করি টু পাইসের জন্য করি

এটা বলতে। আমাদের এখানে রয়েছে ঝুমরমল ঝারমলবাবু। সেই সব ব্যবস্থা করবে। আমি স্লিপ দেব, তোমার যা দরকার পাবে। তবে কথা দিচ্ছ তো? তোমার ভরসায় আছি। এইতো কাল পরশু কটা মিছিল বের করতে হবে। কম্যুনিষ্টদিদিরা বের হবে। আমাদেরও লোক চাই। মেয়েদের আসতে হবে।

তার অভাব কি? হাফ গেরস্তরা বের হবে গোবিনবাবু। তবে সোয়া টাকা হিসাবে দিতে হবে। নগদা-নগদ, রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে মেটাতে হবে। কয়'শ দরকার?

তা পঞ্চাশ জন হলেই হবে। তাদের জন্য সাড়ে বাষট্টি টাকা আর তোমার লোকজনের খরচ তো আছে। এই এক'শ টাকা নিয়ে যাও; ব্যবস্থা পাকা কর।

সেই থেকে রতনলাল কংগ্রেসসেবী।

মিছিলের সামনে রতনলালকে দেখে অনেকেই চমকে উঠল। যারা রতনলালের স্বরূপ জানে তারা ভয়ও পেল।

আমরাও চিন্তিত।

বসন্তলালকে ঘটনাটা বলতেই সে হাসতে হাসতে বলল, আগামী দিনের ইঙ্গিত যে কি তাতো বুঝতে পারছিস ননা। কিসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিস? এবার ইলেকশানের পর দেশের চেহারা যে কি হবে তাও বোঝা যাচ্ছে। ভারতের ইতিহাস হল দাসত্বের ইতিহাস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতটা সুযোগই থাকুক দাসত্বের ঐতিহ্য ভারত রক্ষা করবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। যারা গদীতে বসবে তারা আমাদের কেউ নয়। কয়েক মাস আগে বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের পরিণতি লক্ষ্য করেছিস?

করেছি। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে কামান গর্জন করতেই বেশি তৎপর হল কংগ্রেসের নেতারা। বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ভারতীয় পুঁজিপতিদের বেশি মূলধন খাটছে। যদি বোম্বাই এবং তার উপকণ্ঠে কামানের গোলা পড়ত তা হলে ভারতীয় পুঁজিপতিরাই বেশি বিপন্ন হত। পুঁজিপতিদের মুখপাত্র কংগ্রেস এগিয়ে গেল পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের যে দুর্বলতা রয়েছে তারই সুযোগ গ্রহণ করে নিরস্ত্র করল বিদ্রোহীদের।

বসন্ত বলল, অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ওপনিং সেরিমনি হল, বেচারা স্বাধীনতাকামী নৌ-বিদ্রোহীরা ভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের

মিষ্টি কথায় ভুলে আত্মসমর্পণ করেছিল। এবার তাদের কোর্ট মার্শাল হচ্ছে। এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা হল আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করতে যে কংগ্রেসী নেতারা বহুবার বক্তৃতা দিয়েছিল তারাই কালো কোট গায়ে চড়িয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষদের পক্ষে ওকালতী করতে হাজির হয়েছিল লালকেল্লায়। সুযোগ সন্ধানী এইসব নেতারা ক্ষমতায় আসবেই, এরাই দেশের মানুষের জন্য দুঃখ দুর্দশার পাহাড় তৈরী করবে।

বললাম, সাধারণ মানুষ ব্যর্থতার বেদনায় ডুকরে উঠবে, মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাবার সাহস পাবে না। অচিরেই জানা যাবে ব্যর্থতার বেদনা কত তীব্র। কেমন স্বাধীনতা নিয়ে দোকানদারী আরম্ভ হয়েছে তাও তো দেখেছি। চক্রবর্তী রাজাগোপালের ফর্মুলাই শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনবে। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান স্বীকৃত। মুসলীম লীগও নির্বাচনের শ্লোগান দিচ্ছে। পাকিস্তান কায়েম করতেই হবে। রাজাজীও এই ফর্মুলা হাজির করেছিল স্বাধীনতার পাটোয়ারীতে। আজ সেটাই যেন সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে। ক্রীপসের প্রস্তাব বাতিল। ফেডারেশন ও কনফেডারেশনের প্রস্তাব বাতিল। এখন শুধু জিগীর শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তান। কংগ্রেস এখনও তা স্বীকার করে নি। গদীর লোভে অদূর ভবিষ্যতে তা করতে বাধ্য হবে।

আজ রতনলালকে মিছিল পরিচালকদের অন্যতম দেখতে পেয়ে বুঝতে মোটেই ভুল হল না পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অথবা দাঁড়াতে পারে।

বসন্তলাল চুপিচুপি বলল, বাবার চিঠি পেলাম। বড়দির স্বামী মনোমোহনবাবু মারা গেছেন। এই সাংবাদটা বড়দিকে পৌছাতে হবে।

পানুদিদির স্বামীর মৃত্যুসংবাদ মোটেই চমকপ্রদ নয় তবুও কেমন ব্যথা অনুভব করলাম।

বসন্তলাল বলল, ভাবছি সংবাদটা কি করে পৌঁছানো যায়। বাবা আমাকেই খবরটা জানাতে বলেছেন। তুই যাবি ননা? বড়দি আবার কাঁদাকাটি করবে। কাঁদাকাটি আমার সহ্য হয় না। আমিও কেঁদে ফেলব। তার চেয়ে তুই গিয়ে খবরটা যদি দিতে পারিস, তা হলে এই হাঙ্গামা পোহাতে আর হয় না।

বললাম, তুই যখন বলছিস তখন যেতে পারি। আমার বলাটা কি ভাল হবে?

বসন্তলাল সখেদে বলল, ভালমন্দ জানি না। তবে খবরটা আমার পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়। তা হলে একটা পোষ্টকার্ড লিখতে হয়।

বললাম, দরকার নেই চিঠি লেখার। সন্ধ্যার সময় আমিই যাব।

বসন্তলাল কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। অন্যমনস্কভাবে বলল, তারি তো সোয়ামী!

পানুদিদিও সেই কথাই বলেছিল খবর শুনে।

সন্ধ্যাবেলায় পানুদিদির কাছে যেতে পারি নি। একটু রাত হয়েছিল। গিয়ে দেখি পানুদিদি আর ক্ষুদে খেতে বসেছে। বেশ পাতলা করে মাংসের ঝোল আর ভাত। আমাকে দেখেই পানুদিদি বলল, এত রাত করে এলি, আর একটু আগে এলে মাংস ভাত পেট-ভর্তি খেতে পারতি। নে আমার সঙ্গে বসে পড়।

বললাম, আমি খেয়ে এসেছি পানুদি। ভরা পেটে কোন ঝোলই উপকারী নয়।

কোথায় গিয়েছিলি?

যাই নি কোথাও। তোমার কাছেই এলাম।

এত রাতে যখন এসেছিস তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজ আছে।

তুমি খেয়ে উঠলে বলব। খাওয়াটা শেষ করে নাও।

পানুদিদি হাসতে হাসতে বলল, কোন গোপন কথা আছে বুঝি?

না। গোপন কথা মোটেই নয়।

তা হলে তুই বল, আমি খেতে খেতেই শুনব।

আগে খাওয়া শেষ কর।

তোর কথা শুনলে বুঝি খাওয়া শেষ হবে না?

তাও তো হতে পারে!

আচ্ছা পাগল তো তুই। আরে পেটের দায় বড় দায়। ছেলে মরলেও মা খাওয়া বন্ধ করে না।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

কথা বলছিস না কেন?

আমি মৃদু কণ্ঠে বললাম, বলছি। তুমি খেয়ে উঠলে বলব।

তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে এমন কোন কথা বলবি যা শুনলে আমার খাওয়াটা নষ্ট হবে। তা হলে শোন, তোর কথা না শুনলে আমি এক গ্রাসও ভাত আর খাব না। আমি থালায় হাত দিয়ে বসে থাকব। তোকে বলতেই হবে।

আমি বিব্রতবোধ করছিলাম অথচ বলতেও পারছিলাম না।

কি ভাবছিস? বল শীগ্গীর।

বলছি, তুমি খেতে থাক।

আমি তো খাচ্ছি। তুই বল।

বসন্তের কাছে নৃপেনকাকার চিঠি এসেছে।

কি লিখেছে?

জামাইবাবু মারা গেছে, বলেই ঢোক গিললাম।

পানুদিদি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কার জামাইবাবু?

বললাম, মনোমোহনবাবু।

এই কথা। বলেই পানুদিদি হো-হো করে হাসতে থাকে।

হাসছ যে বড়? তোমার স্বামী মারা গেছে আর তুমি হাসছ?

আমার স্বামী! কি যে বলিস। আমার কোন দিন বিয়ে হয়েছে কি? আমার স্বামী আসবে কোথা থেকে? সেই ধুমসো পয়সাওলা লম্পট বর্বরটার কথা বলছিস? তা বটে। আরে আইন আমার স্বপক্ষে নয়, নইলে ধুমসো লোকটার নামে রেপিং কেস করতাম! ঘেন্নার কথা। কেওড়াতলায় কত মড়া আসছে তার হিসেব রেজিষ্ট্রারের খাতাতেই থাকে। কেওড়াতলার পাশের বাড়ির লোকও তার হিসাব জানে না। ভারি তো সোয়ামী। আমি খেয়ে উঠি তারপর কথা বলব।

ক্ষুদে খাওয়া শেষ করে উঠে গেছে। আমি ক্ষুদের পিঁড়িতে বসে চুপিচুপি বললাম, তোমার মনে কি কোন রেখাপাত করল না? সত্যিই কি তুমি তোমার বিয়েকে অস্বীকার কর?

তুই যেন তত্ত্বকথা শোনাতে এসেছিস। বিয়ের ডেফিনেশনটা তোদের কাছে হোল একটা মেয়েকে সাতপাক দিয়ে একটা পুরুষের হাতে তুলে দেওয়া এবং সেই পুরুষকে যৌন-উপভোগের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া। পুরুষদের আইনে নারীদের লাঞ্ছনা, বুঝলি!

বাধা দিয়ে বললাম, তুমি একতরফা কথা বলছ পানুদি। মেয়েদের কি যৌন-অভিলাষ নেই?

নিশ্চয় আছে ও থাকবে। তার অর্থ এটা নয় তাদের কোন পছন্দ নেই, রুচি নেই।

পুরুষেরও তো পছন্দ ও রুচি আছে।

নিশ্চয়ই। সেজন্য উভয়পক্ষের সম্মতি ও বোঝাপড়াটা হল বড় কথা। কোন নারী যদি কোন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে শান্তিতে ও সুখে বাস করতে পারে সেটাই হল বিবাহ, তার জন্য সাতপাক দিয়ে অবোধ্য কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের কোন প্রয়োজন নেই। যদি নিজেদের পছন্দ ও রুচি নিয়ে কেউ এইভাবে বাস করে, তারা যদি সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে, আমরা স্বামী-স্ত্রী, তা হলে

বিবাহের বাস্তব উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আমার বিবাহ যে একটা প্রহসন সে তো তুই জানিস। অন্য মেয়েরা অবস্থার দাসত্ব করে, আমি অবস্থাকেই দাসত্ব করতে বাধ্য করেছি। সত্য সরকারের জন্য আমার মনে জ্বালা আছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী সত্য সরকারকে ক্ষমা করতে পারিনি। তাকে ক্ষমা করতে পারবও না।

খাওয়া শেষ করে পানুদিদি পাতা কুড়োতে কুড়োতে বলল, সেই বর্বর লোকটার কথা মনে হলে দেহটা ঘিন্ ঘিন্ করে। অনেকদিন গঙ্গায় স্নান করে এসেছি সেই নোংরা অতীতকে ধুয়ে ফেলতে। জীবনকে যত ছোট গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনা যায় ততই বৈষয়িক লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাতে সমাজের অথবা পরিবেশের কোন উপকার হয় না। অপরদিকে মানসিক জগতের পরিসর কমতে কমতে পশুজীবনের পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হয়। এই হীনতাকে আমি সহ্য করিনি, করতে পারি না।

কাজ শেষ করে পানুদিদি বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসে বলল, একটু চা খাবি?

না।

আজ রাতে কি তোকে ফিরতেই হবে?

কাল চাকরি আছে।

এখান থেকে খেয়ে দেয়ে চাকরিতে যাস। চাকরি তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি সব সময় ভাবি তোদের মত আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো কি করে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল!

বললাম, ওটা হল যৌবনের ধর্ম। ইমোশ্যন আমাদের টেনে নিয়ে চলে। ওটার ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না পানুদি। তুমিও তো এক সময় স্বপ্ন দেখতে।

ওটা বোধহয় আমাদের মধ্যবিত্ত চরিত্র। উকীল-মোক্তার-ডাক্তার-ছোট জমিদার, সম্পন্ন চাষীর ঘরের ছেলেরা বেশি ইমোশ্যনাল, তাও উচ্চবর্ণের হিন্দুঘরের ছেলেরা এগিয়েছিল। এদের ঐতিহ্য

আরও চমৎকার। শতকরা একজনকে বাদ দিয়ে সবারই থাকে সুপ্ত ধনতন্ত্রী কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মন। সে মনটা যখন উসখুস করে তখন এরা বিপ্লবকে শুধু বিক্রি করে না, এরা দেশের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে আমরা ডাকতে পারিনি, বিশেষ করে মেহনতী মানুষদের দূরে ঠেলে ফেলে আমরা বিপ্লব চেয়েছিলাম। যারা গরিষ্ঠ তাদের বাদ দিয়ে কোন কাজ করতে গেলে কাজের উদ্দেশ্যই শুধু বিফল হয় না, কাজের সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। আমরা যা করেছি তা হল সন্ত্রাস সৃষ্টি। তবে এরও প্রয়োজন ছিল। একটা পচা তুর্গন্ধময় সমাজের গোড়ায় আঘাত করে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করা গেছে, ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাদের যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু করবে। আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করবে।

তোমাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারলাম না পানুদি। আমরা-তোমরা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, পচা তুর্গন্ধময় সমাজকে সচেতন করেছি ঠিকই কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের মত যে সব তরুণরা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তাদের কষ্টার্জিত ফলভোগ করছে সেইসব বেইমান যাদের দেশদ্রোহী বললেও কম বলা হয়। তবে আমরা আশা করছি একদিন চালুনি ছাঁকা হয়ে আসল বস্তু জনসমক্ষে হাজির হবেই। আজও আমরা নারকোল ছোবড়া চিবুচ্ছি, শাঁসের সন্ধান পাইনি।

হাঁরে ননা, বসন্ত কেন আসে না?

আজই তার আসার কথা ছিল। তুঃসংবাদটা দেবার দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বসন্ত শোকাহত বড়দিদির অশ্রুকে নেপথ্যে রাখতে চেয়েছে, তাই আসেনি। তোমার পতিদেবতার মৃত্যু সংবাদটা যেভাবে তুমি গ্রহণ করেছ সেভাবে যে তুমি গ্রহণ করবে এটা বসন্ত ভাবতেও পারেনি।

পানুদিদি হেসেই বাঁচে না। অদ্ভুত এই পানুদিদি। জ্ঞান

হওয়া থেকে পরবর্তী বিশ বাইশ বছর তার সাহচর্যলাভ করেও তাকে চিনতে পারিনি।

আমি উঠতেই পান্নুদিদি বলল, এত রাতে না গেলেই পারতি ননা। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

বললাম লাষ্ট ট্রাম পেতে পারি, না পেলে ট্যাক্সি করে ফিরব।

পান্নুদিদি তার বাসায় রাত কাটাতে আর চাপাচাপি করল না।

কালীঘাট থেকে সোজা গেলাম বসন্তের বাসায় বাগবাজারে। গাড়ি থেকে যখন নামলাম তখন রাত বারটা বেজে গেছে। রাস্তায় লোকজন না থাকায় গা বেশ ছমছম করছিল। গলির মুখে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই গেলাম বসন্তের বাসা অবধি।

গিয়ে দেখি বসন্তলাল চুপ করে বসে আছে।

তুই ঘুমোস নি?

তোর জন্য বসে আছি, এত দেরী করলি কেন? দিদি বুঝি খুব কাঁদাকাটি করছিল?

গম্ভীরভাবে বললাম, তোর কি মনে হয়?

যা মনে হয় তাই তো বলছি।

হেসে বললাম, মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত কম তা আমরা নিজেরাই জানি না।

মানে?

গিয়ে দেখলাম পান্নুদি মাংসের ঝোল ভাত খাচ্ছে। ভাবলাম, খাওয়াটা নষ্ট করব না। খাওয়া শেষ হলে বলব। পান্নুদির পীড়াপীড়িতে বলতে হল। আমার কথা শুনে পান্নুদি হেসেই বাঁচে না। কি বলল শুনবি, আইন আমার স্বপক্ষে নয়, নইলে সেই বর্বরটার নামে রেপিং কেস করতাম।

বসন্তলালের মুখের কথা আটকে গেল। মনে হল তার দেহে রক্তের চিহ্ন নেই, গোটা মুখটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে বলল, চল শুয়ে পড়ি।

পাশাপাশি শুয়ে কেউ ঘুমোতে পারিনি।

রাত ছুটো তখন বেজে গেছে। বসন্তলাল এপাশ ওপাশ করছে।

বললাম, তুই ঘুমোস নি? কিন্তু যার জন্য আমাদের ঘুম নেই চোখে সেই পানুদিদি কিন্তু নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আমার কাছে বড়দি কেমন যেন একটা হেঁয়ালী।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার মনের কোনায় তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে পানুদিদির সেই বিয়ের কটা দিনের ঘটনা। বিয়ের দিন পানুদিদি বলেছিল, আজ আমার মরণ। বোধহয় তার কথাই ঠিক। সে দিনের সেই পানুদিদি আর বেঁচে নেই, এ পানুদিদি একটা নতুন মানুষ। আগুনে পুড়ে লাল হয়ে নতুন আকার ধারণ করেছে পৃথিবীর নানা অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে। পুরাণো দিনের সেই পানুদিদিকে আর চেনাই যায় না।

যুদ্ধ শেষ।

নতুন দিনের প্রভাতে কালো মেঘ আকাশে।

এমন সময় হিমাংশুর সঙ্গে দেখা বউবাজারের মোড়ে।

হিমাংশুকে চেনাই যায় না। সব কিছুতেই পরিবর্তন হয়েছে। চেহারার পরিবর্তন তো বটেই, কথা বলার ভঙ্গীতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

হিমাংশু আমার সহপাঠী।

বি-এ পাশ করে কর্ম-সন্ধান করছিল। যুদ্ধের বাজারে উপযুক্ত কর্মসংস্থানও করেছিল। আর্মিতে ক্যাপটেনের পদ লাভ করে বর্তমানে সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় ফিরে রিলিজ পেয়েছে।

আরে ননা যে?

তাকিয়ে দেখলাম। চিনলাম হিমাংশুকে।

তারপর কেমন আছিস তুই?

বললাম, চলে যাচ্ছে। তোর খবর বল।

আমি তো ছিলুম আর্মিতে। সাউথ ইষ্ট সেকটরে ছিলুম। এবার রিটায়ার করেছি।

বললাম, তোর কাছে অনেক জানার আছে। কোথায় ছিলি ভাই?

বর্মায় ছিলুম, সিঙ্গাপুরে ছিলুম, বটেভিয়াতে ছিলুম, হ্যানয় থেকে রিলিজের কথা। হয়নি। এলুম সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর থেকে ইণ্ডিয়া এসেই রিলিজ। এখন আবার কাজ খুঁজতে হবে। আশা করছি নতুন কোন কাজ সরকার আমাদের দেবে।

হেসে বললাম, আবার চাকরি খুঁজতে হবে।

হাঁ ভাই। এবার লাখ লাখ লোককে চাকরি খুঁজতে হবে। ওয়ার সার্ভিস থেকে কম করেও বিশ লাখ লোককে ছাঁটাই করবে। তার ওপর আছে সিভিলিয়ান কর্মপ্রার্থী।

তোর কাছে ওসব দেশের গল্প শুনব। আছিস কোথায়?

সেই পুরাণো মেসে। ছিদাম মুদি লেনে। আসিস একবার। আজ আসিস না, কাল যে কোন সময়।

বললাম, আমার আস্তানা তো কাছেই। সেখানেই তো আসতে পারিস। রাতে থাকবি। বসন্তও আসবে। বসন্তের বাসাতেও যেতে পারিস।

বসন্ত? কোন বসন্ত?

আমার ভুল হয়েছে। বসন্তকে তুই চিনবি না। আমার পলিটিক্যাল ফ্রেণ্ড, স্কুলের সহপাঠী। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন বসন্ত বন্দী ছিল। আসিস যদি তা হলে পরিচয় হবে।

হিমাংশু চিন্তা করে বলল, দেখি যদি আসতে পারি! আমার আবার য়্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ছুটতে হচ্ছে। সময় যদি পাই তবেই আসব।

হিমাংশু রূপম সিনেমার কাছে এসে বাস ধরল।

আমি মনে মনে হাসলাম।

বিশ লাখ ওয়ার সার্ভিস থেকে ছাঁটাই হবে। আরও দশলাখ চাকরিতে থেকেই যাবে। তাহলে তিরিশ লাখ ভারতীয় কর্মপক্ষে ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে জানমাল দিতে গিয়েছিল। কংগ্রেস অসহযোগ করেছিল, এই তো শুনেছি। কংগ্রেস মানেই ভারতের প্রতিনিধি। এই দাবী করে আসছে কংগ্রেস অথচ এত লক্ষ লোক ইংরেজের সেবা করেছে সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে। ওরা ভাড়াটিয়া লোক, ভাড়াটিয়া লোক দিয়েই তো ইংরেজ ভারত দখল করেছিল, সিপাহী বিদ্রোহ দমন করেছিল ; আজ অবধি ভারত শাসন করছে। ভারতের মানুষ ভাড়া খাটতে রাজি। যারা ভাড়া খাটতে পারছে না তারা চিৎকার করছে, এদেরই কোন অংশ ভাড়া খাটার সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হিমাংশু এই ঋষিবাক্য যেন শুনিয়ে গেল। যে হিমাংশু হলওয়েল মনুমেন্ট তুলে দেবার জন্য কলেজ ডিবেটিং-এ জোর জোর বক্তৃতা দিত সেই একই হিমাংশু হলওয়েলের উত্তরপুরুষদের রাজ্য রক্ষা করতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিল। আশ্চর্য মনে হল, অস্বাভাবিক কিছু নয়। হাজার হাজার বছরের দাসত্বের তিলক যাদের কপালে তারা এই ভাবেই আত্মবিক্রয় করে থাকে !

হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম একদিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু জান কি ?

সামান্য কিছু জানি, বাট্ হি এস্কেপড মানে বর্মা থেকে পালিয়ে যখন যাচ্ছিল থাইল্যাণ্ডের দিকে তখন আমরা এনসার্কেলও করেছিলাম। সামান্যের জন্য হাত পিছলে পালিয়ে গেছে।

চমকে উঠে বললাম, বাজে গল্প শোনাচ্ছিস।

নো নো মাই ফ্রেণ্ড। আমরা খবর পেলাম সুভাষ ফ্লিইং। আমাদের কর্ণেল চাউঢারী অর্ডার দিল, এনি হাউ সুভাষকে অ্যারেস্ট কর। জীবন্ত অথবা মৃত তাকে চাই। জানিসতো মিলিটারী লাইফ, ডু অর ডাই।

তারপর।

জাপানের দালাল একজন সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট, নাম যেন কি মিশ্র। হাঁ মিশ্র বটে। দালালদের মেজর। আমাদের কর্ণেল চাউঢারীকে খবর পাঠাল, এ্যালাউ সুভাস ইজি রিট্রিট।

কর্ণেল বলল, নো নেভার। ওয়াণ্ট হিম ডেড অর লিভিং।

মিশ্রের মেসেনজার বলল, আমরা তাকে নিরাপদে ব্যাঙ্ককে পাঠাবই। তার জন্য ব্লাডশেড্‌ হয় হোক। তা বলে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।

বেশ। তাই হল। আমাদের ওপর অর্ডার হল, এনসার্কেল এণ্ড ফায়ার।

বাস্‌, লড়াই শুরু হল।

দু ঘণ্টার লড়াই।

লড়াই থামতেই আমরা এগিয়ে গেলাম। রাস্তায় মরার গাদা কিন্তু নো হোয়ার সুভাষ। এরা প্রাণ দিয়ে সুভাষকে পালাবার পথ করে দিয়েছে।

কর্ণেল তো রেগেই আগুন।

অর্ডার দিল, চেজ হিম।

আর চেজ। বন জঙ্গলের পথে কোথায় যে সুভাষ মিলিয়ে গেল তা কেউ বলতে পারল না। দিস্‌ আই নো এ্যাবাউট সুভাষ। চোখে দেখিনি তাকে।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সামরিক বাহিনীতে যে প্রচার চালানো হয়েছে তারই প্রতিফলন দেখলাম হিমাংশুর বক্তব্যে। তবুও বললাম, বর্মা কেমন লাগল।

ভেরি নাইস। ওমান এণ্ড ওয়াইন ভেরি চিপ্‌।

ভেবেছিলাম হিমাংশুর কাছে আরও কিছু শুনতে পাব কিন্তু কথার বাঁধুনিটা ঠিক পথে চলছিল না, অন্তত রুচিসম্মত মনে করতে

পারছিলাম না। মনে মনে বিরক্তি বোধ করছিলাম। তবুও চুপ করেই ছিলাম।

হিমাংশু আবার বলল, এভ্রি হোয়ার্। বর্মাতেও যা, সুমাত্রা-জাভাতেও তাই। ব্যাঙ্ককেও তাই, সায়গন বাদ দিয়ে। মোষ্টলি আদারওয়াইজ ইন্ ইন্দোচায়না। ওদের ঠিক ফলো করতে পারিনি। প্যারিসের সভ্যতা ইন্দোচায়নাতে ঠিক শেকড় গাড়তে পারেনি। অবশ্য ওয়াইন ওম্যানের লাকসারি আছে তবে নট্ সো মাচ্ অ্যাজ ইন্ আদার কানট্রিজ্।

সিগারেট ধরিয়ে হিমাংশু আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

বললাম, ও-রসে বঞ্চিত।

মনে পড়ল সেই মালহোত্রার ঘটনা। হিমাংশুকে বলতে পারতাম, ইণ্ডিয়া ইজ্ নো একসেপশ্যান। যেখানে অর্থের বৈষম্য থাকবে সেখানেই থাকবে পাপের পাহাড়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ছেলে এভাবে হীন উন্নাসিক হবে তা ভাবতেও পারিনি।

ভেবেছিলাম হিমাংশুর কাছে জানা যাবে সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা, শুনতে পাব ওসব দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, জানতে পারব ওদেশের মানুষদের আচার আচরণ ইত্যাদি। হিমাংশু এই সবের ধার ধারে না। ইংরেজের অর্থপুষ্ট ঘাতকবাহিনীতে নাম লিখিয়ে হিমাংশু ওয়াইন এণ্ড ওম্যান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন মনে করেনি। পাপের খতিয়ানটা ভালভাবে জেনে এসেছে, ভারতের পাপীদের উদ্ধার করতে। এরপর হিমাংশুই হয়ত হবে কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট।

নির্বাচন শেষ।

বন্দীশালা থেকে কংগ্রেস নেতারা বেরিয়ে এসেই হিরো সেজেছে। যুদ্ধকালীন দুঃখ দুর্দশার দিনে জনসাধারণের পাশে ওরা দাঁড়ায়নি, দুর্ভিক্ষের দিনে একমুঠো অন্ন দেবার কোন চেষ্টাই করেনি, সেদিন জনতাকে পরিচালনা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসেই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের বেদনা মোচন না করে দেশের মানুষ যে সব কাজ করেছে তারই সুফলের লায়ন শেয়ার গ্রাস করতে নেমে পড়ল। তারা যে আজাদ হিন্দ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, তাদেরই কার্যকলাপকে মূলধন করে নেমে পড়ল আসরে। সাধারণ লোক মনে করল, কংগ্রেসই এই বিরাট কাজের প্রবক্তা। যে বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের জেলখানায় পাঠিয়েছিল কংগ্রেসী নেতারা তাদের গুণপণা শুনিয়ে দেশের অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত মানুষদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে হাজার কয়েক মানুষ যে প্রাণ দিয়েছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে প্রচার করল 'ভারত ছাড়' আন্দোলন একটা বিপ্লব, সে বিপ্লবের পরিচালক ছিল কংগ্রেস। অথচ এদের বিরোধিতা করতে জেলখানা থেকেও বাণী ত্যাগ করেছিল এইসব নেতারা।

মানুষ হল বেভুল প্রাণী।

সংবাদপত্রওলারা পুঁজিবাদীদের বড় অস্ত্র। এই শানিত অস্ত্রের খপ্পরে পড়ল জনসাধারণ। প্রচার ব্যবস্থা এত সুপরিকল্পিত যে দেশের মানুষ মনে করল, হাঁ কংগ্রেসই দেশের একমাত্র প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিই দেশের জন্য সব কিছু করেছে। মানুষ ছুটল কংগ্রেসের পেছনে, তারা বুঝতেও পারল না, কংগ্রেসকে পরিচালনা করছে পুঁজিপতিরা, পুঁজিপতিদের অর্থে কংগ্রেস পুষ্ট, কংগ্রেস দেশের মানুষের কেউ-ই নয়। সাধারণ মানুষকে ধাপ্পাবাজী করে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সুগার কোটেড ভেনম্ ভোজন করাচ্ছে কংগ্রেসী নেতারা।

তাই নির্বাচনের বাজনা বাজতেই কংগ্রেস আসর জমিয়ে বসল।

কম্যুনিষ্টরা জনযুদ্ধের ধুয়া তুলে এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যঙ্গচিত্র ছেপে দেশের মানুষের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানও মোটেই ছিল না। জনসাধারণকে এবিষয়ে ব্যাপক শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টাই করেনি এ-দেশের কম্যুনিষ্টরা! এটাও সুযোগ সৃষ্টি করল কংগ্রেসের জন্য।

গোটা ভারতেই নির্বাচন।

কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। যে সব মুসলমান কংগ্রেসের টিকিট গলায় বেঁধে নির্বাচনে নেমেছিল তাদের প্রায় সবাই পরাজিত হল। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরাজয় হল অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের। কোন কংগ্রেসী মুসলমান একটি আসনও দখল করতে পারেনি বাংলাদেশে। মুসলমানদের মধ্যে জবরদস্ত নেতা ফজলুল হকের পার্টিও মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। ধর্মান্ধতার জোয়ারে ফজলুল হকও যেন ভেসে গেল। মুসলীম লীগ হল জয়ী দলদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী। তারা তপশীলিদের হাত করে মন্ত্রীসভা গঠন করল শহীদ সোরাবুর্দির নেতৃত্বে।

ঘটনাগুলো বেশ চমকপ্রদ মনে হলেও স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করা যায়।

পাকিস্তান হাসেল হবে এধারণা বদ্ধমূল হয়েছে প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে। একে বাধা দিতে হিন্দুমহাসভাও রঙ্গমঞ্চে নেমেছিল কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। বলতে গেলে, বাংলাদেশে হিন্দুমহাসভার অস্তিত্বও ঠিক বোঝা যায় নি। বাংলার হিন্দুরা যে ধর্মান্ধ নয় তার নিদর্শন হিন্দুমহাসভার অসাফল্য।

সত্য সরকার এবারও পাশ করেছে।

কলকাতা শহরটা যেন হিন্দু-মুসলমানের দুটো এলাকায় বিভক্ত। মুসলীম লীগের নেতৃত্বে যারা রয়েছে তারা অর্থবান অবাঙ্গালী

মুসলমান। বাঙ্গালী মুসলমানরা শুধুমাত্র ধর্মের উন্মাদনায় ভাল-মন্দ ভুলে গেল। শ্রেণীগত বৈষম্য সর্বনাশ ডেকে আনার পথ উন্মুক্ত করল।

নির্বাচন শেষ হয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর পথে বের হতে আজকাল ভয় করত। বিশেষ করে মুসলমান এলাকায় 'পাকিস্তান হোটেল', 'পাকিস্তান স্টোরের' সাইনবোর্ড আর চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ পতাকা নিয়ে মাঝে মাঝেই মিছিল দেখতে দেখতে কেমন একটা স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতাম। বিশেষ করে যে সব লোক এই সব মিছিলের সামিল হত তাদের বেশভূষা আর চেহারা মোটেই সুখকর মনে হত না।

হিন্দু পাড়াতেও শ্লোগান শোনা যেত, 'কান মে বিড়ি মু মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। ঠাট্টা ব্যঙ্গ শোনা যেত সব সময়, আবার অর্থনৈতিক চিন্তা করতেও দেখেছি অনেককেই। সবাইয়ের চিন্তা মুসলমানদের রাজত্বে হিন্দুরা বউ-মেয়ে নিয়ে নিরাপদে বাস করতে পারবে না, চাকরি পাবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হটিয়ে দেবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক দিন পান্নুদিদির বাসায় যাই নি। বসন্ত কেন বা দেশে গেছে। সামনে ছুটি। কোন কাজও ছিল না। ব্যাঙ্কের লেনদেন কেমন যেন মন্দা। পরিচালকরা ভাবছে। ভাবনাটা যে অশুভ তা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। অবসর পেয়ে সেদিন সন্ধ্যার পর পান্নুদিদির বাসায় হাজির হলাম। পান্নুদিদি বাসায় ছিল না। ক্ষুদে রান্না করছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, দিদি কোথায়?

ক্ষুদে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বলল, দিদি ডিউটিতে গেছে। সাতটায় আসবে। আপনি দিদির ঘরে বসুন। আমি চা করে আনছি।

শীতের শেষ। তবুও সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা অনুভব হয়। গরম

চা উপাদেয় হবে মনে করে বললাম, একটু তাড়াতাড়ি করে চা লাগাও।

পান্নুদিদির ঘরে আলো জ্বেলে বসলাম।

বিছানার ওপর সেদিনের তিনখানা খবরের কাগজ ভাঁজ করা ছিল। একখানা আজাদ, মুসলীম লীগের উগ্র হিন্দু বিরোধী পত্রিকা। দ্বিতীয়টি বর্মন ষ্ট্রীটের পুঁজিবাদীর স্বার্থরক্ষক আনন্দবাজার, তৃতীয়টি ন্যাশ্যানালিস্ট, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যার পৃষ্ঠপোষক।

পান্নুদিদি সকল শ্রেণীর মত জানার জন্য তিনখানা কাগজ নেয়। ইংরেজ পুঁজিবাদীদের পৃষ্ঠপোষক স্টেটসম্যানটা থাকলেই ষোলকলায় পূর্ণ হত।

কাগজ উল্টে দেখছি এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে পান্নুদিদি ঘরে ঢুকেই বলল, বাঁচলাম। তোর কথাই ভাবছিলাম। অনেকদিন তোকে দেখিনি।

পোষাক বদল না করে আমার পাশে বসে হাতপাখা তুলে নিয়ে বাতাস খেতে থাকে।

বললাম, শীতের রাতে তোমার এত গরম।

দৌড়ে দৌড়ে আসছি, ঘেমে উঠেছি। তোর বুঝি শীত করছে। এই যে চা এসে গেছে। এবার গরম হতে পারবি। হাঁরে কিছু খাবার আছে রে ক্ষুদে? যা আছে নিয়ে আয়।

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে পান্নুদিদি বলল, রাতের বেলায় তোর শুকনো মুখ দেখলেই আমার ভয় করে। কোন দুঃসংবাদ নিয়ে আসিস নি তো?

দুঃসংবাদই বটে। তবে তুমি তা জান, সত্য সরকার আইনসভার মেম্বার হয়েছে।

দেশের বড়ই দুর্দিন। সত্য সরকারের মত লোক যে দেশের জনপ্রতিনিধি সে দেশের 'জন' বোধ হয় মৃত নইলে ক্লীব।

এরচেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঋণ বোধহয় রক্ত দিয়ে শোধ দিতে হবে পানুদি।

সে আবার কি কথা?

মুসলমানরা আশা করছে বাদশাহী ফিরে পাবে। সবাই বুঝেছে এবার ইংরেজ তল্পীতল্পা গুটিয়ে ফেলবে। সেজন্য বাঁদরের রুটিভাগের ব্যবস্থা হচ্ছে। মুসলমানদের ধারণা তাদের সাধের পাকিস্তানের পথে বড় প্রতিবন্ধক হল হিন্দুরা। বিশেষ করে হিন্দু প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতাদের ওপর ওদের যত রাগ। পাকিস্তান হাসেল করতে ওরা 'খুনকা বদলা খুন' নীতি গ্রহণ করবে। গরীব মুসলমানদের উস্কানি দিয়ে যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার পরিণতি হবে শুধু নরহত্যা ও রক্তপাত।

পানুদিদি বলল, গরীবের কোন জাতি নেই ননা। সারা দুনিয়াতে দুটো জাতি আছে। একটা পুরুষজাতি আরেকটা নারীজাতি আর আছে দুটো শ্রেণী, এক দল haves আরেক দল have-nots—রক্তপাত তখনই হবে যখন haves-দের কাছ থেকে ক্ষমতা ও অধিকার have nots-রা আদায় করতে চেষ্টা করবে। সমস্যা কিন্তু দুজনেরই। হিন্দু পুঁজিপতিরা ভাবছে মুসলমান পুঁজিপতিরা যদি লুটেপুটে খাবার সুযোগ পায় তা হলে তাদের এতদিনের কায়েমী অধিকার আঘাত পাবে। মুসলমান পুঁজিপতিরা ভাবছে যদি হিন্দু প্রতিযোগীদের হটাতে পারি তা হলে তাদের কায়েমী অধিকার স্থায়িত্বলাভ করবে। দুই দল শোষকের এই লড়াইতে মরবে গরীব হিন্দু-মুসলমান। এই বোকার দল ধর্মের নামে হানাহানি করবে। তাই বলছি গরীবদের কোন জাতিধর্ম নেই, অশিক্ষা আর অজ্ঞানতা এদের ধর্মের পাঁঠা তৈরী করেছে, এবার বলী দেওয়া হবে।

বললাম, এই আশঙ্কা রয়েছে বলেই চিন্তিত। আমাদের এলাকায় মুসলমান গরিষ্ঠ। হাজার বছর ধরে যাদের সঙ্গে নির্বিবাদে বাস

করে এসেছি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে আমাদেরই বেশি বিপন্ন হতে হবে।

তাই তো বলছি, দেশের বড় দুর্দিন। অশান্তির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যাক ওসব কথা। আমি রান্নার ব্যবস্থায় চলছি। চাট্টি ভাত করে নিতে বলছি। হোটেল থেকে মাংসের ঝোল আনিয়ে নেব। উপাদেয় হবে।

বললাম, আমি মেসে গিয়ে খাব পান্নুদি।

পান্নুদিদি আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে পাশের ঘরে গেল পোষাক বদলাতে।

ফিরে এসে আমার পাশে বসল। গম্ভীরভাবে বলল, না। এখানেই খাবি। আজ না-ই বা গেলি মেসে ফিরে।

বললাম, মেসে আমার জন্য কেউ-ই চিন্তা করবে না পান্নুদি। সেজন্য ভাবছি না। তোমারই অসুবিধা হবে। তোমার তো একটা বিছানা আর ক্ষুদের একটা। ঘরও শোবার মত দু'টো।

পান্নুদিদি নির্বিকারভাবে বলল, আমার বিছানায় থাকবি।

তুমি বুঝি ক্ষুদের বিছানায় শোবে?

তা কেন? তোর পাশেই শোব।

আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তবুও বললাম, তামাসা করছ পান্নুদি?

না রে তামাসা নয়। আমার জীবনটা হল বাস্তবের বোঝা। সত্যদা আর মিথ্যাদা নিয়ে কারবার করতে বসিনি। তুই যে পারবি না আমাকে পাশে নিয়ে শুতে, এটা আমার জানা আছে। কেমন বেকুব ছেলে রে তুই। অন্য কাউকে বললে সে তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরত। ওরা জানে এই শয্যাবিলাসে দায়িত্ব থাকে না, দেহে কোন আঁচড় কাটে না। তুই পারবি না। তাও জানি। তবে আমি তামাসা করিনি।

বলেই হো-হো করে হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়ল। এ যেন

হাসির কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এটা কিছুই নয়, একটা sport, বুঝলি।

কি বলছ পানুদি। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

পানুদিদি চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মাড়োয়ারীদের ছুটো হিসাবের খাতা থাকে। একটা খাতা থাকে ইনকাম ট্যাকস্ সেলস্ট্যাকস্ ফাঁকি দিতে, আরেকটা খাতায় থাকে তার চোরাই টাকার হিসাব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থসম্পন্ন লোকের ছুটো চেহারা থাকে। বাইরের চেহারাটা দেখে ভেতরটা জানা যায় না। ভেতরটাই আসল চেহারা। চোরাই চেহারা যাতে বুঝতে না পারে বাইরের লোক সেজন্য সাজগোজ করে লোক ঠকাতে বাইরের চেহারার দরকার হয়। আমার যখন আঠার-বিশ বছর বয়স ছিল তখন একথা বললে পাগল মনে হওয়া স্বাভাবিক হত। অন্তত নষ্টা বলত সবাই। আমার বাইরের চেহারাটা দেখত, আজ কি সেই বয়সের মনটা আছে রে?—নেই। সেজন্য আমার কথাকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করিস। তুই পারবি নে জানি। পারত আমার হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তাররা, পারত সত্যদার মত জনপ্রতিনিধিরা।

এতক্ষণে আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। পেছনের ইতিহাস সামনে টেনে এনে পানুদি ব্যঙ্গ করছিল। বললাম, তোমাকে বুঝতে পারলাম না এতদিনেও। কদিন আগে বসন্ত বলছিল, বড়দি কেমন একটা হেঁয়ালি, কেমন একটা ধাঁধা। এখন দেখছি সত্যিই তাই।

পানুদিদি কোন প্রতিবাদ করল না। মৃদুস্বরে বলল, বাস্তব জীবনের বহু দিক আছে। সব দিক পূর্ণ হয় না কারও। কোথাও কোথাও শূন্যতা থেকে যায়। আমারও শূন্যতা থেকে যাচ্ছে। সেই শূন্যতার বেদনা মাঝে মাঝে আমাকে কেমন বিভ্রান্ত করে।

আমি কোন কথা খুঁজে পেলাম না।

পানুদিদির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠতে দেখলাম। এরকম চাহনি এর আগে কখনও দেখিনি।

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, একটা খবর তোমাকে দেওয়া হয় নি।

কি খবর ?

শুনলাম বসন্তের বিয়ে। অবশ্য বসন্ত আমাকে বলে নি। লোকমুখে শুনেছি। সামনের বোশেখেই নাকি শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

কোথায় বিয়ে, কেমন মেয়ে এসব শুনেছিস কি ?

জানিনা। শোনা কথা বলে লাভ কি। শুনেছি বেশ বড়-লোকের একটাই মেয়ে। বিয়ে ঠিক করেছেন তোমার বাবা। অর্থ-প্রাপ্তি যোগটা বোধহয় ভালই হবে।

পানুদিদি হেসে বলল, বাবা তার শেষ জীবনের জন্য একটি মহৎ কাজ করে পুণ্য সঞ্চয় করতে চান। প্রথম জীবনের মহৎ কাজের ভার বহন করছে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা, শেষ জীবনে দায় বহন করবে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তবে সত্যিই যদি তোর কথা ঠিক হয় তা হলে বাবা পুত্রও হারাবেন, সংসারে শান্তিও হারাবেন।

পানুদিদি ক্ষুদেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, ভাত হয়েছে রে ?

রান্নাঘর থেকে ক্ষুদে উত্তর দিল, হয়ে এসেছে।

তুই বস ; আমি এখুনি আসছি।

পানুদিদি বেরিয়ে গেল টিফিন ক্যারিয়ার হাতে করে। হোটেলে গেল মাংসের ঝোল কিনতে।

আমি ভাবছিলাম বসন্তের কথা।

বসন্ত আমাকে তার বিয়ের কথা বলেনি ঠিকই কিন্তু যা শুনেছি তাতে বসন্তের কাজকে কোন মতেই রুচি-সম্পন্ন মনে করতে পারিনি। শুনেছি, মেয়েটি নাকি কুরূপা। অর্থের বিনিময়ে কুরূপাকে নৃপেন-কাকা পুত্রবধূর আসনে বসাবেন। কুরূপা হলে আমার বলার কিছু

নেই। অর্থের বিনিময়ে নিজেকে এইভাবে বিক্রি করা আমার রুচি-বিরুদ্ধ। অর্থ দিয়ে মানুষ কেনার মধ্যযুগীয় যে ব্যবস্থা চলে আসছে মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্য আমি মোটেই গৌরব বোধ করি না। পরস্পরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে সুরূপা-কুরূপা যেই আসুক ঘরে তাকে সাদরে বরণ করে নেওয়া সম্ভব কিন্তু অর্থের লোভে পিতৃভক্ত সন্তানের মত পিঁড়িতে বসে একটা অজানা মেয়েকে "তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক ও অভিন্ন" বলাটা কতটা অধর্ম ও অনাচার তা বলে শেষ করা যায় না।

পানুদিদি খাবার নিয়ে ফিরে এল।

তিনজনে পাশাপাশি খেতে বসেছি।

পানুদিদি নিজের মনেই বলল, ভুলের পর ভুল করে চলেছেন বাবা। এর কঠিন পেনালটি দিতে হবে ভবিষ্যতে সেটাও ভুলে গেছেন। আমরা সন্তানরা নিরুপায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আমাদের মন ও মতকে কোন সময়ই মূল্য দেওয়া হয় না। এতে কিসের ইঙ্গিত জানিস? সেই পচা নর্দমার গন্ধ! মানুষের সমাজ দম বন্ধ হয়ে মরবে। শ্রেণী বৈষম্য মানুষের মনে কিভাবে স্থান করে নেয় তার দৃষ্টান্ত। ছিঃ।

হেসে বললাম, আমরা ঐতিহ্যবাহী একদল লোভী জীব। আমাদের কাছে ছিঃ যে বলে সেই ছি-ছি হয়ে বাস করে সমাজে।

নীরবে খাওয়া শেষ করে পানুদিদি হাত ধুতে গেল।

ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

বললাম, আমি যাচ্ছি পানুদি।

পানুদিদি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল, হাঁ-না কিছুই বলল না।

আস্তে দরজা ভেজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

খেলাটা জমেছিল দিল্লিতে।

জঙ্গী আসর থেকে ডেকে এনে বড়লাটের আসনে বসিয়েছিল ওয়াভেলকে। চার্চিল ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। অতি অনুগত জেনেই ওয়াভেলকে পাঠিয়েছিল চার্চিল যাতে সম্রাটের সাম্রাজ্য দেউলিয়া না হয় তার রক্ষকরূপে।

যুদ্ধজয়ের গৌরব টিকা চার্চিলের কপালে আঁকা। দেশের লোক কিন্তু চার্চিলের বীরত্বকে সমাদর দেখাতে এগিয়ে এল না। তারা গদীতে বসাল এটিলিকে।

পটপরিবর্তন শুরু এখানেই।

ইংরেজ, মার্কিন আর রাশিয়া যে চুক্তি করেছিল তাতে স্পষ্ট জানান হয়েছিল; সাম্রাজ্যবাদ এযুগে অচল তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দেবে।

যুদ্ধ শেষে শিরে কষাঘাত।

শক্তির প্রতিযোগিতায় ইংরেজ পরিণত হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীতে। সংঘাতের মুখে দাঁড়াবার সাহস নেই তার। অথচ তার বেনিয়া স্বার্থ রক্ষা করতেই হবে।

ইংরেজ রাজনীতির দাবা খেলছে।

এটিলি ভারতকে স্বাধীনতা দেবে স্বীকার করেছে।

তবে?

হাঁ, এর মধ্যে তবে থেকেছে। যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে বৃটিশ মন্ত্রীরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ফর্মুলা নিয়ে হাজির হয়েও কোন মীমাংসায় আসতে পারেনি। মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস একমত হতে পারেনি। নতুন ফর্মুলার সন্ধান করছে সবাই।

দিল্লিতে তখন প্রতিযোগিতা চলছে, কে কতটা ইংরেজ অনুগত এবং ইংরেজ স্বার্থরক্ষা করবে। দর কষাকষি চলছে। ইংরেজও ফাট্‌কা খেলছে তার বেনিয়া স্বার্থ বজায় রাখতে।

সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছে, ইংরেজ আজ হোক কাল হোক এদেশ থেকে যাবেই।

এই যাওয়া যখন স্থির তখন পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে নামল জিন্নাহ্। তার পাকিস্তান চাই। পাক (পবিত্র) ভূমি চাই। যে পবিত্রভূমির বাদশা হবে মুসলমান।

কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারত।

লীগ চায় বাংলা-আসাম-সিন্ধু-পাঞ্জাব-উত্তরপশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ।

কোন পক্ষই দাবী ছাড়তে রাজি নয়।

ভারতে তখন দুটো ভাগ। ইংরেজের সাক্ষাৎ শাসনাধীন ভারত আর দেশীয় রাজাদের মারফত পরোক্ষ শাসিত ভারত। ইংরেজ সাক্ষাৎ শাসনাধীন ভারত নিয়েই দোকানদারী করছে। মধ্যযুগের সন্ধি বা চুক্তিতে পরোক্ষ শাসিত ভারতের কথা বলছেনা।

সাক্ষাৎ শাসিত ভারত নিয়ে ঝগড়া মেটেনি।

জিন্নাহ্ তার দাবী থেকে এক পা সরতে রাজি নয়।

সমস্যা সমাধান করতে না পেরে এটিলি পাঠাল লর্ড মাউন্টব্যাটনকে বড়লাট করে, ওয়াভেল বিদায় নিল।

মাউন্টব্যাটনের স্ত্রীর ভূমিকাকেই ইতিহাসকাররা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুসলীম লীগ পাকিস্তানের দাবী আদায় করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্র কিন্তু সারা ভারতের কোথাও ছিল না একমাত্র বাংলাদেশ ভিন্ন। পাঞ্জাব মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশ হলেও মুসলীম লীগ ক্ষমতায় যেতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলীম গরিষ্ঠ প্রদেশ হলেও সেখানে কংগ্রেস ক্ষমতার অধিকারী। সিন্ধুতেও একই অবস্থা, আসামে মুসলীম লীগকে ক্ষমতা দখলে রাখতে হিন্দুদের ও পার্বত্য আদিবাসীদের সহায়তা নিতে হয়েছে। সেটাও একক লীগের প্রদেশ নয়।

তারা বেছে নিল বাংলা দেশকে। বাংলা দেশে অশান্তির আগুন জ্বালতে পরিকল্পনাও তৈরী হল। তারপরই ঘোষণা করল, ছয়চল্লিশ সালের ষোলই আগস্ট হবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।

বাংলা হল মুসলীম লীগের বড় ঘাঁটি। এখানে যারা মুসলমান পুঁজিপতি তারা বাঙ্গালী নয়; তারা বাংলাদেশকেই তাদের শোষণের নিরাপদ আশ্রয় মনে করে এখানেই আগুন জ্বালাবার সব ব্যবস্থা পাকা করেছিল। মুসলীম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলা দেশকে কব্জায় রাখার একমাত্র অস্ত্র হিন্দু বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া। বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই হল অশিক্ষিত ধর্মান্ধ। মোল্লা-মুসল্লী যা তাদের খোদার বাণী বলে শোনায় বিনা দ্বিধায় তারা তা মেনে নেয়। এই সরল মানুষগুলোকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে নামল মুসলমান শোষকরা। এই কাজটি প্রচার করতে থাকে মুসলীম লীগের দৈনিক পত্রিকা আজাদ ও ইত্তেফাক।

অপর পক্ষে হিন্দু পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা খাটছে বাংলা দেশে। কলকাতা হল স্বর্ণপ্রসবিনী। বাংলার মত কামধেনুকে হাতছাড়া করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তারাও মুসলীম লীগের পাকিস্তানকে বানচাল করতে বদ্ধপরিকর। এই হিন্দু পুঁজিপতিদের প্রায় সর্বাংশই অবাঙ্গালী। তারাও সমাজবিরোধীদের প্রস্তুত করতে থাকে বহু অর্থব্যয়ে।

উভয় সম্প্রদায়ের গরীব মানুষরা ধর্মের নামে দলবদ্ধ হল। একে অপরকে আঘাত করতে প্রস্তুত। অগ্নি সংযোগের অপেক্ষা মাত্র। পুঁজিপতিদের শোষণ চিরস্থায়ী করতে গরীব মারার এই অপচেষ্টাকে কেউ সেদিন আবিষ্কার করতে পারেনি। যারা প্রগতিশীল বলে দাবী করত তারা ইংরেজের জনযুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ধাক্কায় বিবরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্য মানুষকে পথ দেখাবার মত লোক আর সেদিন ছিল না

বললেই হয়। যারা এই অপকার্যবিরোধী তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারত না।

প্রস্তুতি চলছে। কেন্দ্রে মধ্যকালীন সরকার গঠিত হয়েছে।

সবাই অপেক্ষা করছে স্বাধীনতা কিভাবে কোন পথে আসে তাই দেখার।

তখনও ষোলই আগষ্ট আসতে দেরী।

এমন সময় বসন্তলাল এল আমার মেসে। বলল, সুমন্ত এসেছে বিয়ের বাজার করতে। তাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

আমি যেন কিছুই জানিনা। বোকার মত বললাম, কার বিয়ে?

বসন্তলাল নির্বিকারভাবে বলল, শুনিসনি বুঝি, আমার বিয়ে।

সুখবর। কবে বিয়ে।

বোশেখের শেষ সপ্তাহে। তোকেও তো যেতে হবে। আজ বাজারটা করে দে। রাতের গাড়িতে সুমন্ত আবার ফিরে যাবে।

আমার যে অফিস আছে। আর বিয়েতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও ভাবতে হবে। বিয়েতে যাবার মত পোষাক চাই, উপহার দেবার মত অর্থ চাই। সব কনডিশ্যন যদি মেটাতে পারি তা হলে অবশ্যই যাব। তবে কর্তৃপক্ষ ছুটি দেবে কিনা সন্দেহ।

বসন্তলাল মনে মনে অসন্তুষ্ট হল।

বললাম, তোর বড়দিকে নিয়ে যাবি না?

আমার ইচ্ছা আছে। তবে তার যাওয়াটা নির্ভর করছে বাবার ওপর। বাবার কোন নির্দেশ পাইনি। আমি তাকে নিয়ে যেতে পারি। যদি সেখানে কোন অশান্তি ঘটে, যদি বড়দি অপমানিত হয় তার দায়িত্ব কে নেবে? এসব ভেবে ঠিক করতে হবে। দেখি বাবা কি বলেন।

কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলাম। বিকেল বেলায় সুমন্তলাল এল। তার সঙ্গে বিয়ের বাজার শেষ করে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে মেসে ফিরে এসে ভাবছিলাম, এই সেই বসন্তলাল। তার কয়েকটা

কথা মনে পড়তে থাকে। 'জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার কোন সহপাঠীই সাহস করে আমার সঙ্গে কথা বলত না। একমাত্র ননা আমাকে হরিজন মনে করেনি'। সেই ননাকে মুখের কথা সময়মত বলতে সে পারেনি। আশ্চর্য!

বিয়ের কয়েকদিন আগেই বসন্তলাল বাড়ি রওনা হল। যাবার সময় যথাসময়ে তার বিয়েতে হাজির থাকতে আমাকে অনুরোধ করে কর্তব্য পালনও করেছিল।

ক'দিন পরে আমাদের স্বনামধন্য টেনিদা এসে হাজির। ছোটবেলা থেকে টেনিদাকে চিনি। টেনিদার বাবা খবরের কাগজ ফেরী করতেন আমাদের শহরে। টেনিদা দশমশ্রেণী থেকে বিদায় নিয়ে সমাজ সেবা করে। মরা পোড়াতে, রুগীর সেবা করতে আর বিড়ি টানতে টানতে আড্ডা জমাতে টেনিদা ছিল অদ্বিতীয়। কারও বাড়িতে কোন ভোজ হলে টেনিদা তার দলবল নিয়ে পরিবেশনে নামত। নিজে কিছু না করলেও হুকুম করে কাজ করাত অনুচরদের। লোকে বলত টেনিদা বড় ঠারুদার, অর্থাৎ কোন কাজ করেনা, লোক দিয়ে করায়। এহেন টেনিদা দশ বার বছর পর হঠাৎ আমার মেসে আসবে তা ভাবতেও পারিনি।

সেই পুরাতন চেহারা, মুখে বিড়ি। ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মেসের চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, এই ঘর তো?

গলার শব্দ চিনি।

মুখ বাড়িয়ে দেখেই বললাম, আরে টেনিদা যে, কি মনে করে?

তোর কাছেই এলাম খবর নিতে। যে হাল-চাল তাতে মনের কথা বলার মত লোক পাইনা। দেশের অবস্থা খুবই ঘোরালো। সেদিন কৃষক সম্মেলন হল পাঁচ মাইলে। হাজার হাজার মিঞা মুন্সী জুটেছিল। আমরাও গিয়েছিলাম। চাষের সমস্যা, চাষীর সমস্যা এসব কিছুই সম্মেলনে আলোচনা হলনা, আলোচনা হল

হিন্দুরা কিভাবে অত্যাচার করে, কিভাবে শোষণ করে, আর বাদশাহের জাত মুসলমানদের বাদশাহী ফিরে পাওয়ার জিগীর। কৃষিমন্ত্রী হবিবুল্লা গিয়েছিল। ঢাকার নবাব হবিবুল্লা, বাংলাদেশের মন্ত্রী। বাংলায় কথা বলেনা। বাঙ্গালী চাষার সমস্যা মেটাতে এসে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তারপর থেকে মিঞাদের সামনে দাঁড়ায় কোন শালা। ওরা যেন হাতে মাথা কাটতে চায়। হালচাল খারাপ বুঝেই এলাম কলকাতায়।

কলকাতায় এলে কি সমস্যা মিটবে ?

তা নয় ভাই। পরের পয়সায় কয়েকদিন কলকাতায় বেড়িয়ে গেলাম। অনিল চক্রবর্তীর লাংসে ফোড়া হয়েছিল তাকে নিয়ে এসেছিলাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করাতে। রথদেখা কলা বেচা করে গেলাম।

অনিল চক্রবর্তী কেমন আছে ?

আর নেই। অপারেশন কেস। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। বেড নেই। অনিলদার মৃত্যুকাল অবধি হাসপাতালের বেড খালি আর হলনা, পরলোকের বেড খালি হতেই অনিলদা বিদায় নিয়েছে। আমরাও কাল ফিরে যাচ্ছি। কাল রাতে তোমার কথা মনে হল। তাই এলাম একবার।

টেনিদার মুখে অনিল চক্রবর্তীর ঘটনা শুনে মনটা দমে গেল।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে টেনিদা বলল, আমরা কি শেষে পাকি হয়ে যাব ?

না। আমরা পাকি হয়ে জন্মাইনি। পাকি হয়ে মরবও না।

মানে ?

মানে অতি সহজ। শহর কলকাতা রক্ষার অজুহাতে কলকাতার বেনে, শেঠ, দেব, মিত্তিররা অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাঁদা তুলেছিল খাল কেটে বর্গীদের হাত থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের বাঁচাতে। এবার বিংশ শতাব্দীতে পকেটকাটিয়া আর জোচ্চোরলালেরা টাকা খরচ করছে

কলকাতাকে পাকির হাত থেকে বাঁচাতে। বুঝলে? এরপর পাকি হতে পারে কি? তোমার আমার ঘর যাবে কিন্তু পাকির ঘরে বিছানা পাততে হবে না। বাংলার মানুষ কোন কালেই নিশ্চিন্ত ছিল না, কোনদিন নিশ্চিন্ত থাকবে না। কলকাতা সৃষ্টি যারা করেছিল তারা ছিল না-পাক পাপী-জোচ্চোর-বদমাসের দল, সেই দল এখনও আছে তাই কলকাতা চিরকাল না-পাক হয়েই থাকবে। অর্থাৎ আমার তোমার আশ্রয় থাকবেই।

টেনিদা কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বলল, তোর কথা যদি সাচ্চা হয় তা হলে মাথা গোঁজার জায়গা পাব।

চা খাইয়ে টেনিদাকে বিদায় করতে চাই। সেই ব্যবস্থা করে কাপড় জামা বদলে নিচ্ছিলাম। টেনিদা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে?

পানুদির কাছে যাব।

সে আবার কে?

নৃপেনকাকার বড় মেয়ে। বসন্তের বড়দিদি।

ওঃ। সেই মেয়েটা! ও তো স্বামীর ঘর ছেড়ে কার গলায় ঝুলে পড়েছিল। এখানে আছে বুঝি? যাই বলিস ননা, কলকাতায় মা কালী আর আর মা গঙ্গার মাহাত্ম্য আছে। পাপী-তাপীকে মা কালী আর মা গঙ্গা উদ্ধার করে, ওরা মোক্ষলাভ করে।

তুমি কি পানুদিকে চেন?

চিনি না। সব কিছুই চেনা যায়। ঘর পালানো মেয়েদের চিনতে হয় না। ওরাই তো আমাদের ঘর ভাঙ্গছে, সংসার ভাঙ্গছে, মুখে চূণকালি দিচ্ছে।

বাধা দিয়ে বললাম, তুমি তো টেনিদা সোস্থাল ওয়ার্ক করতে।

তা করতাম। এখনও করি। ভবিষ্যতেও করব।

যারা সোস্থাল ওয়ার্ক করে তাদের মনের প্রসারতা থাকে এটাই তো জানতাম। তোমার মানসিক কোন দুর্দৈব ঘটেছে।

টেনিদা চটে উঠল। বলল, তা বলে যে নষ্টা তাকে নষ্টা বলব না?

নিশ্চয় বলবে। তবে যে নষ্টা নয় তাকে নষ্টা বললে বড়ই বেদনাদায়ক হয়। তোমার কাছে আরও উদার মনোভাব আশা করি আমরা।

টেনিদা ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেল।

বললাম, সেই পুরাণো মনটা আজও সংযত করতে পারনি টেনিদা। গ্রাম্য রাজনীতি যারা করে তারা যেমন কোন মহৎ চিন্তা করার অবসর পায় না, ছয় ইঞ্চি জমির জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে, সেই মনটা তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে। মানুষের পরিচয়টা যদি কুৎসা দিয়ে চাপা দেওয়া যেত তাহলে পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের মহান কর্মের ও অবদানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারতাম না। হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য সন্তান আমরা তাই তোমার মন্তব্য শুনেও আমাদের গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে না।

টেনিদা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই আমি চাবি হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম।

টেনিদা ইঙ্গিতটা বুঝে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এরাই সত্যদার উপযুক্ত শিষ্য। এরা লজ্জাহীন, বিবেক নামক বস্তুটি এদের মৃত। টেনিদার মনের কথা শোনা হল না।

দরজায় তালা বন্ধ করছি এমন সময় টেনিদা বলল, তুই বাড়ি যাবি না?

এ সময়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়েছি সেই কবে, আজ আর বাড়ির ওপর আকর্ষণ নেই টেনিদা।

তোর প্রাণের বন্ধু বসন্তলালের বিয়ে। তুই নিশ্চয়ই যাবি।

ছুটি পেলে যেতে পারি।

যদি যাস তা হলে এক সঙ্গেই যাব।

বললাম, আচ্ছা।

টেনিদাকে বিদায় দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে আবার ফিরে এলাম মেসে। দিল্লির রাজনীতির উত্তাপ পথে ঘাটে। বুঝতে খুব কষ্ট হয়না কারোই যে আগামী দিনের জন্য আকাশে মেঘ জমছে। সেই মেঘ কতটা প্রলয়ঙ্কর তা কারো জানা নেই।

দিনের পর দিন কাটে।

বিয়ের পর বসন্তলাল ফিরে এসেছে একাই। আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমিও যাইনি। যাবার প্রয়োজনও হয়নি।

বেশ বৃষ্টি নেমেছে। রবিবারে ইচ্ছা ছিল একবার চুয়াডাঙ্গা যাব মজলিস আলির কাছে। আমরা একসঙ্গে আইন কলেজে পড়েছি। মজলিস চুয়াডাঙ্গায় প্র্যাকটিশ করে। বয়স তরুণ হলেও ইতিমধ্যে পসার জমিয়ে নিয়েছে। মুন্সীগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে তিন-মাইল হাঁটলে মজলিসের আদি বাড়ি। মজলিসের বাবা ছোট চাষী। মজলিসকে কোন রকমে পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছে। কখনও জমি বন্ধক দিয়ে কখনও ঘটি-বাটি বিক্রি করে। মজলিস তার বাবাকে বলত, তোমার ক্ষয়ক্ষতি আমি পূরণ করে দেব বাপ্‌জান।

মজলিস আমাকে ভুলতে পারেনি।

মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে বসে গল্প করতাম। মজলিস কখনও কোন রাজনৈতিক হাঙ্গামায় যেত না, সে বেশী আগ্রহী ছিল তার মুসলমান সমাজের অনাচার রোধ করতে। আমাকে বলত, তোদের পাপ ধীরে ধীরে আমাদের সমাজেও প্রবেশ করছে।

জানতে চাইতাম, কি রকম?

মুসলমান সমাজে পণ প্রথা ছিল না। বরং মেয়েদের ভবিষ্যত তৈরী করতে মোহরের ব্যবস্থা রয়েছে। আজকাল মোহরাণাটা হল একটা স্বীকৃতি মাত্র। বাপের অর্থ না থাকলে ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই যায় না।

বললাম, এই সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টির মূলে আছে শ্রেণীবৈষম্য। আমরা এমন ঘরে মেয়েদের বিয়ে দিতে চাই যেখানে মেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্যে

থাকবে। যাদের অর্থ আছে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য আছে। অর্থবান তোমার মেয়েকে ঘরে আনবে, তার ভরণ পোষণের জন্য অগ্রিম উশুল করছে।

তা হলে ভালবাসা মন্দবাসা সব ছেঁদো কথা।

তাইতো মনে হয়। ভালবাসা যেন তামাসা।

আমরা একটা আদর্শ স্থাপন করতে চাই। তোদের সমাজে তুই আঘাত করবি, আমার সমাজে আমি আঘাত করব। বুনিয়াদ নড়িয়ে দেব।

এখন তাই মনে হচ্ছে। শেষ রক্ষা হয় না রে। শরৎচন্দ্রের দত্তা পড়েছিস। ন্যাড়া বটগাছ তলায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তিন বন্ধুতে তা কি বাস্তবায়িত হয়েছিল? ছোটবেলায় ওসব সমাজ সংস্কারের শুভ ইচ্ছা বড়বেলায় আর থাকে না।

মজলিস আলি দেশে গিয়ে প্র্যাকটিশ করার পরও মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি দিয়েছে।

আমাকে তার বাড়িতে যেতেও বলেছে। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কলকাতার কাছেই অথচ সময় পাই না চুয়াডাঙ্গা যেতে। আজ আবার বৃষ্টি। আগস্ট মাসে কি হয় কি হয় চিন্তা। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে যাব মনে করেছিলাম। যদিও বৃষ্টি হচ্ছে তবুও শেয়ালদ যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

দরজার শব্দ পরতেই ফিরে তাকালাম।

আরে পানুদিদি, এই জলে ঝড়ে ভিজতে ভিজতে কেন এলে? ডাকলেই যেতাম। খবর দিতে তো পারতে। তিন পয়সার একটা পোষ্টকার্ড ফেললেই সকালের চিঠি বিকেলে পেতাম।

তোকে ডাকতে এসেছি।

কোথাও যেতে হবে বুঝি?

আমার বাসায়। চল দেরী করিস না। বাজার করতে

পাঠিয়েছি ক্ষুদেকে। গিয়ে দেখব রান্না শেষ, খাবার প্রস্তুত। চল। অনেক কথা আছে। মেসে বসে সে সব কথা বলা যায়না।

হেসে বললাম, খিদিরপুর ডকে জাপানীরা বোমা ফেলেছিল, মনে আছে?

খুব মনে আছে।

আমি জামা গায়ে গলিয়ে দিতে দিতে বললাম, সেদিন যেমন তাড়াহুড়ো দেখেছি। সেই রকম তাড়াহুড়ো করছ তুমি।

পানুদিদি হেসে বলল, বুঝেছি। এখন চল, জলদি।

গেলাম পানুদিদির বাসায়।

আমাকে বসিয়ে পানুদিদি বলল, কি খাবি?

যা দেবে, দাতার ইচ্ছা।

যা রান্না হয়েছে তা ক্ষুদের ইচ্ছায়। তুই যদি কিছু খেতে চাস সেটা হবে তোর ইচ্ছায় এবং আমার চেষ্টায়। বুঝলি।

বুঝেছি। ভাত আর মাংসের ঝোল সব চেয়ে উপাদেয় হবে। বসন্তলাল এসেছে পানুদি।

তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

না। বসন্তলাল দেখা করেনি, আমিও দেখা করতে যাইনি, শুনলাম সে একাই এসেছে।

পানুদিদি কোন কথা না বলে রান্নাঘরের দিকে গেল।

আমি বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চোখ বুঁজে আকাশ পাতাল কি যে ভাবছিলাম তা আর মনে নেই। পানুদিদির ডাক শুনে তাকালাম।

চায়ের কাপ সামনে রেখে বলল, তোর বুঝি ঘুম পেয়েছে?

না পানুদি, ভাবছিলাম তোমার কথা।

আমি কি চিন্তা ভাবনার রাজ্যের কেউ? আমাকে নিয়ে কিসের ভাবনা?

ভাবছিলাম, নৃপেনকাকা বসন্তলালের বিয়েতে তোমাকে যেতে বলেনি কেন !

এতে নতুনত্ব কিছু নেই রে। বাবা-মা আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছেন অনেককাল আগেই। জনসমক্ষে আমার অস্তিত্বটা স্বীকার করতে পারছেন না। বসন্তের বিয়েতে যে গ্রেট্ বারগেন্, এটা আমার অস্তিত্ব স্বীকার করলে হাতছাড়া হবার আশঙ্কা ছিল তাতো বুঝিস। ওসব চিন্তা করে নিজেকে কেন কষ্ট দিস।

না কষ্ট নয়। ক্ষোভ। বিয়ে করাটা মানুষের জীবনে এমন কিছু বিরাট ঘটনা নয়। পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই নারী-পুরুষ পরস্পরের সাহচর্য চেয়েছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক কিছুটা রূপ পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই টুকুই যা পার্থক্য। সাহচর্যকে মর্যাদা দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই অথচ তাকে চুলচেরা বিচার করতে আমরা সবার আগে হাঁটি। বসন্ত বিয়ে করবে, নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই গোপনীয়তা কেন ? আমার মনে হয় তোমাকে দৃষ্টির বাইরে রাখার জন্যই এই চেষ্টা। যাক্। তবুও বসন্তলালের লজ্জাবোধটা আছে। এটাই আমাদের সৌভাগ্য।

পানুদিদি হাসতে হাসতে বলল, সেদিন বলেছিলাম, আজও বলছি, মাই ফাদার উইল লুজ হিজ সন্ এ্যাজ্ ওয়েল এ্যাজ পিস্ অব্ হিজ ফ্যামিলি। ব্যক্তি স্বার্থ বড় ভয়ঙ্কর এবং সংক্রামক। যে রোগ বাবার রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে সেই রোগ হয়ত দেখা দেবে বসন্তের প্রতিটি রক্ত কণিকায়। টাকার নেশা বড় নেশা। যে নেশায় পরিতৃপ্তি আসে না সে নেশা হল টাকার নেশা আর যৌন বিলাসের নেশা। যাদের টাকার রোগ আছে তাদের মানবতাবোধও হয় পঙ্গু।

বললাম, এখানে ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাত কি সম্ভব ?

এসব ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক। যদি এর বিপরীত কিছু ঘটে সেটাই হবে অস্বাভাবিক। বাবার কথা ভাবিনা রে ননা। ভাবি মায়ের কথা। বড়ই কষ্ট করেছেন আমাদের গর্ভধারিণী। যদি

কোন দিন এদিক-ওদিক হয় তাহলে খুবই ব্যথা পাবেন, সেই অবস্থা কখনও যদি দেখা দেয় তাহলে আমার পক্ষেও বেশ ব্যথার কারণ হবে। তুই বস। আমি নিজের হাতে তোকে রান্না করে খাওয়াব। বলতে বলতে পানুদিদি উঠে গেল।

আমি চায়ের কাপটা নীচে নামিয়ে রেখে আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বালিশটা টানতে গিয়ে একটা খাতা পেলাম।

খুলতেই দেখি তাতে লেখা আছে ডায়েরী। পাতা উল্টাতে উল্টাতে বুঝতে পারলাম দৈনন্দিন ডায়েরী নয়, বরং আত্মকথা। প্রথমে ইতস্তত করছিলাম অবশেষে চুরির মন তৈরী করে পড়তে আরম্ভ করলাম। তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম।

পানুদিদি কখন যে ফিরে এসেছে টেরও পাইনি।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি হয় ননা?

হেসে বললাম, চুরি করা হয়। আমি চুরি করেছি, অন্যায় করিনি। সব চুরি তো অন্যায় নয়।

পানুদিদি সঙ্গে সঙ্গে বলল, যেমন মন চুরি।

অত দূর এখনও পৌঁছতে পারিনি। সবটা পড়তে দেবে?

না। লেখা যেদিন শেষ হবে সেদিন তোকেই দিয়ে যাব। উইল করে দেব, বুঝলি। এখন এটা পড়লে তোর মনে নানা প্রশ্ন জাগবে। একটা কথা বলছি শুনে রাখ। কোন দিন কোন মেয়ের ওয়ালেটে হাত দিসনা, তাদের ডায়েরী পড়িসনা।

আমি কোন কথা না বলে হাসতে লাগলাম।

তবে গল্প শোন। এক ভদ্রলোক আর-এম-এস-এর সর্টারের কাজ করতেন। সর্টিং-এর সময় যদি কোন মুখ আঁটা চিঠিকে মনে হত প্রেমপত্র তাহলে তা খুলে পড়তেন। পড়া শেষ করে আবার খাম এঁটে দিতেন। একদিন একখানা চিঠি খুলেই মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল। তার স্ত্রী প্রেমিককে লিখেছে কোন কোন তারিখে

তার স্বামী বাইরে থাকবে এবং সেই সেই দিনে তাকে আসার অনুরোধ জানিয়েছে। এবার বুঝতে পারলি ?

পানুদিদিও হাসতে থাকে আমিও হাসতে থাকি।

তোমার উপদেশ চিরকাল মনে থাকবে।

আরেকটা গল্প শোন। বাপের বাড়ি গেছে বউ। স্বামী তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বউকে বার বার তাগাদা দিচ্ছে কবে তাকে আনতে যাবে তার তারিখ ঠিক করতে। বউ বার বার বলছে আগামী মাসে। অবশেষে বিরক্তি নিয়ে ভদ্রলোক গেলেন বউ আনতে। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছুলেন। আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল। আদর-যত্নের ত্রুটি হয়নি। রাতের বেলায় খেয়ে দেয়ে বিছানায় বসল। স্ত্রীর খাওয়া তখনও হয়নি। স্ত্রীর হাত ব্যাগটা দেওয়ালে ঝুলছিল। অকারণেই ব্যাগটা খুলল। ব্যাগের ভেতর ছিল মূল্যবান একটা নেকলেসের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট। লেখা আছে, তোমায় তো আর ফিরে পাব না, আমাকে স্মরণ রাখতে সামান্য এই উপহার। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ব্যাগ বন্ধ করে রাখল। সে রাতে কোন কথাই বলল না। পরের দিন স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেদিনও কোন কথা বলল না। তৃতীয় দিনে তার স্ত্রীর গলায় নতুন নেকলেস দেখে জিজ্ঞেস করল, এটা কে দিল ? স্ত্রী খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, এবার বাবা আমাকে গড়িয়ে দিয়েছে।

আবার পানুদিদি হাসতে থাকে। আমিও হাসতে থাকি।

বললাম, তোমার উপদেশ শিরোধার্য।

গত দুর্ভিক্ষের সময় কোথায় ছিলি ?

কলকাতায় ছিলাম।

সব দেখেছিস নিশ্চয় ?

সব কি দেখা যায়। কিছু দেখেছি, বেশিটা শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি।

সন্তানের হাত থেকে খাবার কেড়ে খেতে দেখেছিস কোন মাকে ?

দেখিনি। শুনেছি।

কেন করে তা জানিস?

জানি। মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। বাঁচার তাগিদে মা সন্তানকেও বঞ্চনা করে। মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এটাইতো জাগতিক নিয়ম।

যারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম তারা এই দুর্ভিক্ষকে নিশ্চয়ই মেনে নিত না। বাঁচার চেয়ে মৃত্যুকে যারা সত্য বলে জানতে শেখে তারা সন্তানের হাত থেকে খাবার কেড়ে খায়না। তারা খাবার কেড়ে খায় যাদের ঘরে খাবার আছে তাদের কাছ থেকে। মৃত্যু ভয়হীন এমন একটা জাতি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে আমাদের উত্তর পুরুষদের বাঁচিয়ে রাখতে। আমাদের দাবী পূরণ চাই অথচ তার জন্য আমরা সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারিনা। মরণকে সত্য জেনেও মৃত্যুকে এড়িয়ে যারা যেতে চায় তারা বাঁচতে পারেনা। এটাই হল বাস্তবের অমোঘ নির্দেশ।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, এটা কল্পনা বিলাস।

আর ভাবতে হবে না। আজকের খবরের কাগজগুলো দেখতে থাক, আমি রান্নাটা শেষ করে আসি।

খেতে খেতে অনেক বেলা হয়ে গেল। পশ্চিম দিকের জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অনন্ত আকাশ কালো মেঘে ভর্তি। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। পেছন থেকে পানুদিদি এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, কি দেখছিস ননা?

কি আর দেখব। সূর্যাস্ত হতে অনেক দেরী। আগষ্ট মাসের দিন সহজে পেরোতে চায় না।

দুঃখের রাত্রি পোহায় না, দিন তো পোহায়।

আচ্ছা পানুদি, আজ হঠাৎ তোমার আত্মপ্রেমের কথা মনে পড়ল কেন?

আত্মপ্রেম মুক্ত যারা তারা বিপ্লব ঘটাতে পারে। আত্মপ্রেমিক

মানুষ দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরলেও দুর্বল আঙ্গুল তুলে প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায় না। তারা জানে, মৃত্যু তাকেই তাড়া করছে। তবুও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে না। আত্মপ্রেম হল মানবের সহজাত ধর্ম। আমি পুরুষের সঙ্গ চাই কেন? সেই আত্মপ্রেম। আমার যৌন বিলাসকে পরিতৃপ্ত করতে চাই। ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ-করুণা এসব পরবর্তী ডেভাল্যাপ্‌মেণ্ট। আসল এবং মোক্ষম ধর্ম হল আমার আত্মপ্রেম। আমার পক্ষে তোর পক্ষে এই শাশ্বতধর্ম পালন হল চিরাচরিত এবং অনিবার্য। যারা ব্যতিক্রম তারাই তো বিপ্লবী।

তোমার কথা স্বীকার করছি। তবুও মানব জীবনে কিছু আদর্শ তো থাকে।

থাকে, তার জন্য মূল্য দিতে হয় যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সেই গান্ধারীর আবেদন পড়েছিস? গান্ধারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন, কেন পরিত্যাগ করব? গান্ধারী বললেন, ধর্ম রক্ষা করতে। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন, কি দিবে তোমারে ধর্ম? গান্ধারী বললেন, দুঃখ নব নব। শোন্ ননা। নব নব দুঃখ সহ্য করার মত যাদের মানসিক গঠন থাকে তারা আত্মসুখের জন্য আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারে না। এরাই পারে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মহৎ কাজে আত্মদান করতে। আমরা যে শ্রেণীর প্রতিনিধি সে শ্রেণীতে এই মানসিকতা গড়ে ওঠে না বলেই আমরা জোয়ারের জলে ভাসতে থাকি। যে ঘাটে নৌকা বাঁধলে আমাদের স্বার্থ পূর্ণ হয় সেই ঘাটে নৌকা বাঁধি; তখন আর আদর্শের বালাই থাকে না।

আমি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

পানুদিদি বলল, বসন্তলালের কথায় এত কথা বললাম। মনে রাখিস, 'এ' কোন কালেই 'বি' হয় না। আমি চিরকাল আমি, তুই চিরকাল তুই। পার্থক্য থাকবেই। তবে য়্যাডজাস্টমেণ্টটা

মেনে নিতে হয় বলেই অনেক সময় 'এ' আর 'বি'র মাঝে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

আমি আজকের মত ছুটি চাই পানুদি।

অবশ্যই। তোর তো অনেকটা যেতে হবে। তুই যেখানে থাকিস সেটা আমার পছন্দ নয়। বাতাসে পাপের গন্ধ, আলোতে মেঘের ঢাকনা, তুই বাপু এদিকে কোথাও চলে আয়।

আমিও ভাবছি সেই কথা। রং বদল হচ্ছে চারিদিকে। যুদ্ধ ফেরতা মানুষরা বেকার। তারা ভীড় করছে দরজায় দরজায়। আর্থিক ক্ষেত্রে যে অরাজকতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা সমাজদেহে পচন সৃষ্টি করবে। এই সময় আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

মহাকরণ এলাকায় এবং বড়বাজার এলাকায় উত্তেজনা বেশি। বাংলাদেশকে হাতছাড়া করতে রাজি নয় কোন সম্প্রদায়েরই পুঁজিপতিরা। বড় বড় কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের ভীষণ বিপদ সামনে। এমন কামধেনু হারাবার ভয়ে সবাই ভীত।

আগের রবিবারে হাজির হলাম মৌলালীর মোড়ে।

সেখানে সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ইংরেজ যদি সত্যই চলে যায় আর বাংলাদেশটা পাকিস্তান হয় তা হলে যারা এতদিন অনিচ্ছাতেও জেল-জুলুম সহ্য করেছে তাদের কি অবস্থা হবে! আমি খুঁজে বের করলাম সত্য সরকারকে। আইন সভার সদস্যদের নির্দিষ্ট কামরায় সত্য সরকার তখন সবার সঙ্গে বেশ গুরুতর আলোচনায় মত্ত। আমাকে দেখেই সাদরে ডাকল, এস হে এস।

আমি এগিয়ে গিয়ে সত্য সরকারের পাশে সতরঞ্চের ওপর বসলাম।

কি মনে করে?

এমন কিছু নয়। আবহাওয়াতে অশান্তির গন্ধ পাচ্ছি। তাই জানতে এলাম।

জানার আর কিছু নেই। আমাদের কিরণদা, মানে কিরণশঙ্কর রায় বলছেন, ইংরেজ শেষ পর্যন্ত এদেশ ছেড়ে যাবে না। পাকিস্তানের দাবী কেউই মানবে না। এর ফলে ইংরেজ আরও শক্ত হয়ে বসবে। উনি ব্যারিষ্টার লোক। বিলেতে বহুকাল ছিলেন, ইংরেজ চরিত্র উনি ভাল বোঝেন। হয়ত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিতে পারে।

বললাম, তোমার কিরণদা ঠিকই বলেছেন। তবে গণেশ উল্টে গেলে আমরা আশ্চর্য হব না। কিরণদা জমিদার লোক। জমিদারী মেজাজটা তো আছে। অনেক শোষণ করে প্রজাদের জন্য কখনও কখনও হয়ত একটা পুকুর কেটে দেন অথবা একটা পাঠশালার পণ্ডিত মশায়কে সাড়ে তিনটাকা বেতন দেন, সেই চিন্তাটাই কিরণদার মনে আছে। সেই মানসিকতা নিয়ে উনি ভাবছেন।

তুমি বলতে চাও ইংরেজ ঠিকই যাবে।

বললাম, আলবৎ যাবে। তবে আমাদের সর্বনাশ করে যাবে। তুমি আর তোমার কিরণদা যা যা ভাবছ তা হবে না। কিরণদা আর কিরণদার মত বিলেত ফেরত যারা তারা আলাদা জগতের লোক। রাজনীতির ক্ষেত্রে ওরা এখনও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার বাইরে যেতে পারেন নি। এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমরা ওদের নেতা বলে স্বীকার করি। আইন সভার সদস্য হওয়া আর দেশের মানুষের মঙ্গল করা এক কথা নয়। ইংরেজের পঁয়ত্রিশ সালের ভারত আইনে গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই। শতকরা চোদ্দজনের ভোট দেবার অধিকার রয়েছে এই আইনে। তার অর্ধেক জনও তো ভোটই দেয়নি। এই শতকরা সাতজন লোকের ভোটে আইন সভার সদস্য হয়ে যারা নিজেদের জনতার প্রতিনিধি মনে করে তাদের কাছে এব চেয়ে বেশি আশা করা নিরর্থক। এই যে সাতজন ভোটার তাদের সর্বাংশই

কায়েমী স্বার্থের বাহক। তাই জমিদারী মন দিয়ে ওরা বিচার করে, সাধারণ মানুষের মন নিয়ে বিচার করে না।

আমার কথায় সত্য সরকার উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করল কয়েক জন সুবেশা তরুণী। সত্য সরকার সার্কাসের ক্লাউনের মত অঙ্গভঙ্গী করে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, এই যে রমা, কবে এলে? খবর ভাল তো? তোমাকে এখানে আশা করি নি। উনি কে? তোমার মামাতো বোন। উনি কে? তোমার বোনের সহপাঠিনী। ভালই। বস বস।

কাল এসেছি, পাক্‌পাড়ায় আছি।

সত্য সরকার এক গাল হেসে বলল, আবার পাক্। আরে বাপু তোমার ঐ শব্দটা পরিত্যাগ কর। একে নেড়েদের জ্বালায় 'পাক্' শেলের মত বুকে বিঁধছে তার ওপর তোমাদের মুখে 'পাক্' শব্দ শুনলে ভিড়মি খেতে হবে। তা খবর বল।

দেশ থেকে চলে এলাম সত্যদা। ক'দিন থাকব এখানে। দেশে খুবই উত্তেজনা।

তোমরা হলে মহান নেতা হরদয়াল নাগের দেশের লোক। রাম নাম করলে ভূত পালায়। শুনেছি হরদয়ালবাবুর নাম শুনলে পাকিস্তান কাঁচিস্তানে পরিণত হয়; বুঝলে। ওসব উত্তেজনায় কোন অর্থ নেই। পাকিস্তান নেড়েদের মাতাল করেছে। মাতলামি কমবে শীগ্‌গীরই।

তুমি ঠাট্টা করছ সত্যদা। নতুন বাজার আর পুরাণোবাজারে রোজ মিছিল বের হচ্ছে। ওদের শ্লোগান শুনলে তোমরাও ভীত হবে। দলে দলে মুসলমান জওয়ান ছেলেরা লাঠি তরোয়াল নিয়ে মিছিল করছে। হিন্দুঘরের মেয়েরা তো দূরের কথা ছেলেরাও বাইরে বিশেষ বের হচ্ছে না। দাড়ি-টুপি-লুঙ্গির ঢেরি নেমে গেছে। ওদের যত রাগ ও বিরাগ হিন্দুদের ওপর। ইংরেজ ওদের দোস্ত। বাবা

বললেন, বয়স্ক মেয়েদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই কলকাতায় এলাম, ষোল আগষ্ট না কাটলে ঘরে ফিরছিনা।

তোমাদের ওখানেও যে অবস্থা কলকাতাতেও সেই অবস্থা।

বলা শেষ করে সত্য সরকার হাসল।

তার ম্লান হাসিটা কারও নজর এড়াল না।

তবে পাকিস্তান হবে না। আমরা অখণ্ড ভারত চেয়েছি, আমরা বাধা দেবই। তবে মুসলমানরা একটু বেশি কনশেসন আদায় করবে। মুসলমানরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকবে। ইংরেজের খয়ের খাঁ হয়ে কোন লাভ হবে না।

এতক্ষণ সত্য সরকারের কথা শুনছিলাম। এবার বাধা দিয়ে বললাম, যদি অপরাধ না নাও তা হলে একটা কথা বলব সত্যদা।

সত্য সরকার মুখ ঘুরিয়ে বলল, বল।

তোমরা কিরণদার মত লোকের উপদেশ হজম করতে না পেরে বদ ঢেকুর তুলছ। রাজনীতির টেমপারেচারটা বুঝতে তোমরা যেন ভুল করছ। মুসলমানরা পাকিস্তানের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবেই। কল্পনারাজ্যে বাস করে আত্ম-প্রতারণা করনা সত্যদা, যা খাঁটি তাকে স্বীকার করে নিতে চেষ্টা কর।

রমা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি আপনার সঙ্গে একমত।

সত্য সরকার বলল, ওহো! তোমাদের পরিচয় করে দেওয়া হয়নি। এই হল ননা, আমাদের দেশের ছেলে। এম-এ, বি-এল পাশ করেছে। এখন চাকরি করে। আমার অতি প্রিয় বিপ্লবী বন্ধু। এই হল রমা নন্দী। আমাদের চাঁদপুর শাখার কর্মী। সমাজসেবী, আমার রাজদ্বারের বন্ধু অনিল নন্দীর বোন। বরিশাল থেকে বি-এ পাশ করেছে।

বললাম, শ্রীমতী রমার মঙ্গল হোক। আমি কিন্তু কোন কালেই বিপ্লবী ছিলাম না। এমন সৌভাগ্য সেদিন হবে সেদিন আমার

পরিচয় করিয়ে দেবার লোক দরকার হবে না। পরিচয় বাতাসে বাতাসে মানুষের কানে পৌঁছবে। সত্যদা আমাকে একটু বেশি ভালবাসেন তাই গৌরব মুকুট পড়িয়ে দিলেন, হয়ত ব্যঙ্গ করতে।

রমা আমাকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। আজ আর কথা বলার সময় নেই।

বললাম, বাকিটুকু ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকল।

আপনাকে মনে থাকবে। মনে করব একজন বন্ধু পেয়েছি।

হেসে বললাম, এতে সামান্য অসুবিধা দেখা দেবে। আপনি স্বদেশী করেন, আমার বাবা স্বদেশীওলাদের কাছ থেকে সন্তানদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতেন। তিনি বলতেন, স্বদেশী করা তাদেরই সাজে যাদের অনেক আছে। আরও বলতেন, পুলিশ হাকিম আর স্বদেশীওলারা কখনও বন্ধু হয় না। আমার পরলোকগত পিতৃদেবের এই অমূল্য উপদেশ আজও বেদবাক্য মনে করি। আজ চলি সত্যদা, নমস্কার শ্রীমতী বান্ধবী।

রমাও তার সঙ্গিনীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আমি ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রমাও সঙ্গিনীসহ ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়াল।

রমাই জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকেন?

কাছেই, মির্জাপুরে।

চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। আমরা ডালিয়ার দোকানে যাব। কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত এক সঙ্গেই যাব।

আমি শুধু 'আচ্ছা' বলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ট্রামে সবাই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট অবধি একসঙ্গে এলাম। রাস্তায় বিশেষ কোন কথা-বার্তা হয়নি। নামবার সময় নমস্কার জানিয়ে বললাম, এ-পাড়ায় এলে আসবেন। অবশ্য সকালে অথবা বিকেলে অথবা ছুটির দিনে।

নেমতন্নটা না ভেবেই করেছিলাম। একটা ফরমালিটি মাত্র।

আমি কি জানতাম পুরুষদের মেসে রমা আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তা হলে নেমতন্নটা করতামই না।

আজ ষোলই আগস্ট। হরতাল, সরকারী অফিস ছুটি। অন্যান্য অফিসের অবস্থাও তেড়েনেনে। সকাল বেলায় স্নান করেছি তখনও মনে স্থির করিনি চাকুরি স্থলে যাব কিনা। এমন সময় মেসের চাকর নিতাই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, চারিদিকে গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। লীগের লোকেরা জোর করে হিন্দুদের দোকান বন্ধ করতে চেষ্টা করছে, তাতেই মানিকতলায় গোলমাল আরম্ভ হয়েছে। রাজাবাজারে হিন্দুর দোকান লুট হয়েছে। খুন জখমও হচ্ছে।

খবর শুনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

গন্তব্যস্থান কিছু নেই। কেবলমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। গুজব শোনা উচিত নয়। সত্য সংবাদ সংগ্রহ মূখ্য উদ্দেশ্য।

এমন সময় ট্যাক্সি থেকে নামল রমা একা।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মনে করে?

আমাদের ওপাড়ায় আবহাওয়া মোটেই স্থবিধে মনে হচ্ছে না। ভাবলাম, ওটাও নিরাপদ এলাকা নয়। কি হয় তা দূর থেকে দেখাই ভাল। মামা সপরিবারে সিঁথিতে চলে গেছেন সকালে। আমিও বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে আপনার এখানে এলাম। মামার সঙ্গেই যাব ভেবেছিলাম, শেষে হিন্দুপাড়ার সন্ধান করতে করতে আপনার কাছে এলাম।

চলুন ঘরে গিয়ে বসি। অবস্থা বেশ ঘোরালো। চারিদিকে থমথমে ভাব, বেশ চাপা উত্তেজনা।

আমার কামরায় বসতে দিয়ে বললাম, বিশ্রাম করুন। চা আনাই, খাবার ব্যবস্থা করি।

চায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন! খাবার ব্যবস্থা দরকার হবে না। বাড়ি গিয়েই খেতে পাব।

আশা কম। বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা সন্দেহ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে ডাক শোনা গেছে তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়েছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নয়। এটাই ভারতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় ট্রাজিডি। আমরা ট্রাজিডির শিকার।

এর দায়িত্ব কি আমরা এড়াতে পারি?

না পারি না। আমার দূর সম্পর্কের একজন মামা থাকতেন অজগ্রামে। মাঝে মাঝেই যেতাম তাঁর বাড়িতে। মাঝে মাঝে থেকেও যেতাম। সেখানে গোটা গ্রামে মামাদের তিন শরীক ছিলেন হিন্দু, বাকি সবাই মুসলমান। মামাদের একটা পুকুর ছিল। গ্রামের মেয়েরা বিকেল বেলায় পুকুরে আসত স্নান করে কলসী ভর্তি জল নিতে। এইসব মেয়েদের পরণে থাকত অতি ময়লা কাপড়। একদিন মামাকে বললাম, এরা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিও জানে না। এদের বাঁচাটাই আশ্চর্য।

মামা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা বলত, বিকেল বেলায় এরা স্নান করতে আসে কেন?

বললাম, আমাদের ঘরের অনেক মেয়েই তো বিকেলে গা ধোয়।

তা নয় ভাগ্নেরাম। এদের পড়বার দুখানা শাড়ী নেই। বিকেল বেলায় স্নান করে গামছা পড়বে। কাপড়খানা শুকোতে দেবে। রাতের বেলায় গ্রামের শতকরা পাঁচটা ঘরের আলো জ্বলে না। অন্ধকারে ওরা গামছা পড়েই রাত কাটাবে। আবার সকাল হলে শাড়ীখানা পড়বে।

আমি চমকে উঠেছিলাম তার কথা কথা শুনে। আর কি বলেছিলেন, শুনবেন?

রমা মৃদু হেসে বলল, বলুন।

মামা আমাকে বললেন, শোন বাবা; এরা অতি দরিদ্র। কাপড় কাচার জন্য সোডা-সাবান দরকার। বহু কষ্টে একখানা শাড়ী

হয়ত সংগ্রহ করেছে পুরুষ অভিভাবকরা কিন্তু তাকে পরিষ্কার করার জন্য সোডা-সাবান কেনার তাদের পয়সা নেই। রাতের বেলায় যারা গামছা পরে অথবা পুরুষদের ছেঁড়া লুঙ্গি গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে তাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় কি? এই মেয়েদের আমাদের ঘরে নিয়ে এসে সায়া-সেমিজ-শাড়ী পরিয়ে দাও, সাজগোজ করাও, দেখবে এদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের কোন পার্থক্য নেই। পয়সা যাদের নেই তাদের দুঃখ তুমি বুঝবে না।

এরা বিয়ে করে কেন? জানেন মামা, ইংরেজরা বলে ইভন্ বেগারস্ ইন্ ইণ্ডিয়া ম্যারি।

আমি তো বাবা ইংরেজদের দেশে যাইনি কখনও। ওদের দেশে ভিখারী হয়ত নেই। যদি কেউ থাকে সে ভিখারী বিয়ে করে কিনা তাও জানিনা। তবে বাবা, যখন তুমি বড় হবে তখন বুঝবে বিয়ে করাটা অর্থের মানদণ্ডে স্থির হয় না। বিয়েটা মানুষের জীবনে অনিবার্য প্রয়োজন। যারা বিয়ে করেনা তাদের মানসিক কোন ব্যাধি আছে অথবা দৈহিক কোন ব্যাধি আছে অথবা তারা মিথ্যাচারী লম্পট। জীব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই নারী-পুরুষ ঘর বেঁধেছে ও বাঁধবে, এর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না।

আপনার মামা বুঝি কম্যুনিষ্ট? জিজ্ঞেস করল রমা।

এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। তবে মামা বলতেন, এদের আমরা ঠকিয়ে আসছি। আমরা বুদ্ধিজীবি, আমরা সমাজের সব রকম সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে জানি ও নিয়েছি। ওরা যেদিন বুঝবে সেদিন তোলপাড় শুরু হবে। বঞ্চিত মানুষ ক্ষিপ্ত হলে প্রলয় হতে পারে, যুক্তি-বুদ্ধির বেড়াজালে ওদের আটকে রাখা যাবে না।

বললাম, ওরা কি বুঝবে?

ওদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝবে। যারা বুঝবে তারা ধাক্কা দেবে আমাদের। সেদিন আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে। ওদের

নায্য দাবীকে আমরা এতকাল অস্বীকার করে এসেছি। সেই দাবী আদায় করতে ওরা হেন অপকার্য নেই যা করবে না।

বললাম, এটা আপনার এক তরফা কথা। হিন্দুদের মধ্যেও তো এদের মত দরিদ্র আছে।

তারাও চুপ করে থাকবে না সাপ্।

মামা আরও অনেক কিছু বলতেন। তার কথায় ও কাজে মানুষের প্রতি কেমন একটা মানবীয় অনুভূতির ধ্বনি ফুটে উঠত। আপনি যদি তাতে মনে করেন, মামা কম্যুনিষ্ট, তাতে আমার বলার কিছু নেই। তবে কম্যুনিষ্ট বললে আপনারা যা বোঝেন মামা তা নন। বলা যায় একজন হৃদয়বান ব্যক্তি। অনুভব করেন অথচ ত্যাগ স্বীকার করেন না বলেই তখন মনে হয়েছে। আপনি বসুন, আমি আপনার স্নানের ব্যবস্থা করি।

কেন? আমি মামার বাসায় ফিরবার আশা করি।

বর্তমানে কোন আশা নেই। যখন আশাপূর্ণ হবার মত অবস্থা হবে তখন আপনাকে নিশ্চয়ই অনুরোধ করব না।

রমাকে বসিয়ে আমি নীচে গেলাম। ফিরে এসে দেখি রমা আমার অগোছালো ঘরটা গুছিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়েছে।

বললাম, একি হচ্ছে?

সেই নোংরা মুসলমান মেয়েদের সাজিয়ে-গুজিয়ে নিলে যেমন সুন্দর হয় আপনার ঘরখানা সাজালে গোছালে তেমন হয় কিনা তাই পরীক্ষা করছি।

অবশ্য। তবে অনধিকার বলে একটা শব্দ নিশ্চয়ই অভিধানে দেখেছেন?

অবশ্য আমি দুঃখিত।

হেসে বললাম, ভাল কথা। এখানে আপনার অসুবিধা হবে। আপনার যোগ্যস্থানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। আমার একজন পাতানো দিদি বা বন্ধু আছে, আমাকে খুব ভালবাসেন। তার কাছে

আপনাকে নিয়ে যাব। হাঙ্গামা এখনও ছড়ায় নি। এখনও তার বাড়িতে যাওয়া যাবে। যদি হাঙ্গামা না ছড়ায় তা হলে আপনার আস্তানায় ফিরে যাবেন, আর যদি ছড়ায় তা হলে সেখানে নিরাপদে বাস করতে পারবেন। রাজি ?

রমা চুপ করে ভাবছিল।

বললাম, আচ্ছা চলুন। নীচের অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আমার মনে হচ্ছে কোন রকমে সেখানে যাওয়াটাই যাবে, ফিরে আসা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

রমা বলল, সেটা আমার ভাগ্য।

হেসে বললাম, ভাগ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। বড়ই প্রতারক আমাদের ভাগ্য। সেই জন্যই যোগাযোগ ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। ভুল করলে দণ্ড পেতে হয়।

বহু কষ্টে একটা ট্যাকসি পেলাম।

তখনও হাঙ্গামা ততটা ছড়ায় নি। তবুও স্ট্রাণ্ডরোড ধরে লাট সাহেবের বাড়ি ঘুরে রেড রোড ধরলাম। সেখান থেকে কালীঘাট। পান্‌জাবী ড্রাইভারের গ্যারেজ দক্ষিণ কলকাতায়। সেজন্যই সে সাহস করে আমাদের নিয়ে এসেছিল। গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে পানুদিদির দরজায় ধাক্‌কা দিলাম।

পানুদিদি আমার সঙ্গে একজন মহিলা দেখে বিস্মিত হল।

বললাম, কি ভাবছ পানুদি ? এ রকম অনেককেই ঠাঁই দিতে হবে। উত্তর কলকাতায় গোলমাল ছড়াচ্ছে। মধ্য কলকাতায় তার ধাক্‌কা এক আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাগবে। এদিকেও ছড়াবে।

খুব গোলমাল হচ্ছে বুঝি ?

মানিকতলা, রাজাবাজার, পাইকপাড়ায় বেশ খুনজখম হয়েছে শুনলাম। তবে ঠিক জানিনা কতটা গুরুতর। সব গুজবও নয় কিছুটা যে সত্যি তা জানা যাচ্ছে যানবাহনের অভাব থেকে।

আমাদের ঘরের ভেতর ডেকে বসিয়ে পানুদিদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলল, এই আশঙ্কার কথা তো তোদের অনেক আগেই বলেছিলাম। ওরা পাকিস্তান না করে ছাড়বে না। এর জন্য কত নিরীহ মানুষকে প্রাণ দিতে হবে তা ভাবতেও পারছি না।

বললাম, তোমরা কথাবার্তা বল। আমি ভাল করে খবরটা জেনে আসি। আমাদের মেসের পাশে যে হোটেলটা আছে তাতে ফোন করে দেখি যদি কোন খবর পাওয়া যায়। ইনি হলেন রমা নন্দী। সত্য সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; সেটা অতি সামান্য পরিচয়। তবুও আজ সকালে যখন হাজির হলেন তখন ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ওর মাতুলালয় পাইকপাড়ায় আর যেতে দিইনি। তোমার এখানে নিয়ে এসেছি নিরাপদে থাকবে এই আশায়।

আমি বেরিয়ে পড়লাম।

কালীঘাট ট্রাম ডিপোর সামনে দাঁড়ালাম। ট্রাম বাস বন্ধ। দোকানপাট খোলা। কিন্তু রাস্তায় লোক চলাচল নাই বললেই হয়। গলির মুখে বেশ জটলা। লোকের চোখে উদ্বেগের চিহ্ন, মুখে প্রশ্ন, কি হয়েছে মশাই ?

আমিও জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে দাদা ?

শোনেন নি ? রাজাবাজারে হিন্দুদের কচুকাটা করেছে নেড়েরা। মেয়েদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেছে।

আরেক জন বলল, আমার একজন বন্ধু ফোন করে বলল, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট লুট হয়েছে। হিন্দু দেখামাত্র খুন করছে। কলাবাগানের মীনু পেশোয়ারীর দল খুন-জখম-লুটপাট করছে।

আরেক জন বলল, আর দাদা, আমার ভগ্নীপোত জানবাজারে ছ্যালো। ভাগ্নে এসে বললে, তার বাড়ির এঁড়ি-গেঁড়ি সব কোতল হয়েচে। বাড়িতে সুতো বলতে নেই। লুটপাট করে ঘরে আগুন দিয়েচে। সেই একমাত্র লোক প্রাণ নিয়ে পেলিয়ে এয়েচে।

আরে মশাই টালিগঞ্জেও লেগেছে। আনোয়ার শাহ রোডের

হিন্দুরা পালিয়ে আসছে। মসজিদে হিন্দুদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে জবাই করছে।

এসব শুনে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। সামনের একজন ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলাম ফোন করতে। ডাক্তারবাবু বললেন, কোথায়? কোন এক্সচেঞ্জ?

বড়বাজার এক্সচেঞ্জ।

তা হলে বাড়ি যান। ওটা নেড়ে পাড়ায়। অপারেটররা যেতে পারে নি। সব বন্ধ।

ফিরে এসে রিপোর্ট করলাম পানুদিদিকে।

পানুদিদি গম্ভীরভাবে বলল, দেখা যাক বিকেল অবধি কি হয়। কোন সভ্য সরকারই এই অরাজকতা বরদাস্ত করে না, ইংরেজরা সভ্যতার দাবীদার। তারা চুপ করে থাকবে না।

বিকেলে মুসলীম লীগের সভা ময়দানে। এই সভার বক্তারা যদি অসংযত হয় তা হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে এবং আরও কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতেও পারে।

পানুদিদির প্রতিবেশী অমূল্যবাবু এসে সবিস্তারে বলতে থাকে তার শোনা ঘটনা। ঘটনা যদি আংশিক সত্যও হয় তা হলে কলকাতা শহরটা যে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে তা বলা যায়। চরম অরাজকতা চলছে সর্বত্র।

বললাম, পুলিশ কি করছে?

পুলিশ? কার পুলিশ? মিঞাদের পুলিশ? তাদের পরিচালনা করছে দোহা নামক একজন ডেপুটি কমিশনার। সাহেব কমিশনার তার কাজে বাধা দিচ্ছে না। উপরন্তু সোরাবুর্দি নিজে বসে আছে কণ্ট্রোলরুমে। হাঙ্গামার এলাকায় পুলিশ যেতেই দিচ্ছে না। পুলিশের চোখের সামনেই এসব ঘটছে। হিন্দু অফিসারদের থানা থেকে হটিয়ে দিয়েছে। সব থানাতেই মুসলমান অফিসার-ইন-চার্জ। এতো হবেই মশাই। এবার বাংলাদেশ ছেড়ে হিন্দুদের

পালাতেই হবে। হিন্দু মহাজনরা খতম। হিন্দু ভদ্রলোকের ছেলেরা চাকরি পায় না। আমার এক আত্মীয় ঢাকায় মহাজনী ব্যবসা করত। ঋণশালিসীতে তার তিরিশ হাজার টাকা তামাদি করে দিয়েছে। এই রকম হাজার হাজার হিন্দুর সর্বনাশ করেছে। এবার পাকিস্তান। পাকিস্তানের চেহারা যদি খুনখারাপি হয় তা হলে হিন্দুরা কি বাংলা-দেশে বাস করতে পারবে? পারবে না মশাই, পারবে না। আর যাবই বা কোথায়!

ভদ্রলোক বিদায় নিতেই পান্নুদিদির ঠোঁটে হাসি দেখা গেল।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কবর তৈরী হল বাংলাদেশে। হিন্দু-মুসলমান এক জাতীয় নয়। ভারত মুসলমানদের বিদেশ, পাকিস্তান তাদের স্বদেশ। এই চিন্তাই সর্বনাশ ডেকে আনবে।

কি ভাবছিস ননা?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে অন্যায় করেছে তারই মাশুল আমাদের দিতে হবে।

ঠিক বলেছিস ননা। জাতীয়তাবোধ ভারতে বড়ই ছেঁদো কথা।

এটাই সত্যি। ভারতে আমরা যে জাতীয়তাবোধের কথা বলি সেটা হিন্দুর জাতীয়তাবোধ। মুসলমানদের নয়।

পান্নুদিদি গম্ভীরভাবে বলল এর জন্য আমরাই দায়ী। জাতীয়তা-বোধ ও সমাজ সংস্কারের যে মন্ত্র আমরা পেয়েছিলাম রামমোহনের কাছে, যাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর তাকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ।

রমা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। পান্নুদিদির কথা শেষ হতেই দৃঢ়ভাবে বলল, আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। স্বদেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিয়ে গেছেন স্বামীজী। আপনারা অন্যায় মন্তব্য করছেন।

পান্নুদিদি ঘাবড়াল না। মৃদু হেসে বলল, কথাটা একটু রূঢ় এবং

কটু। তবুও সত্য কথাটা বলতে হয়েছে। সত্য কোনদিন চাপা থাকে না রমা। আমি যতক্ষণ হিন্দু ততক্ষণ স্বামীজি প্রাতঃস্মরণীয় এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব। হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা কৃশ্চান এই চিন্তা অতীব হীন চিন্তা, গণ্ডীবদ্ধ চিন্তা, স্বার্থান্বেষীর চিন্তা। যখন আমি নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করি তখন আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, কৃশ্চানও নই। এই ' বস্থায় আমার সামনে এসে দাঁড়ায় বাস্তবের ভারত। স্বামীজি ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ঘটিয়ে হিন্দুসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, এর ফলেই ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল মুসলীম জাতীয়তাবাদ। যার ফলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন। ইংরেজ এই অবস্থার পুরো সুযোগ নিয়েছে। আমার বক্তব্য কিন্তু বিবেকানন্দকে ছোট করার জন্য নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। সেটা যেন ভুলে যেও না বোন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে বিবেকানন্দ বিরাট পুরুষ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের ত্রাতা বলেই গণ্য। কিন্তু যেখানে ভারতে সর্বধর্মের অবস্থানে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা দরকার সেখানে আমরা সঙ্কীর্ণ হিন্দু চিন্তায় অনেক পিছিয়ে পড়েছি। আমার বক্তব্য এটাই।

পানুদিদির যুক্তি রমার কানে যেন আগুন ঢেলে দিল। কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বলল, আপনার কাছে এটা আশা করিনি।

পানুদিদি জিজ্ঞেস করল, কি করেছিলে বোন?

মহৎকে মহৎ বলে স্বীকার করা।

আমার বক্তব্যের কোথাও কি মহৎকে হীন বলার কোন চেষ্টা করেছি? বরং নির্দোষ সমালোচনা করেছি যার উদ্দেশ্য হল ভারতীয়বোধকে হিন্দুত্ব থেকে আলাদা করে দেখা।

আপনি যে রামমোহনের কথা বললেন তিনিও তো হিন্দু সমাজ ও ধর্ম নিয়েই তার বক্তব্য রেখেছেন।

এটা সম্পূর্ণ সত্য নয় তবুও বলব রামমোহন যে যুগে জন্মেছিলেন

সে যুগের পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে রামমোহনের শিক্ষা ও কাজকে বিচার করতে হবে কিন্তু রামমোহনের জন্মের প্রায় একশত বৎসর পরে জন্মেছিলেন বিবেকানন্দ। তখন ভারতের চিত্র আলাদা। ভারতের আনাচে-কানাচে তখন ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবল। স্থানে স্থানে প্রজা বিদ্রোহ ঘটছে। এই সময় প্রয়োজন ছিল যথার্থ নেতৃত্ব দেবার। সে সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছিল হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে। অথচ হিন্দু পুঁজিবাদীরা শঙ্কিত। ইংরেজ তো বটেই। এমন সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের সুযোগ পেল ধনী বুদ্ধিজীবি হিন্দুরা। তারা স্বামীজির বিরাটত্বের প্রচারে নেমে হিন্দু-মুসলমান-কৃশ্চানে ভেদ সৃষ্টি করতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেনি। সে সময় যদি স্বামীজির মতো অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষের নেতৃত্ব দিতে পারতেন তা হলে ইংরেজ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিদায় নিতে বাধ্য হত।

কিন্তু তিনি তো রাজনীতি করতেন না। আধ্যাত্মিকতা, দেশপ্রেম ও সেবাধর্মকে প্রচার করেছেন।

পরাধীনতাকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রাখতে, শোষণকে অব্যাহত রাখতে অধ্যাত্মবাদই মানুষের বেশি সর্বনাশ করে থাকে। সেবার অর্থ হল একদল ভিখারী সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। দেশপ্রেম যদি সংকীর্ণতার মাঝে থাকে সেটা দেশপ্রেম নয়, দেশবৈরিতা ও ফ্যাসীবাদী স্বৈরাচার। এরই প্রত্যক্ষ ফল হল আজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এর পরবর্তী ঘটনা হবে দুর্দ্দশার অগ্রদূত দেশ বিভাগ। দেশবিভাগের জন্য প্রস্তুত থাকো।

ক্ষুদে এসে বাধা না দিলে আরও কতক্ষণ যে আলোচনা চলত বলা কঠিন।

স্নানের তাগাদা দিতেই সবাইকে স্নানের চেষ্টায় যেতে হল।

চারটে দিন কেটে গেল। কলকাতার জীবনে যে পাপের ছায়া নেমেছিল সেই পাপ গ্রাস করেছে পনের থেকে বিশ হাজার মানুষের জীবন, ধ্বংস হয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। কোথাও লুটপাট হয়েছে, কোথাও আগুনে পুড়েছে, কোথাও রাস্তায়-গলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। মন্দির ভেঙ্গেছে, মসজিদ ভেঙ্গেছে, পুরোহিত মরেছে, ইমাম মরেছে।

কোথায় কি ঘটছে অথবা ঘটেছে তা সেই এলাকার বাইরের লোক জানে না। সংবাদ চলাচল করে না। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ঘোড়াগাড়ী ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল বন্ধ। রাস্তার আলো জ্বলেছে, আর নেভেনি। যে আলো নিভেছে সে আলো আর জ্বলেনি। রাস্তায় মৃতদেহ গাদা দিয়ে পড়ে আছে, গলিত মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। কুকুর-শকুনে টানাটানি করছে মৃতদেহগুলো। মাঝে মাঝে ইংরেজ সৈন্যরা টহল দিয়ে যাচ্ছে। কার্ফু জারী হয়েছে, গৃহস্থ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। রাস্তায় লোক নেই। যারা সাহস করে গলির মুখে দাঁড়াচ্ছে তারা পুলিশ-মিলিটারীর গাড়ী দেখলেই ছুটে পালিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করছে। এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা দেখলেই বুঝা যাচ্ছে কলকাতার রূপ চারদিনে কিভাবে বদলেছে। এরই মধ্যে পুলিশের গাড়িতে করে কিছু কিছু লোক নিরাপদ এলাকায় এসে পৌঁছেছে। হিন্দু এলাকায় হিন্দুরা ভীড় করছে, মুসলমান এলাকায় মুসলমানরা ভীড় করছে। কলকাতা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

রাতের বেলায় আরও ভীতি সৃষ্টি হচ্ছে। নিকটবর্তী হিন্দু এলাকা থেকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠছে, শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আবার মুসলমান এলাকায় চিৎকার শোনা যাচ্ছে 'আল্লাহো আকবর'। নিস্তব্ধ রাতের শান্তিময় ঘুমের ঘোরে চমকে উঠছে মানুষ। যারা কোনদিন রক্তপাত সহ্য করতে পারেনি, তারাও লাঠি নিয়ে বের হচ্ছে পল্লী পাহারা দিতে। সমাজবিরোধী গুণ্ডাবদমাশদের পরিতুষ্ট করতে

দরাজ হাতে অর্থ বিলিয়ে নিজেদের এলাকা নিরাপদ করার চেষ্টা করছে উভয় পক্ষই। কেউ মীনু পেশোয়ারীর কেউ ফাটা গোপালের আশ্রয় নিয়েছে। এরাও এলাকার দুর্মতি সম্পন্ন তরুণদের নিজেদের দলে টেনে এনে বেশ একটা ঘাতকবাহিনী গড়ে তুলেছে। মানবতার অপমৃত্যু ঘটেছে ইতিমধ্যেই।

বাংলাদেশের মানুষ এতকাল মহাপুরুষদের গুণগান করেছে, - ন তারা সমাজবিরোধীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গুণগান করছে। এরাই এখন সমাজকে রক্ষা করছে। যারা শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যারা এই দাঙ্গার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বুঝেছে তারা এত কম সংখ্যক যে তাদের কথা শোনার লোক নেই, কথা বলার সাহসও অনেকে হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি পল্লীর মানুষ খুন জখমের সংবাদ পেলেই জানতে চায় আক্রান্ত ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান। এদের আর কোন বড় পরিচয় নেই। ওরা মানুষ নয়, ওরা ধর্মের ছাগ শিশু।

চারদিন ধরে এই নরককাণ্ড চলেছে এক নাগাড়ে। নীরব দর্শক হল ইংরেজ সরকার। ইংরেজ দেশের রাজা, প্রশাসক ও শান্তি রক্ষক। রাজা তার দায়িত্ব পালন করেনি, প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে, শান্তির নামগন্ধও নেই। নর-নারী মর্যাদা হারিয়ে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় পুষ্ট হয়ে বাঁচতে চাইছে।

কলকাতায় কোন ট্রেন আসছে না, কলকাতা থেকে কোন ট্রেন যাচ্ছে না। কলকাতার হাঙ্গামা হাওড়াতেও ছড়িয়েছে, এগিয়ে চলছে হুগলীর দিকে। সর্বত্রই হাহাকার, নিরাপত্তাহীনতা, আর্তনাদ আর ক্রন্দনের ধ্বনি। হিন্দু পাড়ায় হিন্দুরা কাঁদছে, তাদের পোষা সমাজবিরোধীরা শোধ তুলছে; মুসলমান পাড়ায় মুসলমানরা কাঁদছে, তাদের পোষা সমাজবিরোধীরা শোধ তুলছে। গরীব রিক্সাওলা, ঠেলাওলা, দিনমজুররা মজুরী খাটতে যাচ্ছে না। তাদের মুখে আহার্য উঠছে না। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ধোপা-নাপিত সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবছে। মা কাঁদছে সন্তানের জন্য, স্ত্রী কাঁদছে স্বামীর

জন্য, বোন কাঁদছে ভাইয়ের জন্য। হাহাকার করছে অসহায় পুরুষ তাদের মা-বোন-স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করতে না পেরে, আহার্য দিতে না পেরে।

এই বিভৎস অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শীরা রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠছে। ভীতি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের সুখ শান্তি হরণ করেছে। সমাজের নীচের তলার মানুষরা অনাহারের সম্মুখীন, ব্যবসা বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাজারে মাল আসছে না, বাইরের মানুষ কলকাতার ঘটনা শুনেছে আর ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। সাহস করে কলকাতার পথে পা বাড়াচ্ছে না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কলকাতাকে নির্ভর করতে হয় পল্লীর ওপর। পল্লীর মানুষ আর শহরে আসতে চায় না, এর ফলে শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চরম অভাব দেখা দিয়েছে। যে বীরত্ব দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে হত্যা করছে, যত সংখ্যক প্রাণ নষ্ট হয়েছে সামান্য চারদিনের লড়াইতে তার শতাংশের দশমাংশ মানুষ যদি পলাশীতে প্রাণ দিতে পারত তাহলে ইংরেজ শাসনক্ষমতা নিশ্চয়ই লাভ করতে পারত না।

কদিন আমাদের আটক থাকতে হয়েছে নকুলেশ্বরতলায়। রমাও যেতে পারেনি। তার মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। সারাদিন ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে। রমা কোন কথা বলছে না। তার ভাবনার কেন্দ্র কি তা বোঝা যাচ্ছে না। রাতের বেলায় চেতলা থেকে 'আল্লাহো আকবর' চিৎকার শুনলেই বিছানায় উঠে বসে জানালা খুলে দেখছে। পানুদিদিকে ডেকে দেখিয়েছে দূরের অগ্নিকাণ্ডের ধুঁয়া আর আগুনের শিখা। আমাকে মাঝে মাঝে বলেছে, কি করে বাড়ি ফিরব বলুন তো?

বলেছি, ধীরে ধীরে শান্ত হবে। তখন বাড়ি ফেরা মোটেই কষ্টকর হবে না। নিরাপদেই ঘরে ফিরতে পারবেন।

বিশ তারিখের রাত।

চোখে ঘুম নেই।

অনেক রাতে বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম। পানুদিদি নিজের বিছানা রমাকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদের ঘরে বিছানা করে নিয়েছে, সবাই ঘুমিয়ে। আমার চোখে ঘুম নেই। আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত আকাশ। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। আলো নিভে গেছে ঘরে ঘরে। মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে উঠে বসছি, রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছি। রাস্তায় জনমানব নেই। একবার ফায়ার ব্রিগেডের শব্দ শোনা গেল। কোথাও আগুন নেভাতে ছুটেছে।

চারটে রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে পানুদিদি বিছানায় নেতিয়ে পড়েছে। রমাও দরজা বন্ধ করেছে। ক্ষুদে রাত দশটা বাজলে আর বসে থাকতে পারে না।

শেষ রাতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। গভীর ঘুম নয়। ছায়ার মত কে যেন অতি সন্তর্পণে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কে ? কে ?

আমি, আমি রমা।

এ সময় এখানে কেন ?

কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখ বুঁজলেই মনে হচ্ছে মুসলমানরা তেড়ে আসছে। ভয় করছে। দিদি বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। দেখলাম আপনি এ-পাশ ও-পাশ করছেন। তাই উঠে এলাম।

কদিন রমা কথা বলেনি। আজ কেন বা সে মুখর হয়ে উঠল।

হেসে বললাম, আমি কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় নই। দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

তা, হাঁ, আচ্ছা। আচ্ছা অমূল্যবাবুকে কেমন মনে হয় বলুন তো ?

জানি না। সামান্য পরিচয়। পানুদির এখানে দু একবার দেখা হয়েছে। কেন বলুন তো ?

আজ উনি বলছিলেন, ষোল তারিখে ময়দানের মিছিলে মুসলমানরা বন্দুকের দোকান ভেঙ্গেছে, মদের দোকান লুট করেছে, কলেজ ষ্ট্রীটে ডালিয়ার দোকান পুড়িয়েছে। এসব কি সত্যি ?

সত্যি মিথ্যা দু একদিনের মধ্যেই যাচাই হবে।

পানুদিকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সতর্ক থাকতে বললেন। ভদ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা নেই পানুদির। পানুদি বলল, ভদ্রলোককে কোন দিন বসতে বলি না। ভদ্রলোককে আজ বসতে বললে কালকেই বিছানায় গতরটা এলিয়ে দিতে চাইবে। একা থাকি, সঙ্গী আমার ক্ষুদে। বয়সটাও আমার বেশি নয়। লোকে বলে কিছুটা রূপও আছে, তার ওপর হাসপাতালের সিস্টার, প্রেমের চেয়ে দেহটাকে দুমড়ে দেবার চোরাই মনটা যে নেই তাই বা কে বলতে পারে। একটু সাবধানে হিসাব করে চলতে হয় রমা। আমি একা চলতে শিখেছি, তুমি তো শেখনি, তাই বলছি। পানুদির এই কথা শুনে আমার তো মাথা খারাপ হবার উপক্রম। পানুদিকে বলেছি, ভদ্রলোকের তো পিরবার পরিজন আছে।

পানুদি বলল, ও তামাসা অনেকেরই আছে। মেয়েদের মাথায় সিঁদুর থাকাটা হল লাইসেন্স। যদি নিজেকে নামিয়ে দেবার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই লাইসেন্সটা মেয়েদের যেমন সাহায্য করে তেমন সাহায্য আর কিছু করে না। পুরুষদেরও খুবই সুবিধা, জারজ সন্তানের দায়িত্ব বহন করে অপরে। তেমনি ঘরে বউ থাকলে লাম্পট্যের সুযোগ বেশি থাকে, লোকে সহজে বুঝতে পারে না। এসব পরে বুঝবি।

রমা বলল, আমি বললাম, আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না দিদি।

পানুদি বলেছিল, পারবে। তবে বিলম্বে। বাইরের খোলস দিয়ে মানুষ চেনা যায় না বোন।

তাই বলছিলাম অমূল্যবাবুকে কেমন মনে হয়।

কথা শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি কোন মতামত না দিয়ে মাদুরের একপাশে বসে দেওয়ালে হেলান দিলাম।

আজ সকালেই রাস্তায় কিছুক্ষণ ভীড় জমেছিল। সবাই খবরের জন্য উদগ্রীব। তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে একটা মরিস গাড়ি রাস্তার মোড়ে আসতেই সবাই গাড়ি ঘিরে ধরল। গাড়ির ভেতর খদ্দরধারী তিনজন ভদ্রলোক। তাদের একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, আমাদের বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুসলমান গুণ্ডাদের বাধা দিতে হবে। কাপুরুষের মত পালিয়ে থাকলে, ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করতে না পারলে, কলকাতা শহরে হিন্দুদের বাস করা সম্ভব হবে না।

বক্তব্য শেষ হতেই চিৎকার ও শ্লোগান শোনা গেল।

আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত।

রাত পোহাল। রমা অসাড়ে আমার মাদুরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম রেলিং ধরে। সূর্য উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে আবার মেঘের দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হল। আজ কার্ফু শিথিল। কিছু কিছু লোক রাস্তায় নেমেছে। সবাই এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করতে। ওপারে চেতলায় কি ঘটেছে তা দেখতে ছুটল কিছু লোক। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে কেউ এগোচ্ছে, কেউ ফিরে আসছে। যারা ফিরছে তারা রোমহর্ষক কাহিনী শোনাচ্ছে। দাঁতন করতে করতে আদিগঙ্গার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কেওড়াতলাতেও ভীড়। কদিন পরে গাদা দিয়ে মরা এসেছে সৎকার করতে।

ফিরে আসতেই পানুদিদি বলল, রমা বড়ই ব্যস্ত হয়েছে। তার মামার খবর জানার জন্য বারবার বলছে। পারবি খবর আনতে?

বললাম, ওপাড়ায় তো এখনও যাইনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

তাহলে রমাকে নিয়েই তুই যা। আজকের কাগজে তো দেখছি,

কলকাতা শান্ত। শুধু শান্ত নয়, কয়েক দিনের নারকীয় ঘটনার পর প্রশান্ত। একবার চেষ্টা করে দেখ।

একটা ট্যাক্সি জোগাড় করলাম। বেশি ভাড়া অগ্রিম দিয়ে রমাকে নিয়ে রওনা হলাম।

গাড়ি ধর্মতলার মোড় পার হতেই বুঝতে পারলাম, দেখতে পেলাম, অনুভব করলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কি ভয়ঙ্কর বস্তু। ধর্মতলার বহু দোকান লুণ্ঠিত। কয়েকটি দোকান পুড়ে গেছে। ঘরগুলো তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। টিপু সুলতানের মসজিদের পাশে মুসলমানরা ভীড় করে আছে।

সেণ্ট্রাল এভিন্যু দিয়ে চলছি।

হেয়ার ষ্ট্রীট থানার উল্টো দিকের বস্তিটা পুড়েছে, এখনও ধুঁয়ো বের হচ্ছে বস্তি থেকে। ফায়ার বিগ্রেড যতটা পেরেছে নিভিয়ে গেলেও আগুন নেভেনি। গাড়ি বহুবাজার দিয়ে ঢুকতেই সামনে ফিরিঙ্গী কালীবাড়ি। কালীর ভগ্ন দেহ তখনও ফুটপাতে। একেবারে লণ্ডভণ্ড মন্দির। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে কতকগুলো পোড়া দোকান বিকট চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে চলছি। বউবাজারের রাস্তায় জঞ্জাল ভর্তি। তখনও ধাঙ্গড়রা রাস্তা পরিষ্কার শেষ করতে পারেনি। শেয়ালদহ ষ্টেশনের সামনে ভীড় নেই। শেয়ালদহ বাজারের সামনের দোকানগুলো পোড়া। হ্যারিসন রোডের সামনে বিভৎস চেহারা। দক্ষিণ দিকের বস্তিটা পুড়ে ছারখার। পোড়া বাঁশ আর কাঠের খুটি দু তিনটে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে বিভৎসতার।

মাঝে মাঝে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

গাড়ি হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ ষ্ট্রীট আসতেই পাড়ার ছেলেরা বাধা দিল।

কোথায় যাবেন? হাওড়া? এ রাস্তা নয়। ওদিকে মুসলমান গুণ্ডারা দল বেঁধে বসে আছে।

বললাম, যাব পাকপাড়ায়।

আর যেতে হবে না মশাই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

বললাম, ঘরেই তো যেতে চাইছি, এ-কদিন তো বাইরে ছিলাম।

ওরা গম্ভীর হয়ে বলল, যেতে পারেন, তবে সে ঘর আর নেই।

রমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করবেন? যাবেন মামার খোঁজে।

রমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

কোন রকমে বলল, দরকার নেই। ফিরে চলুন দিদির বাসায়।

আবার নানা পথ ঘুরে ফিরে এলাম পানুদিদির বাসায়। এসে দেখি ঘর ভর্তি লোক। প্রায় সবাই অপরিচিত। কেউ এসেছে চেতলা থেকে, কেউ এসেছে টালিগঞ্জ থেকে, কেউ এসেছে খিদিরপুর থেকে। ওদের সবার মুখেই মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী, বিশ্লেষণ করতে সবাই ব্যস্ত। বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনাগুলো জানার চেষ্টা সবাই করছে। অথচ সবার মুখেই আতঙ্কের ছাপ।

আমাকে দেখেই পানুদিদি ইসারায় ডাকল।

জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

হাসপাতালের ডাক্তার তার পরিবার, তার আত্মীয়স্বজন, একজন বান্ধবী ও তার স্বামী পুত্র ইত্যাদি। এখন পরিচয় দেবার মত সময় নেই। ঘরের অবস্থা সঙ্গীন। যা চাল আছে তাতে দুদিন খিচুঁড়ি খাওয়া সম্ভব তারপর হরিমটর।

হেসে বললাম, দুদিন তো চলুক। তারপর কালোবাজার তো আছেই।

পানুদিদি ধমকে উঠে বলল, অগ্রিম ব্যবস্থা রাখতে হয় রে। এখন সব কালোবাজারই সাদা বাজার। চাল-ডাল আর কয়লা সংগ্রহ করে নিয়ে আয়। যেখানে পাবি, যে কোন মূল্যে।

পানুদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আঠার বছর বয়সের পানুদিদিকে দেখতে পেলাম। সে সময় যে ভাবে ফরমাইস করত আজও সেই ভাবেই ফরমাইস করল। আজও মনে হল, পানুদিদির নির্দেশ মান্য করা আমার সব চেয়ে বড় কাজ।

বললাম, রমা কিন্তু এখানে থাকবে। তার মাতুলালয়ের হদিস করতে পারিনি। পথ থেকেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওর বাবার নামে চিঠি এবং টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। দেখি কি হয়।

কলকাতার অবস্থা কিছুটা বদল হলেও রমার বাবার কাছ থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। একদিন পানুদিদিকে বললাম, তোমার পক্ষে এত লোককে চালিয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। শুনলাম, বসন্তলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। তুমি যদি সম্মত হও তা হলে রমাকে বসন্তলালের বাসায় রাখার ব্যবস্থা করতে পারি।

পানুদিদি গম্ভীর ভাবে বলল, আমার কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। এটা সাময়িক। একটা কথা মনে রাখিস ননা, পৃথিবীতে নীলকণ্ঠের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিষ গলায় পৌঁছেই-উদরে প্রবেশ করবে, গোটা দেহ ও মনকে বিষাক্ত করবে।

আমি তার বক্তব্য বুঝতে পারলাম না, বললাম, তোমার কথা বুঝতে পারছি না পানুদি।

এত সহজ কথাটা বুঝতে পারলি না। আমার এখানে তুই রমাকে নিয়ে এসেছিস, কোন প্রশ্ন করিনি। বিষ যদি থাকে তা নীলকণ্ঠের মত তুই কণ্ঠে ধারণ করতে পারবি, আমিও পারব কিন্তু বসন্তের বউ যখন প্রশ্ন তুলবে তখন নির্দোষ রমা আর তুই কেউ-ই সে বিষ সহ্য করতে পারবি না। মানুষ হল অবস্থার দাস। বসন্ত তোকে রমার সঙ্গে দেখলে সেই বাল্যের বন্ধুত্বের উষ্ণতা তার থাকবে না। হিমানী-মণ্ডিত হয়ে তোদের ছোট হতে সাহায্য করবে লোকের চোখে। বাস্তব অবস্থাটা চিন্তা করতে চেষ্টা কর।

বুঝলাম।

আরও একটু বুঝবার বাকি আছে। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। আমাদের বিষ না থাকলেও কুলাপণা চক্র থাকে। আমাদের আভিজাত্য হল পুরাতন মনের নীচতাকে আশ্রয় করে

অপরকে আঘাত করা। ভালকেও আঘাত করি, মন্দকেও সমর্থন করি। বিচার করি না।

রমার সমস্যাটা আরও ঘোরালো হল যখন তার বাবার চিঠি পাওয়া গেল। রমার বাবা লিখেছে, দেশের অবস্থা ভাল নয়। চাঁদপুরের পুরাতন বাজার লুট হয়েছে। নতুন বাজারের অবস্থাও ভাল নয়। নোয়াখালি থেকে ভয়াবহ সংবাদ আসছে। যে কোন সময় হাঙ্গামা আবার আরম্ভ হতে পারে।

পানুদিদিকে রমা সম্বন্ধে বললেই পানুদিদি হাসে। মাঝে মাঝে বলে, রমা আমার কাছে আছে তার জন্য আমারই বেশি চিন্তা হওয়া উচিত। তুই যেন ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছিস।

ভাবতে হয়। নোয়াখালির অবস্থা তো শুনেছ। গোলাম সারোয়ার হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে তাতো শুনেছ; হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিতে হচ্ছে নইলে তাদের ঘরের বউ মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পুরুষদের খুন করছে, ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক যে কি অবস্থা তাতো জানা যাচ্ছে না। রমার বাবাও আর চিঠি পত্র দেয়নি। তাই চিন্তা করি।

পানুদিদি হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বলল, শেষ পর্যন্ত রমা ঘোমটা টেনে তোর সঙ্গে ঘর করতে না বসে।

কথাটা ছ্যাঁৎ করে আমার মনের কোনায় আঘাত করল। হঠাৎ হেসে উঠলাম, ওটা আকাশ কুসুম পানুদি। আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা যত সহজ, তার চেয়ে শতগুণ কঠিন রমাকে বিয়ে করা। তোমাকে নিয়ে ঘর করা যায়, রমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না।

এতে তুই ঠকবি না রে।

তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধলেও ঠকতাম না। যা সম্ভব নয় তাতে ঠকা-জেতার কোন প্রশ্ন নেই। জানো পানুদি, বিয়ে হয়ত করব কোন দিন, সেদিন কবে তা জানি না। বিয়েটা যৌন পরিতৃপ্তির আধার মনে করে নিজেকে গভীর দুঃখে টেনে নিয়ে যেতে চাই না।

আমি যেমন চাই না কোন নারী আমার দাসত্ব করুক তেমনি আমি চাই না কোন নারী আমার ওপর প্রভুত্ব করুক, আমি চাই সমমর্যাদায় বোঝা-পড়া করে এমন একটি মহিলা যার মানসিক গঠন আমার জীবনকে সুখের করে তুলতে পারে এবং সে নিজেও সুখী হয়।

এর কোন বাস্তব সঙ্গতি নেই বলে মনে হচ্ছে। দেখি তোর কপালে কি জোটে।

রমা আমাদের কারও সমস্যা নয়। দেশের অবস্থা যাই হোক কলকাতার অবস্থা মোটেই শান্ত নয়। তবুও রমার বাবা নানা রকম চেষ্টা করে রমার ব্যবস্থা করেছে। নিরাপদ জায়গায় আছে জেনে তার ব্যয় সম্পূর্ণভাবে বহনও করেছে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গীরা অখণ্ড ভারতের কথা চিন্তা করলেও অবশেষে তারাও বুঝল বাংলা বিভাগ না হলে বাঙ্গালী হিন্দুদের কোন আশ্রয় থাকবে না। এই বাঙ্গালী হিন্দু কারা? অনাহারী শীর্ণদেহ বাঙ্গালী অথবা বিশাল বপু শোষক বাঙ্গালী হিন্দু।

প্রতিদিন খুন জখম, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকার সমস্যা, সব কিছু ঘনিয়ে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠছে চারিধার। ইংরেজ সরকার কলকাতার জীবনকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারেনি। মূলত যাদের হাতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সেই পুলিশে পাপ প্রবেশ করেছে। মুসলমান অফিসাররা মুসলমান সমজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, গুণ্ডাদের সমর্থন জানাচ্ছে। অবার হিন্দু অফিসাররা হিন্দু সমাজ-বিরোধীদের উস্কানি দিচ্ছে, সমর্থন করছে। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতে তুই পক্ষই সচেষ্ট। নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কোন চেষ্টাই কোন পক্ষের নেই। সোরাবুর্দি চরম অবস্থা ডেকে আনল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমান দারোগাদের হাতে ক্ষমতা আরোপ করে। এই সব এলাকায় শান্তি রক্ষার বদলে

হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেশি হতে থাকে। এর ফলে মুচিপাড়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ সিরাজুলকে প্রাণ দিতে হল। আবার রিজার্ভ পুলিশের হিন্দু গোর্খা গাড়োয়ালী সিপাহীদের ওপর মুসলমানদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতেই সোরাবুর্দি পানজাব থেকে মুসলমান আর্মড পুলিশ আমদানী করে আরও অবস্থাকে জটিল করে তুলল। হিন্দুদের মনে মুসলমানদে।' সম্বন্ধে সামান্যতম বিশ্বাস আর রইল না।

দিল্লীতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গড়ে উঠেছে। জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, শরৎ বসু. লিয়াকত আলি প্রমুখ কংগ্রেস ও লীগের নেতারা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। সহজেই অশান্তি রোধ করতে পারত এরা। কিন্তু তা হয়নি। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত আর লীগের পাকিস্তান দু'টোই হল ঝগড়ার মূল। কেউ-ই আর বাংলা দেশের দিকে তাকায় না। ওরা ক্ষমতা চায়, মানুষকে বাঁচাতে চায় না।

ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন গতি ধরল।

বিহারে সুপরিকল্পিত ভাবে মুসলমান নিধনে নামল বিহারী হিন্দু জমিদার ও তাদের পোষা গুণ্ডাবাহিনী। চিৎকার শোনা গেল নোয়াখালির বদলা নাও।

হঠাৎ জ্ঞানলাভ করল জওহরলাল। হুমকি দিলেন, বিহারে মুসলমান নিধন বন্ধ করতে বিমান থেকে বোমা ও গুলী বর্ষণ করা হবে। সে সময় গান্ধীজি নোয়াখালিতে মুসলমানদের হৃদয় পরিবর্তন করছেন। আর দলে দলে হিন্দু নোয়াখালি থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসছে। যে সব জেলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও অশান্তি দেখা দিল। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে অশান্তি দানা বাঁধতেই সোরাবুর্দিরও জ্ঞানলাভ হল। মানুষ মারা ও মানুষ মারা বন্ধ করার প্রহসন নতুন মোড় নিল।

ইংরেজ বাধ্য হল বাংলা দেশে ছায়া-মন্ত্রীসভা গড়তে। হিন্দু

প্রধান জেলার জন্য হিন্দু মন্ত্রী, তাদের মুখ্য হলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। অর্থাৎ বাংলা বিভাগ পনের আনা শেষ, বাকি এক আনা হল সীমানা নির্ধারণ ও সরকারী ঘোষণা। বাংলার সর্বনাশের পথ খুলে দিয়ে তল্পীতল্পা গুটিয়ে গান্ধীজি তার পেশাদারী দার্শনিক নীতিকথা শোনাতে বিড়লা বাড়িতে ধ্যানে বসলেন।

একশ নম্বর হ্যারিসন রোডে পানজাবী মুসলমান পুলিশের নারকীয় অত্যাচারের পর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে সভা বসল। সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা বিভাগের দাবী জানাল বাঙ্গালী হিন্দু অভিজাত নেতারা।

বৃটিশ পার্লামেন্টেও 'ভারত স্বাধীন' আইন পাশ হল। ভারতকে বিভাগ করে ভারত স্বাধীন আইন। এক অংশ হল ভারত, আর দুটো বিচ্ছিন্ন অংশ হল পাকিস্তান।

পাকিস্তান কায়েম করল বাঙ্গালী মুসলমান (?) তাদের অবাঙ্গালী মুরুব্বি এবং অবাঙ্গালী গুণ্ডাদের প্ররোচনায়। ইতিহাস মুচকি হেসে পুরাতন অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা উল্টে দুর্ভাগ্যের নতুন অধ্যায় লিখতে বসল।

পাকিস্তান হাসেল হতেই লাখে লাখে মানুষ দেশ ছাড়তে লাগল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে থাকে আশ্রয়ের আশায়। যারা আসছে তাদের অনেকেই সম্পদ নিয়েই আসছে। সম্পদহীন মানুষের সংখ্যা নগণ্য নয়। যারা অর্থবান মুসলমান তারাও পাড়ি জমাল পূর্ববঙ্গে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটল সরকারী কর্মচারী নিয়ে। যারা পাকিস্তানে যেতে চায় তাদের পাকিস্তানে পাঠানো হল যারা ভারতে আসতে চায় তাদের ভারতে পাঠানো হল। ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু সরকারী কর্মচারী আর থাকল না। পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমান সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নগণ্য হয়ে গেল। এইবার হল আসল দেশ বিভাগ।

দেশ বিভাগ শেষ পর্যন্ত চায়নি উভয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু

নেতা। ইংরেজের ফর্মুলা অনুসারে বাংলাদেশ নিজেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারত। তার জন্য শরৎ বসু ও সোরাবুর্দি শেষ পর্যন্ত চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর কংগ্রেস এবং ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালিত কংগ্রেসীরা বিরোধ ঘটাল। জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেল বুঝল, কলকাতা হাতছাড়া হলে উত্তর ভারতের বৈভব, হিন্দীভাষীদের কর্ম সংস্থান ও পুঁজিপতিদের পুঁজিরক্ষা সম্ভব নয়। সেজন্য এই দাবী অগ্রাহ্য হল। সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনার কোন প্রয়োজনও মনে করল না ওরা।

জওহরলাল চায় গদীতে বসে সুলতানী করতে। তার একমাত্র প্রতিপক্ষ সর্দার প্যাটেল। তাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারেন গান্ধীজি। জওহরলাল অখণ্ড ভারতের কথা ভুলে গেছে, সে চায় ক্ষমতা। এই ক্ষমতালাভ প্রায় মুঠির মধ্যে। একমাত্র গান্ধীজির সমর্থন প্রয়োজন। জওহরলাল নোয়াখালিতে গান্ধীজির কাছে গেলেন। গান্ধীজি জওহরলালের কাজকে সমর্থন করে বিবৃতি দিলেন, 'সমস্যা অন্যভাবে যখন সমাধান হচ্ছে না, তখন ভারত বিভাগ অনিবার্য। তাই হোক।' এই নীতিহীন অনাচারকে সমর্থন করেও গান্ধীজি জাতীর জনক।

জিন্নাহের জয় জয়াকার।

পনর আগষ্ট, সাতচল্লিশ সাল। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। কংগ্রেসীরা বলল, স্বাধীনতা পেলাম। তার মূল্য কি ভাবে দেশের লোক দিয়েছিল সে ঘটনা উত্তরপুরুষরা হয়ত চিন্তাও করতে পারবে না।

দেশ ভাগ হল। রাডক্লিফ্ রোয়াদাদে সীমানা ঠিক হল। কংগ্রেস স্বীকার করে নিল। মুসলমান আলাদা নেশ্যান, হিন্দুরা আলাদা নেশ্যান। এইভাবে আদর্শ ও নীতি বিসর্জন দিয়ে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনল। এবার আরম্ভ হল অধিবাসী বিনিময়। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী বিনিময়ে দু'চার হাজার মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে, বহু ঘরবাড়ি পুড়েছে, বহু নারীর অমর্যাদা ঘটেছে কিন্তু

পূর্ব ও পশ্চিম পান্‌জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে অধিবাসী বিনিময়ের যে ব্যবস্থা করা হল তাতে লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাল। কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হল আর পঞ্চাশ হাজারের ওপর নারী ধর্ষিতা হল। পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের এমন জঘন্য নিদর্শন কোথাও নেই। অথচ একে বলা হল অহিংস সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভ। বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিনা তা বুঝা দুষ্কর। এইরূপ নিরীহ অসামরিক নরনারীর এই লাঞ্ছনা-অবমাননা বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটেছে কিনা সন্দেহ। দিল্লীর গদীতে বসে জওহরলাল আর তার কংগ্রেসী অনুচরবৃন্দ এই নারকীয় ঘটনায় কতটা ব্যথিত হয়েছিল তা কেউ জানে না। ভারতবর্ষের উভয় অংশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় ভারতে উপস্থিত হল। পানজাবের অধিবাসীরা মুসলমানদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি পেলেও পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য কোন আশ্রয়ই ছিল না। তারা গরু-ভেড়ার মত মাঠে ঘাটে পথে বসে হাঁপাতে থাকে। যাদের অর্থ ছিল তারা আশ্রয় খুঁজে নিল। সর্বাধিক চাপ পড়ল শহর কলকাতার ওপর। পানজাবে অধিবাসী বিনিময় ঘটল, কিন্তু যে সব মুসলমান পাকিস্তান চায়নি, তারা কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে অভিশাপ দিল কংগ্রেসকে। তারা বলল, বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে দিয়েছে কংগ্রেস।

সরকারী খয়রাত আরম্ভ হল।

যে সব কংগ্রেসী এই দেশ বিভাগকে সমর্থন করতে পারেনি তারা কংগ্রেস ত্যাগ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। কংগ্রেসের তথা পুঁজিপতিদের ভাড়াটিয়া লোকের সংখ্যা বেশি। তাই আদর্শহীনতার যারা প্রতিবাদ জানাল তাদের পেছনে এসে দাঁড়াবার লোকের সংখ্যা হল নগণ্য। সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে বাংলাদেশ। সেখান থেকেই সামান্য ও মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, সে প্রতিবাদ শোনার মত সত্ত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত দিল্লির সুলতানদের

মোটেই অবসর ছিল না। জনতার প্রতি প্রারম্ভে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কংগ্রেস তার চরম পরিণতি ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে একদিন সপরিবারে উপস্থিত হলেন রমার বাবা। আবার বসন্তলালের বাড়িতে উপস্থিত হলেন নৃপেন কাকা।

বাবা-মাকে পেয়ে রমা খুব উৎসাহিত। বিশেষ করে যখন শুনল সম্পত্তি বিনিময়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে অর্থাৎ ভারতে তাদের আশ্রয় স্থায়ী হয়েছে-তখন উৎসাহের আধিক্য দেখা দিল। খুব তাড়াতড়ি বিনিময় শেষ করে নিশিকান্ত বাবু রমাকে নিয়ে চলে গেলেন বহরমপুরে। যাবার আগের দিন রমা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা বহরমপুরে যাচ্ছি, শুনেছেন তো সবাই। আপনার মহত্বের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

হেসে বললাম, ওটা আমার প্রাপ্য নয়। ওটা পান্নুদির প্রাপ্য।

আপনার কিছু বুঝি বলার নেই।

কি যে বলব তা আমি নিজেই জানিনা শ্রীমতী। সুখে থাকুন।

আশীর্বাদ ?

কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে।

রমা গম্ভীর মুখে উঠতে উঠতে বলল, কোন সময় বহরমপুর গেলে আমাদের বাড়িতে যাবেন। বাড়ি এখনও দেখিনি। বাবা দখল নিয়েছেন। সৈদাবাদে বাড়ি। বাবার নাম করলে পাড়ার লোকে চিনিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা চলি।

আমি বিদায় অভিনন্দন জানাবার আগেই রমা ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে পান্নুদিদির বাসায় গেলাম। পান্নুদিদি ডিউটিতে গেছে। ক্ষুদে আমাকে দেখেই দরজা খুলে বসতে দিয়ে বলল, বসুন। দিদির আসতে আটটা-নটা হবে। আমি চা করছি।

আমি হাঁ-না কিছুই বললাম না। পান্নুদিদির বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ টেনে নিলাম। চোখের সামনে খবরের কাগজ, কি পড়ছি নিজেই জানি না। চোখ জড়িয়ে এল। অসারে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্ষুদের ডাকে একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ করলাম। চায়ের বাটিটা রেখে ক্ষুদে নিজের কাজে গেল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। চায়ের কাপে চা ঠাণ্ডা হতে থাকে।

এবার ঘুম ভাঙ্গল পান্নুদিদির ডাকে।

উঠে বসতেই দেখি পান্নুদিদি আর বসন্তলাল।

এসে ঘুমোচ্ছিস যে বড়। শরীর ভাল আছে তো? চা-ও খাসনি দেখছি।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চায়ের কথা মনেও ছিল না। তা বসন্ত যে, কি মনে করে?

উত্তর দিল পান্নুদিদি, বাবা এসেছেন।

এতো ভাল কথা। দেশ বিভাগকে যখন আমরা মেনে নিয়েছি, আর মেনে নিয়েছি হিন্দু-মুসলমান দুটো আলাদা নেশ্যন তখন নিরাপদ স্থানে আসাই যুক্তিযুক্ত। সবাই ভাল আছে তো?

তা ভাল আছে। তিনটি বোন দুটি ভাই বাবা-মা সবাই এসেছেন। বড়দির কাছে এলাম, এদের একটা পোরশ্যন এখানে যাতে রাখা যায়।

কথা শেষ করেই বসন্তলাল পান্নুদিদির মুখের দিকে তাকাল।

পান্নুদিদি বলল, শুনলাম, পরে জবাব দেব।

বসন্তলাল একটু অস্থিরভাবে বলল, আমার বাড়িতে স্থানাভাব। সেজন্যই বলছিলাম, ভাই-বোনরা এখানে থাকুক, বাবা-মা আমার কাছে থাকুন।

পান্নুদিদি হাসতে হাসতে বলল, থাকলে সবাই এখানে থাকতে পারবে। পোরশ্যন নিয়ে কারবার আমি করি না। তবে কবে আসবে অথবা মোটেই আসবে কিনা সেটা ঠিক করতে হবে।

বসন্তলাল ঠিক এই উত্তর বোধহয় আশা করেনি।

বসন্তলাল অনেক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। অবশেষে আত্মপক্ষ সমর্থনের মত বলল, আমি সে কথা বলছি না। আমার বাড়িতে জায়গা নেই, অসুবিধাটা বললাম।

পানুদিদি বলল, আমি তোকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। তবে তা কতটা সম্ভব হবে তা কালকে বলব।

বসন্তলাল বোধহয় আরও কিছু বলত। আমার উপস্থিতিতে সব কথা বলতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খবরটা দিয়ে গেলাম।

পানুদিদি বাধা দিয়ে বলল, তুই তো দায় ঘাড়ে তুলে দিতে এসেছিস। একবার তো বললি না বাবার সঙ্গে দেখা করতে চল। একবার তো বললি না বাবা আমার কথা স্মরণ করছে কি না, একবার তো বললি না বাবার অভিমত কি!

বলতাম, বলার অবসর পেলাম কোথায়। আজ আর নয়। কাল এসে কথা বলব।

বসন্তলাল বিদায় নিল।

আমি এ-বার কথা বলার সুযোগ পেলাম।

বললাম, রমা চলে গেছে।

ভালই হয়েছে। বাবা-মায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করবে এবার।

হাঁ। আমিও নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম "পথি নারী বিবর্জিতা" এই আর্ষবাক্যের অর্থ বুঝলাম।

পানুদিদি হেসে বলল, তাই মনে হয়। মেয়েদের বিষয়ে অত তড়িঘড়ি কোন ডিসিসন নিতে হয় না, বুঝলি। মেয়েদের চেনা যায় না সারা জীবনে। পুরুষ যতটা আত্মকেন্দ্রিক তার চেয়ে লক্ষগুণ আত্মকেন্দ্রিক মেয়েরা। তাদের সামান্য স্বার্থে আঘাত লাগলে যে কোন কাজ তারা করতে পারে। মেয়েরা যতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ পুরুষরা ততটা নয়। একটু সতর্ক হয়ে চলবি। বুঝলি।

পানুদিদির উপদেশবাণী নির্বিকার ভাবে হজম করে চুপ করে রইলাম।

যাবার সময় রমা তোর সঙ্গে দেখা করেছে ?

হাঁ।

কিছু বলল ?

তার সৈদাবাদের বাসায় সময় পেলে যেতে বলেছে।

ভাল কথা।

তুমি ছাড়া-ছাড়া কথা বলছ কেন ?

আঁটা-আঁটা কথা বললে তোর কষ্ট হবে তাই ছাড়া-ছাড়া কথা বলছি। ভাবছি বসন্তলালের কথা। ওটা যেন ক্রমেই মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলছে। আমি কিন্তু অনেক আশা করেছিলাম ওর কাছে। অন্তত মানবতাবোধ থাকবে। হৃদয়বত্তা দিয়ে পরিবেশকে জয় করবে। তা বোধহয় হবে না।

আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বসন্তলালের কথা শুনে। কিন্তু বলতে পারিনি। একদম অনধিকার চর্চা বলে।

পানুদিদি ক্ষুদেকে ডেকে খাবারে ব্যবস্থা করতে বলে আমার পাশে চুপ করে বসল।

আজকের কাগজ পড়েছ ?

পড়েছি।

দেশ বিভাগের নারকীয় পরিণতিগুলো চোখে পড়ছে কি ?

পড়ছে। এটাই তো আমরা আশঙ্কা করেছিলাম। আরেকটা সমস্যা লক্ষ্য করেছিস কি ? কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরের মহারাজা কি করবে স্থির করতে পারছে না।

কেন ? ইংরেজ তো সুযোগ দিয়েই গেছে। ইচ্ছামত যে কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হতেও পারে আবার নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম বলে ঘোষণা করতে পারে।

কাশ্মীর রাজ্য কিনে নিয়েছিল গোলবসিং ডোগরা। সর্ত ছিল,

কাশ্মীরকে স্বাধীন বলেই মেনে নেবে ইংরেজ। ধীরে ধীরে ইংরেজ কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব গ্রাস করে তাকে অনুগত রাজ্যের পর্যায়ে টেনে এনেছিল। অবশ্য প্রয়োজন ছিল কাশ্মীরকে কুক্ষিগত রাখা। একদিকে চীন, আরেক দিকে রাশিয়া ও আফগানিস্তান। ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে কাশ্মীরকে কব্জায় রাখতে হয়েছিল। এবার কাশ্মীর তার পূর্ব স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারে।

তা হবে না। যে কারণে ইংরেজ কাশ্মীরকে কব্জায় রেখেছিল সেই কারণেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই প্রয়োজন কাশ্মীরকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার। জিন্নাহের দাবী হল কাশ্মীর মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকা সেজন্য পাকিস্তানে কাশ্মীরকে যোগ দিতে হবে। ভারত বলছে, তা নয়, মহারাজার ইচ্ছাই আসল। মহারাজা যা বলবে তাই করতে হবে। তাই ভারতীয় কূটনীতিকরা ছুটছে শ্রীনগরে মহারাজাকে স্বমতে আনতে।

পাকিস্তান কিন্তু চুপ করে বসে নেই। পাকিস্তান বেনামে হানাদার পাঠাতে আরম্ভ করেছে।

অর্থাৎ স্থায়ী অশান্তির পথ উন্মুক্ত হল। হানাদারদের কাউণ্টার-য়্যাক্ট্ করতে পারলে হয়ত কিছুটা হাঙ্গামা প্রশমিত হবে। পাকিস্তান যেমন কাশ্মীর মুসলমান গরিষ্ঠ রাজ্য বলে হানাদার পাঠিয়েছে তেমনি খুলনা, দিনাজপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও হানাদার পাঠিয়ে ফিরতি খেলা দেখালেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তা হবে না পানুদি। কাশ্মীর নিয়ে যে সমস্যা তাতে ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। বাংলাদেশের সর্বনাশ ডেকে আনতেই তো দেশ বিভাগ। সেখানে জোড়া দেবার কোন চেষ্টাই হবে না। তা না হলে আসাম থেকে শ্রীহট্টকে পাকিস্তানে জুড়ে দিত কি? শ্রীহট্টে যে গণভোট হল তাতে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস শ্রীহট্টকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই করেছে। 'আসাম' প্রদেশের নাম হলেও সেখানকার

অধিবাসীদের অধিক সংখ্যকই হল বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের প্রাধান্য নষ্ট করতেই তো শ্রীহট্টকে বলি দিয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঙ্গালীর সর্বনাশ করেছে কংগ্রেস। এমতক্ষেত্রে কাউন্টার য়্যাক্‌ট্‌ করার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। যে দেশকে টু নেশ্যন থিওরীতে বিভাগ করা হল, সে দেশ ইসলামীস্থান ও হিন্দুস্থান হবার পর অসন্তোষ ও অশান্তি যে চিরস্থায়ী হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলাফল সহ্য করতে হবেই পানুদি।

পানুদিদি কাউন্টার য়্যাক্‌ট্‌ সম্বন্ধে না ভেবেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। আমার মন্তব্য শুনে বলল, ঠিকই বলেছিস ননা। এ সমস্যার সমাধান ও পথে হবে না। কংগ্রেস যা করছে তাতে এদেশের অধোগতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অধোগতি ঘটলেই জনসাধারণ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে।

অধোগতির পদধ্বনি শোনা গেল বাংলায় আর কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে শোনা গেল যুদ্ধের দুন্দুভি। পাকিস্তান আর ভারত লড়াইতে নেমেছে। পাকিস্তান দাবী করছে মুসলমান গরিষ্ঠ কাশ্মীর তার আর ভারত দাবী করছে মহারাজা হরি সিংহের সনদ। উভয়ে দাবীদার। দাবী স্থির হবে বন্দুকের মুখে।

অনায্য দাবীর পথ বন্ধ করতে, পাকিস্তানতোষণ নীতিকে বরবাদ করতে বিড়লাবাড়ির মাঠে গান্ধীজীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল আততায়ীর গুলীতে। অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা যারা ছিল তারা আদর্শ হারিয়ে সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে নিজেদের বলী দিতে কেন বাধ্য হল তা বলবে পরবর্তীকালের ইতিহাস। কিন্তু কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে যে রক্তপাত তার সপক্ষে উভয়পক্ষের দাবী রক্ষার অজুহাত নেহাত মামুলি।

জওহরলাল বললেন, কাশ্মীর ভারতের। মহারাজা হরি সিংহ

ইংরেজের আইন মোতাবেক ভারতে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারত তার আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করছে।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারেনি জওহরলাল। বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধকে ভাল চোখে দেখেনি। তাদের বণিক স্বার্থহানি ঘটার উপক্রম। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ফতোয়া দিলেন, যুদ্ধ বন্ধ কর। হ্যাঁ, যুদ্ধ বন্ধ হল। তবে পাকিস্তান তার অধিকৃত এলাকা ছাড়ল না, ভারতও ছাড়ল না তার অধিকৃত এলাকা। কাশ্মীর বিভাগ এইভাবে সম্পূর্ণ হল। আরও একবার ভারত বিভাগ হল। জওহরলালের আইন সম্মত দাবী আর জিন্নাহের সংখ্যাগত দাবী এইভাবে আংশিক সফল হল স্থায়ী অশান্তির বীজ বপন করে।

জওহরলাল দখল করল জুনাগড়, হায়দরাবাদ। বলল, দেশীয় নৃপতিদের ইচ্ছাই সব কিছু নয়। প্রজাদের ইচ্ছাই আসল কথা। জুনাগড় বা হায়দরাবাদের প্রজারা চায় না পাকিস্তানে যোগ দিতে? কিন্তু কাশ্মীর? যুদ্ধ থামলে, দেশে শান্তি ফিরলে সেখানেও গণ-ভোট হবে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা যা চায় তাই হবে।

যুদ্ধ থামল। শান্তি ফিরল। ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থা ঘোষণা করা হল। এমন কি কাশ্মীরে ভারতীয়দের যাতায়াতের ওপর বিধিনিষেধ জারী করাহল। কাশ্মীরে অ-কাশ্মীরিকে এক ইঞ্চি জমি দেওয়া চিরকালের জন্য নিষেধ করা হল। এই বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গেলেন কাশ্মীরে। তাকে গ্রেপ্তার করা হল, সেখানেই বন্দীদশায় অজ্ঞাত কারণে তার মৃত্যু হল। কিন্তু গণভোট হল না। জওহরলাল জানত, গণভোটে ভারতের পরাজয় হবেই। মুসলমান সমাজে এমনভাবে হিন্দু বিদ্বেষ দানা বেঁধেছে যার ফলাফল কখনই ভারতের স্বপক্ষে হবে না।

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার কোন পথ না পেয়ে ধীরে ধীরে ভারতে যোগ দিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, ভারত এগিয়ে চলছে, ভারতে যেন সমস্যা আর নেই।

ভারতে কোটি কোটি দরিদ্র, শোষিত ও বঞ্চিত নরনারী আশান্বিত হল, সুদিন সমাগত।

ভারতকে উপহার দেওয়া হল সংবিধান।

ভারত পেল জাতীয় সঙ্গীত।

ভারত পেল জাতীয় পতাকা।

ভারত পেল জাতীয় ভাষা।

কিন্তু পেল না আহার্যের গ্যারান্টি, পেল না পূর্ণ নিশ্চয়তা, পেল না শিক্ষালাভের স্বীকৃতি, পেল না মাথা গোঁজার স্থান, পেল না রোগের ওষুধ পাবার সুযোগ।

ইংরেজ পেল তার স্বার্থরক্ষার গ্যারান্টি।

প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রীরা পেল বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের গ্যারান্টি।

আর পেল ব্যক্তিস্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের চোখরাঙ্গানী, গণতন্ত্রের নামে চোরতন্ত্রের প্রহসন।

দেশের লোকের যা আশা ছিল তা দেওয়া হল না। কায়েমী স্বার্থ যাতে বজায় থাকে তার জন্য মহাভারত লেখা হল। এই মহাভারতের আকৃতিমত সংবিধানের লিপিকার নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধিকে ইংরেজ ও আমেরিকার কাছে রেহান দিয়ে ওদের সংবিধানকে প্যান্টকোট খুলে ধুতি-চাদর পরিধান করিয়ে 'ভারতীয় সংবিধান' নাম দিয়ে চরম প্রহসনের অবতারণা করল। সবাই বলল, আহা আম্বেদকর একজন দ্বিতীয় মনু, এটা আরেকটি মনুসংহিতা।

যে দেশের শতকরা পঁচাশীজনের অক্ষরজ্ঞান নেই সে দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে সংবিধান জারী করা করা হোল, এ এক অমূল্য পদার্থ, দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া উ ভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া উ ভি পস্তায়া।

সংবিধান চালু হবার আগেই প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভা বাংলার জন্য উপহার দিল সিকিউরিটি য্যাক্ট্। যারা প্রতিবাদ জানাল তাদের একজন পুরস্কৃত হল পুলিশের বুলেটে। মিহির মণ্ডল প্রাণ দিল

আইনসভার চত্বরে। সেই প্রভু ইংরেজের কায়দায় একশত চুয়াল্লিশ ধারা, সেই প্রভুদের কায়দায় জনবিক্ষোভ দমন করতে গুলী, টিয়ার গ্যাস। চমৎকার স্বাধীনতা!

অবাক হয়ে লোকে ভাবল, এ আবার কেমন স্বাধীনতা! এ আবার কেমন অহিংসা। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিদায় নেবার সময় বলে গেছেন, ইংরেজ দু'শ বছর রাজত্বকালে যত নরহত্যা না করেছে তার বেশি নরহত্যা করেছে কংগ্রেস সরকার মাত্র দশটি বছরে।

পট পরিবর্তন হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তখনও মনস্থির করতে পারে নি। দরিদ্রশ্রেণী ভীত সন্ত্রস্থ। তারা যেন মনে করছে, হিন্দুর দয়াতেই তাদের বাঁচতে হবে, যাদের কিছু অর্থ আছে তারা চিন্তা করছে পাকিস্তানে যাবে কি যাবে না। যারা যেতে পারে নি, তারাও পরিবার বিভক্ত করে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে পরিবারের একাংশকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। কোন সময় বিপদ ঘটলে তারা সীমান্ত পেরিয়ে তাদের স্বর্গভূমিতে যেতে পারবে অক্লেশে। অর্থবান মুসলমানরা তাদের সম্পদের শতকরা নব্বই ভাগ পাচার করে দিল পাকিস্তানে। তাদের দু'চার দশজন যারা রয়ে গেল এখানে, তারা সম্পদ গুছিয়ে পাড়ি জমাবার সুযোগে বসেছিল।

অপরপক্ষে পানজাবে অধিবাসী বিনিময় হয়েছে। পূর্ববঙ্গের অর্থবান, অল্পবিত্ত হিন্দুরাও ঠিক একইভাবে ভারতে এসে জমায়েত হতে থাকে।

প্রফুল্ল ঘোষ ফতোয়া দিয়েছিলেন, হিন্দুরা দেশত্যাগ করবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাদের কোন ভয় নেই। নিরাপদে সবাই সেখানে বাস করতে পারবে। সবার আগে ভারতে যারা পালিয়ে এল আত্মরক্ষার জন্য এবং আত্মস্বার্থরক্ষা করতে তারাই ছিলেন হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জনপ্রতিনিধি।

তাদের অন্যতম হলেন, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অপরকে সহজে উপদেশ দেওয়া যায় কিন্তু নিজে সে উপদেশ পালন করা যায় না, এটাই প্রমাণ করলেন প্রফুল্ল ঘোষ। উনিও রেহাই পেলেন না। পূর্ববঙ্গকে উপহার দিয়ে যারা ছেঁড়া তাসের ঘর তৈরী করল, তারা প্রফুল্ল ঘোষকে সহ্য করতে পারল না। প্রফুল্ল ঘোষ বিদায় নিতে বাধ্য হল বাঙ্গাল-ঘটির প্রশ্নে। যারা অখণ্ড ভারতের কথা বলেছে, তারাই ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। যারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই চীৎকার করেছে তারাই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়েছে। যারা 'আমরা বাঙ্গালী' বলেছে, তারাই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিতে হটিয়ে দিয়েছে প্রফুল্ল ঘোষকে, তবুও এরা নাকি কংগ্রেসী! যারা এসব করেছে তারা শুধু কায়েমীস্বার্থ রক্ষা করতেই এসব করেছে। বিশেষ করে কায়েমীস্বার্থ রক্ষা করতে গান্ধীজিও প্রফুল্ল ঘোষকে পত্র দিয়েছিলেন, তোমার মন্ত্রীসভায় একজন মাড়োয়ারী মন্ত্রী যেন থাকে। পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে গান্ধীজির এই ঐতিহাসিক পত্র চিরকাল বলে দেবে গান্ধীজি কার কাছে নিজেকে বিক্রয় করেছিলেন।

দেশের মানুষ কাগজে কলমে অনেক কিছু পেল, বাস্তবক্ষেত্রে পেল অনাহার, কর্মহীনতা, নিরাশ্রয়তা, শোষণ, বঞ্চনা, অশিক্ষা।

দিন গড়িয়ে চলে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির কাক-দ্বীপ, তেলেঙ্গানা পর্ব শেষ। তারা বিপ্লবের কথা ভুলে গেছে। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করতে চায়। তারই জন্য প্রস্তুতি চলছে। যারা বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখিয়েছিল তারা খাতা বদল করে ভোটের দালালদের খাতায় নাম লিখিয়ে পথে ঘাটে সর্বত্র বিপ্লবের গরম গরম বুলি শুনিয়ে সহজভাবে ভোট ভিক্ষায় নেমেছে।

বসন্তলাল হঠাৎ কেনবা অধিক দেশভক্ত হয়ে পড়েছে আজকাল। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবার চেষ্টায় রাতারাতি কংগ্রেসী হয়েছে।

অনেককাল তার সঙ্গে দেখা হয় নি। খবরের কাগজ আর লোকমুখেই যা কিছু শুনি। পানুদিদি মাঝে মাঝে আসে। আমিও যাই তার বাড়িতে। দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনাও করি কিন্তু তেমন জমাটি আলোচনা করার আজকাল বিশেষ সময় পাই না।

কদিন আগে রমা এসেছিল। পানুদিদির অতিথি। আমিও দৈবক্রমে সেখানে যেতেই দেখা হল। আমাকে দেখেই রমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম। সন্ধ্যের সময় পানুদির সঙ্গে আপনার কাছে যাব ঠিক করেছিলাম। আর যেতে হবে না।

নিশ্চয়ই বিশেষ কোন দরকার আছে।

রমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তবুও বেশ সহজভাবে বলল, সামনের বুধবারে আমার বিয়ে। নেমতন্ন করতে এসেছি।

আমি অবাক হয়ে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কি ভাবছেন। গত বার-তের বছরে বিয়ে করার সময় পাইনি। বাবার সংসার গুছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। নিজের কথা ভাববার অবসর পাইনি। আপনাদের কিন্তু যেতে হবে। জবাব দিচ্ছেন না কেন? কি ভাবছেন?

দশ বছর আগের দিনগুলো মনে পড়ছে শ্রীমতীজি।

সেটা ছিল দুঃস্বপ্নের দিন। পেছনে তাকিয়ে নিজেকে ব্যথিত করতে চাইনি ননাবাবু। তবুও যখনই সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তখন আঁতকে উঠি। ওসব কথা যাক, যাবেন তো?

পানুদি কি বলে শুনে নিন।

পানুদিদি বলল, যেতে পারি তবে সর্তসাপেক্ষ।

হেসে বললাম, বিয়ে বাড়িতে নেমতন্ন খেতে যাবে তার জন্য আবার সর্ত কেন?

পানুদিদি চোখ পাকিয়ে বলল, এ কথাটা তোর বুঝি বসন্তের বিয়ের সময় মনে ছিল না? সেদিন তুই তো বলেছিলি, বসন্ত

নিজেকে বিক্রি করেছে পানুদি। বেচা-কেনা যে সমাজে স্বাভাবিক সেখানে কেমন করে নতুন কিছু আশা করেছিলি? সমাজ ব্যবস্থার নোংরামিকে আঘাত করতে পারিসনি অথচ সততাধর্মী সেজে বিয়ের নেমতন্নও রক্ষা করতে যাসনি, এতে কি কৃতিত্ব জাহির হয়েছে? নিজেও তো কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারিস নি। সত্যি কথা হল, আমরা একই নর্দমায় বাস করি, মাঝে মাঝে নর্দমার পঙ্ক থেকে মুখ তুলে অক্সিজেন যখন গ্রহণ করি তখন কতকগুলো নীতিবাক্য আওড়ে অপরের কাজের সমালোচনা করি। আমরা আঘাত করতে চাই কিন্তু সে আঘাত নিজেকেই আহত করে। তাই বলছিলাম, নেমতন্ন রক্ষায় তোর যেমন মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল, আমারও তেমনি থাকা সম্ভব। রমার কাছে সব শুনে তবেই মত দেব।

রমাকে বললাম, যদি পানুদি রাজি হয় তা হলে আমিও রাজি।

আমাদের আলোচনায় রমা খুব অখুশী হল না।

পরে পানুদির মুখে শুনেছি গত কয়েক বছর রমা বহরমপুরের কোন মেয়ে স্কুলে চাকরি করে তার বাবার ভাঙ্গা সংসার জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নিয়েছে। স্থানীয় স্কুলেরই একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার বিয়ে। তার বিপ্লবী দাদা অনিল নন্দী কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য করে, অনেক পারমিট-লাইসেন্সের মালিক। তারও নতুন সংসার। সেই সংসার নিয়েই সে ব্যস্ত। বাবা-মাকে সাহায্য করার ফুরসত সে পায় না।

রমা নাকি দুঃখ করে বলেছিল, দাদা উপার্জন ভালই করে কিন্তু বাবা তার উপার্জিত অর্থ নিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বুঝেছেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে দাদার অবদান যতই বিরাট হোক তার লক্ষগুণ বেশি সে আদায় করেছে দেশের কাছ থেকে দেশসেবার নামাবলী গায়ে দিয়ে। শুধু এই নয়, দাদার উপার্জন সৎপথে আসে না। অসৎ উপার্জনের একটি কড়িও বাবা নিতে রাজি নন। বাবা বলেন, অসদাচারী পুরুষের পিতা হওয়াও অভিশাপ।

পান্নুদিদি বলেছিল, শুনলি তো। দেশটা কালোবাজারী, দুর্নীতিপরায়ন লোকে ছেয়ে গেলেও কোথাও কোথাও সিলভার লাইনিং এখনও দেখা যায়। নিরাশ হবার কিছু নেই।

রমার বিয়ের দিন সকাল বেলার প্রথম গাড়িতেই রওনা হলাম।

রাণাঘাট পেরিয়ে ট্রেনের গতি ধীর হয়েছে। প্রত্যেক স্টেশনে গাদা দিয়ে স্ত্রীপুরুষ শিশু গাড়িতে উঠছে। সবাই না হলেও অধিকাংশ বিনা টিকিটের যাত্রী, অধিকাংশই বাস্তুহারা মানুষ। আশ্রয় ও জীবিকার আশায় এসেছে ভারতের মাটিতে। প্রায় সবারই চোখেমুখে নৈরাশ্যের ছাপ।

পান্নুদিদি বলল, জওহরলাল তথা কংগ্রেসী নেতাদের গদীতে বসাতে এরা গদী হারিয়েছে। দিল্লীর মূল্যবান গদীর তুলনায় এদের পর্ণকুটিরের গদীর মূল্য কিছুই নয়। তাই এদের কেউ সহানুভূতি জানায় না। এরা আজ কিন্তু রিফিউজি। এদের রিফিউজ করে যারা মসনদ দখল করেছে তারাই হল বড় দেশপ্রেমিক।

আমি বললাম, হুঁ।

এই সব মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারবে কি দিল্লীর বাদশাহরা? আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে।

আবার বললাম, হুঁ।

এই সব সুযোগসন্ধানী স্বার্থপরদের পরিণাম কি ভাল হবে কোন দিন?

তুমি দেখছি ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক। এদের পরিণাম কি হবে তা স্থির করবে দেশের লোক। এখনই আমরা কি করে মতামত দেব।

দেখ ননা, বর্তমানে আমাদের এই দেশের যারা নেতা, অর্থাৎ কংগ্রেস নেতা তাদের পরিবারের দিকে নজর দিলে একজনকেও পাবি না যারা সত্যকার দেশের জন্য কোন বৈপ্লবিক অবদান পেছনে রেখে এসেছে। যারা রাজনৈতিক কারণে কষ্ট স্বীকার করেছে তারাও বিলাসচঞ্চল জীবনে নিজেদের এমনভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে যার ফলে

আজ খদ্দরধারী লোকদের দেখলেই মনে হয় ওরা বিশ্বাসঘাতক কালোবাজারী এবং দেশদ্রোহী। কংগ্রেস পুঁজিবাদীদের তাঁবেদার হলেও এইসব তাঁবেদারদের একটা চরিত্র গড়ে তুলেছিল কংগ্রেসী নেতারা পরাধীন ভারতে। স্বাধীন ভারতে সেই চরিত্র হারিয়ে যে চরিত্রের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরছে, সে চরিত্র চরিত্র-হীনতারই নামান্তর। এদের হাতে দেশের সর্বনাশ অবধার্য এবং সেই সর্বনাশের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি।

কৃষ্ণনগরে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

গাড়ির ভীড় আরও বৃদ্ধি পেল। হাটুরে লোকের ভীড়। আজ বেলডাঙ্গার হাট। বরুয়াতে বাজার বসে। এদিকের সবচেয়ে বড় হাট। অধিকাংশ সেই হাটের যাত্রী।

বাজার বড় চড়া।

সবার মুখে একই কথা।

সামনের বছরে নির্বাচন।

বাজার দর আর নির্বাচন সবার আলোচ্য বিষয়। হাটুয়া লোকের মুখে বাজারের খবর। আর তথাকথিত ভদ্রলোকরা নির্বাচন নিয়ে মশগুল। আরেক দল লোক মেঝের ওপরে বসে, তাদের জীর্ণমলিন পরিধেয়, ততোধিক জীর্ণ তাদের দেহ, কোটরগত দৃষ্টি অবসাদে ম্রিয়মান।

আমরা ওদের আলোচনা শুনতে শুনতে চলছি।

পান্নুদিদি বলল, আমরা চরম অবস্থার সম্মুখীন। আরও বিপর্যয় সামনে। এই সমস্যা সমাধান করতে পারবে কি কংগ্রেস?

পারবে। পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজি সমর্থক রাষ্ট্র যে পথে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ভারতও সেই পথ অবলম্বন করবে। দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ-বিপর্যয় দেখা দিলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে বাস্তব অবস্থা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র নিয়ে যাবার যে চেষ্টা করা হয় এখানেও তা করা হবে। যখনই জনরোষ দেখা দিয়েছে, যখনই

জনতা বাস্তব দাবী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে তখনই দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা ভাষার দাঙ্গা অথবা প্রাদেশিক দাঙ্গা বেধেছে শাসকদের গোপন ইঙ্গিতে। সাময়িক ভাবে ক্ষমতাকে দখল রাখতে এইভাবে জনতার মূল সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবারও পুঁজিবাদীদের চিরাচরিত কোন ফন্দী অবলম্বন করা হবে। কিছু যদি খুঁজে না পায়, হাতের কাছে তো কাশ্মীর রয়েছে। কাশ্মীর সমস্যাকে আবার চাঙ্গা করে তুলবে। শুধু ভারতেই তো নয়, পাকিস্তানেও বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে, পাকিস্তান শাসকরাও এই রকম একটা ধান্দা সাদরে গ্রহণ করবে।

পানুদিদি চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমিও কোন কথা না বলে ট্রেনের মোবাইল দোকানদারদের কাছ থেকে বাদাম ভাজা কিনে চিবোতে থাকি। এক মুঠো পানুদিদির হাতে তুলে দিতেই পানুদিদি বলল, পথ চলার বড় সঙ্গী। মুখ বুঁজে তো পথ চলা যায় না।

বললাম, জানালা দিয়ে কি দেখছিলে?

খোলা আকাশ, সবুজ মাঠ-ঘাট বন-বাদাড়।

আর কিছু দেখতে পাও নি? যারা মাঠে কাজ করছে দেড়হাত নেংটি পড়ে। ছিন্নবসনা নারীরা কোনক্রমে লজ্জা নিবারণ করে খাল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে পরিবার পরিজনের জন্য। দেখতে পাওনি এই সব বিনা টিকিটের যাত্রীদের যাদের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয়চ্যুত হয়ে এসে কেমন হিন্দী গান গাইতে গাইতে বাংলার ঐতিহ্য শালীনতা ভুলে সম্মানীয় লোকের মুখে বিড়ির ধুঁয়া দিচ্ছে।

এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করিস কি? জানিস তো সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে কায়েম রাখতে হলে সবার আগে জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে হয়। সেই অধঃপতন ঘটছে, আরও ঘটবে। এটা সূচনা মাত্র। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্লেদ সঞ্চার করতে না পারলে কংগ্রেসের জমিদার জোতদার ও

পুঁজিবাদী তোষণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম থাকতে পারে না। যুবক-যুবতীদের নৈতিক মান জানিয়ে দেয় রাষ্ট্রের চরিত্র। এর মাশুল দেয় ভবিষ্যত বংশধররা। দুঃখ করিস না। বিষবৃক্ষ যারা রোপন করেছে তাদেরই বিষফল খেতে হবে। এর পরিণাম আজ হোক কাল হোক দেখতে পাবি।

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল।

রিক্সায় উঠলাম।

চল সৈদাবাদ।

খুঁজতে হয় নি রমাদের বাড়ি তবে রমাকে খুঁজে বের করতে সময় দরকার হয়েছিল।

তাকিয়ে দেখছিলাম রমাকে। ভাবছিলাম, একি! রমার নতুন জীবন প্রাপ্তির প্রথম দিনটি তার চোখে-মুখে কোথাও সামান্যতম আনন্দের রেখাপাত করেনি, কেমন একটা বিষাদ ও ক্লান্তি।

পানুদিদি জিজ্ঞেস করেছিল, একি রমা; তোমার চেহারায় বিষাদের ছাপ কেন?

রমা বলেছিল, কেমন একটা ভয়। প্রথম বয়সে দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছি, তারপর ভাবতে হয়েছে কি করে পরিবারকে রক্ষা করব। তারজন্য কর্মজীবনে নামতে হয়েছে। এবার এসেছে নিজের ঘর বাঁধার মুহূর্ত। এখন মনে হচ্ছে এই কঠিন কাজ করে উঠতে পারব কিনা। আজ যাকে ভাল মনে হবে কাল তাকে ভাল মনে না-ও হতে পারে, অথচ তার সঙ্গে বাস করতে হবে সারাটা জীবন। তাই কেমন একটা আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি তো অষ্টাদশী নই, সেজন্য জীবনের চাঞ্চল্যের চেয়ে অভিজ্ঞতাই বেশি আচ্ছন্ন করেছে।

পানুদিদি বলেছিল, বোঝাপড়াটাই বড় কথা। ওতে ভয় পেতে নেই।

তুমি তো বোঝাপড়া করতে পারনি দিদি!

পৃথিবীতে কোন 'এ' কখনও 'বি' হয়না রমা। আমি উদাহরণ দিতে পারি, তা বলে আদর্শ হব এমন কথা কেন মনে কর। উদাহরণটা বাস্তব, আদর্শের পরিপন্থীও তো হতে পারে।

রমা আরও কিছু প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু সেগুলো বড়ই অপ্রাসঙ্গিক এবং অতিরিক্ত পারিবারিক ও বৈষয়িক বিষয়।

পরের দিন সকাল বেলায় বিদায় নেবার সময় রমার সঙ্গে দেখা করে এলাম। কালকের সেই বিষণ্ণতার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। এমনি করে পানুদিদিকেও বিয়ের পরের দিন দেখেছিলাম। পানুদিদিকে মনোমোহনবাবুর কথা বলতেই ক্ষিপ্তের মত বলেছিল, একটা পশু।

কিন্তু রমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলতে না পারলেও তার নীরব চাহনি বলে দিয়েছিল, পশু নয়, তার প্রার্থিত বস্তুই সে লাভ করেছে। নর-নারী যে জীবন পেতে আগ্রহী সেই জীবন পেয়েছে রমা।

রাস্তায় এসে পানুদিদি বলল, রমা পর্ব শেষ।

তা বটে। জীবনের ছন্দপতন সব ক্ষেত্রেই ঘটে বিবাহ বন্ধনেই। তবে ব্যতিক্রমও আছে। তাতেও নতুন ছন্দবোধ জাগে।

জীবমাত্রেই এই ছন্দপতন চিরকাল সানন্দে গ্রহণ করে।

আমি হাসলাম। আমার এরকম ছন্দপতন ঘটেনি বলেই বোধহয় হাসতে পেরেছিলাম।

কলকাতার জীবনটা আর ভাল লাগছিল না। পনর-ষোল বছর আগের কলকাতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বাঙ্গালী মুসলমান পল্লীগুলো শূন্য হয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা। বাঙ্গালী-হিন্দুরা জীবনযুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, তারা প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল এই সব পরিত্যক্ত গৃহে কিন্তু বেশিদিন বাস করতে পারেনি। শহর কলকাতার বুক থেকে ধীরে ধীরে তারা

শহরতলীতে আশ্রয় নিচ্ছে। কুঁড়ে ঘর বেঁধে পেটের ধান্দায় ঘুরছে। শূন্যস্থান পূর্ণ করার যে সুযোগ পেয়েছিল বাঙ্গালী হিন্দুরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এদিকে জমায়েত হচ্ছে অ-বাঙ্গালীরা। তারা মেহনত করে হটিয়ে দিচ্ছে বাঙ্গালীদের।

শহরের পথে চলা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। রাতদিন জনতার স্রোত বেয়ে চলেছে। জঞ্জালের স্তূপ জমে উঠেছে পথে-ঘাটে। ফুটপাতে অসংখ্য নিরন্ন মানুষের ভীড়। সকাল হলেই তারা ভিক্ষাপাত্র হাতে করে ছুটছে দরজায় দরজায়। ট্রাম-বাসে ভর্তি লোক। ঝুলতে ঝুলতে লোক চলেছে গন্তব্যস্থলে-কর্মস্থলে।

মিছিল আর মিছিল।

চারিদিকে উত্তেজনা। কাজ দাও, খেতে দাও, বাঁচার মত মজুরী দাও।

ইতিমধ্যে খাদ্য আন্দোলন নিয়ে চরম গণ্ডগোল হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ জেলখানায় আটক হয়েছে।

সুপরিকল্পিতভাবে কেরলের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেস অনাচারের নিকৃষ্ট নিদর্শন স্থাপন করেছে, নিজেদের তৈরী সংবিধানের অবমাননা করেছে। পশ্চিমবাংলার খাদ্য আন্দোলন দমন করতে আশী জন বুভুক্ষু মানুষকে রাজভবনের সামনে পিটিয়ে মেরেছে সরকার। যে কংগ্রেসের নীতিতে এই সব কাণ্ড ঘটেছে সেই কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব তখন ছিল প্রধানমন্ত্রীর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর ওপর। পিতা ও পুত্রী ক্ষমতা কায়েম রাখতে একই পথে চলছে এবং সে পথকে অনেকেই নিন্দিত পথ বলেই মনে করছে।

ধীরে ধীরে ক্ষোভ জমেছে।

বছরের পর বছর কাটছে।

বিহারের অনাহারী মানুষরা ভীড় করছে কলকাতার ফুটপাতে। বিহারে খাদ্যাভাব। যারা আন্দোলন করতে নেমেছিল তাদের গুলী করা হয়েছে। মাদ্রাজে দ্রাবিড় আন্দোলন দানা বেঁধেছে, নতুন অন্ধ্র

গঠন করতে হয়েছে রামালুর আত্মত্যাগের পর। সর্বত্রই অশান্তি। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর নিজ রাজ্য উত্তর প্রদেশের দিকে দিকে অশান্তি। পানজাবে দানা বাঁধছে হিন্দী-অহিন্দীর ক্ষোভ।

কংগ্রেস এতকাল পুঁজিবাদী তোষণ করেছে। দেশের গরীব আরও গরীবই হয়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের দার্শনিক তথ্য শুনিয়েও সমস্যার সামান্যতম মীমাংসা হয়নি। বাজারে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব। খাদ্যে ঔষুধে ভেজাল। কলকাতার বাজারে তিনটাকা কেজি চাল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। ভারতের বড় বড় শহরে অভাবের কাতর আর্তনাদ। গ্রামের মানুষ শহরে ছুটছে।

ঠিক এই সময়।

পুরাতন পুঁজিবাদী কৌশলে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করল শাসকরা।

জুজু এসেছে।

সীমান্তে জুজু এসেছে।

পেছনে তাকিয়ে দেখল দেশের লোক।

তাইতো! তিব্বতকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ভারত স্বীকার করে নেবার পর হঠাৎ দলাইলামার প্রতি এত দরদ কেন জেগে উঠল? দলাইলামা কোটি কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিল কেন?

এ সব প্রশ্নের জবাব এখনও কেউ দেয়নি কিন্তু বান্দুং-এ বসে যে পঞ্চশীলের মন্ত্র জপ করেছিল ভারত ও চীন, যে মোলায়েম জিগীর শোনা গিয়েছিল, হিন্দী-চীন ভাই-ভাই, সে সব কোথায় ডুবে গেল! হঠাৎ চীনের সঙ্গে বৈরীভাব যেন চাঙ্গা দিয়ে উঠল।

দেশের অভ্যন্তরের সমস্যা মেটাতে না পেরে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র টেনে নিতে নতুন পাশার দান দিল রাষ্ট্র শাসকরা।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু হঠাৎ একদিন তারস্বরে দেশ-

বাসীকে জানিয়ে দিল, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীন ভারতের বৃহৎ ভূখণ্ড দখল করে রয়েছে।

পুঁজির দালাল সংবাদপত্রগুলোও তারস্বরে চিৎকার করে উঠল 'গেল গেল সব গেল।'

এমন একটি দিনে বসন্তলাল এল আমার মেসে।

দরজায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাকে অনুসন্ধান করছিল। মেসের ভৃত্য সংবাদ দিল, একজন বাবু গাড়ি করে এসে আমার খোঁজ করছে।

আমাকে খোঁজ করতে এসেছে মোটর আরোহী, নিশ্চয়ই গণ্যমান্য লোক। আঠার বছর এই মেসের জীবনে ট্যাক্সি করে অনেকে এসেছে, নিজস্ব গাড়ি চেপে কেউ তো আসেনি। সচকিতভাবে উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে দেখি বসন্তলাল।

বসন্তলাল আমাকে দেখেই বলল, তা হলে তুই এখানেই আছিস। চল আমার সঙ্গে।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অমন করছিস কেন? নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি, আমার আজ গৃহপ্রবেশ। তোকে নিতে এসেছি।

বিনা দ্বিধায় আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করতে হবে ভাই। আমার সময় হবে না।

যাবি আর আসবি; এতে আপত্তি কিসের। আমি-ই তোকে নামিয়ে দিয়ে যাব, বুঝলি।

বললাম, আমাকে রেহাই দাও ভাই। আমি অক্ষম।

বসন্তলাল কি মনে করল জানি না। ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বলল।

আমি নিজের কামরায় এসে শুয়ে পড়লাম। চোখের সামনে

ভেসে উঠল নৃপেনকাকার চেহারা। দেশত্যাগ করে নৃপেনকাকা যখন আশ্রয় নিয়েছিল নিজের সন্তানের ঘরে তখন তাকে আশ্রয় দেবার বদলে মা-বাবা, ভাই-বোনদের বিদায় করতে এই বসন্তলাল গিয়েছিল পানুদিদির কাছে। নৃপেনকাকার আত্মসম্মানবোধ ছিল বলেই সামান্য কিছু সঞ্চয়ের বিনিময়ে একটি আশ্রয় গড়ে নিয়ে শেয়ালদহ কোর্টে মোক্তারী করতে নেমেছিলেন। বার্ধক্যভারে ন্যুব্জ দেহ নিয়ে বহুদিন নৃপেনকাকাকে দেখেছি শেয়ালদহ কোর্টের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে। অভ্যাগতদের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন 'অ্যাফিডেভিট হবে'।

এই নৃপেনকাকার সুযোগ্যপুত্র হল বসন্তলাল।

নৃপেনকাকার মুখেই শুনেছি বসন্তলাল পিতৃঋণ শোধ করতে কোন একমাসে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়েছিল। সেই টাকা ফেরৎ দিয়ে নৃপেনকাকা আত্মবোধকে মর্যাদা দান করতে মোটেই ভুল করে নি। পানুদিদি আজ অবধি পিতার নৈতিক ঋণ শোধ করতে তার সামর্থ্য মত আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে। সুমন্তলাল কানপুরে চাকরি করে। সেও মাসে মাসে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দেয়।

বসন্তলাল বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে।

তার ঐশ্বর্য দেখাতে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। এমনই তার দম্ভ যার জন্য সে উঠে আসতে পারেনি আমার কামরা অবধি, মেসের চাকর দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

অথচ কি ছিল বসন্তলাল!

সুযোগ সুবিধা আমাদের দুজনের সামনেই ছিল প্রচুর অর্থ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের। উপার্জন ও সঞ্চয় অপরাধ নয় কিন্তু উপার্জন ও সঞ্চয় অপরাধকে ডেকে আনে। আর্থিক প্রাচুর্য বাহ্যিক যে জৌলুষ সৃষ্টি করে তা শুধু হৃদয়ের কালিমাকে গোপন করে। অতি সঞ্চয় পাপ গোপন করার পথ খুলে দেয়।

বিকেলবেলায় বসন্তলাল আবার এসেছিল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে

সোজা আমার ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় বলল, তুই আমাকে সহ্য করতে পারলি না। যাদের কিছু থাকে না হিংসা তাদের একমাত্র অস্ত্র। এই অস্ত্র ভোঁতা তা বোধহয় জানিস না।

আমাকে গালাগালি করতে এসেছিস বুঝি ?

ঠিক তা নয়। তবে তোর অক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি নি। সেটাই বলতে এসেছি।

আমার দুর্ভাগ্য। চা খাবি ?

না। আচ্ছা চলি।

বসন্তলাল পেছনে তাকাল না। তবে মূঢ়ের মত কঠিন আঘাত করতে এসে নিজেই যেন ধরাশায়ী হল। তার কণ্ঠে দম্ভের চেয়ে আর্তনাদ যেন বেশি শোনা গেল।

রেডিও খুলে দিলাম।

খবর শোনার কেমন একটা নেশা।

প্রথম খবর হল সীমান্ত বিরোধ। বিরোধ মীমাংসায় চীনের প্রধানমন্ত্রী আসছে দিল্লিতে।

কদিন পরেই জানা গেল সীমান্ত বিরোধ মিটাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আজ রবিবার। প্রতি রবিবার সকালে পানুদিদির বাড়ি যাওয়াটা নেশার মত পেয়ে বসেছে। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত দশটায় ফিরে আসি নিজের ডেরায়। আজও হাজির হলাম। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। পানুদিদির শোবার ঘরখানার চেহারা-ই বদল হয়েছে। সাজসজ্জা বাহুল্যপূর্ণ মনে হল।

আমার অবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পানুদিদি বলল, কি দেখছিস ?

তোমার ঘর দুয়ার দেখছি। বেশ সাজিয়েছ দেখছি।

মুচকি হেসে বলল, তোর ভাল লেগেছে ? না সাজিয়ে উপায় ছিল না। আজ আমার বর আসবে। তার জন্য ঘর সাজিয়েছি,

নিজেও সেজেছি। দেখতো, সেই যে বিয়ের কনে সেজেছিলাম তার চেয়ে ভাল সেজেছি কিনা?

বললাম, তুমি কখন যে কি কর আর কি বল তা জানি না, বুঝি না।

জানার দরকার নেই। বুঝবার চেষ্টা করিস না। যা দেখবার তা দেখ। প্রশ্ন করিস না।

বললাম, অগত্যা। তবে তোমার বর না দেখে আজ ফিরছি না। বসন্তলালের নতুন গৃহ দেখিনি, তোমার বর দেখব।

পান্নুদিদি কোন কথা না বলে ক্ষুদেকে ডেকে বাজারে পাঠাল।

আর খবর কি?—জিজ্ঞাসা করল পান্নুদিদি।

কিসের খবর?

চৌ-এন-লাই এল-গেল। এত বড় খবর অথচ বলছিস কিসের খবর।

নিরাসক্তভাবে বললাম, এবার ভারত সরকার সাময়িক অভ্যন্তরের বিক্ষোভ দমন করার পথ খুঁজছে। এটা তো পুরাণো খবর এবং ভেরি ভেরি ওল্ড ট্যাক্‌টিস্।

পান্নুদিদি পা ছড়িয়ে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই বলতে চাস এইভাবে সমস্যার সমাধান হবে।

হবে। তবে সাময়িক। জওহরলাল বলছে, ম্যাক্‌মেহান লাইন উভয় দেশের সীমান্ত। চীন বলছে, বৃটিশ সৃষ্ট ম্যাক্‌মেহান লাইনকে স্বীকার করি না। তরে আমরা ম্যাক্‌মেহান অতিক্রম করব না। অবশ্য চীন ম্যাক্‌মেহান লাইনকে স্বীকার করতে রাজি যদি ভারত আকসাই চীনকে চীনের অংশ বলে স্বীকার করে। ঘটনাটা পাকা-পাকি হবার উপক্রম হয়েছিল। জওহরলাল নিজেই বলেছিল, আকসাই চীন এমন একটা স্থান যেখানে এক গুচ্ছ তৃণও জন্মায় না। মোটামুটি জওহরলাল চীনের সঙ্গে মীমাংসায় রাজি ছিল।

তা হলে মীমাংসা হচ্ছে না কেন?

কারণ আমাদের আমেরিকার দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। আমেরিকার এই তো সুযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারলে চীনকে কোণঠাসা করা যাবে। এটাই আমেরিকা বিশ্বাস করে। আমেরিকা চায় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হোক। অশান্তি জিইয়ে রাখলে আমেরিকার দুনো লাভ। তাদের বড় শিল্প হল নরহত্যার অস্ত্র তৈরী, সেই ব্যবসা ফেঁপেফুলে উঠবে। আবার অনুন্নত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে উন্নয়নের নামে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে তার উৎপাদিত মালের উপনিবেশ তৈরী করতে পারবে। এদেশে আমেরিকার অর্থপুষ্ট বহু সংসদ সদস্য আছে। শোনা যায় কোন কোন মন্ত্রীও এর সঙ্গে জড়িত, এমন কি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারাও আমেরিকার তাঁবেদারী করছে। এরূপক্ষেত্রে আমেরিকান লবীর গোপন নির্দেশে প্রধান মন্ত্রীর সহচররা চীনের সঙ্গে মীমাংসা করতে দিচ্ছে না।

আমারও মনে হচ্ছে অনতিকাল বিলম্বে উভয় দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হবে। আমরা যে পুঁজিতোষণকারী রাষ্ট্র পত্তনের পদধ্বনি শুনেছিলাম তার বাস্তব চেহারা এবার আমরা দেখতে পাব।

আরও একটা গোপন সংবাদ হল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন হঠাৎ চীনের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ ঘটাতে রাজি নন। ঘটনার ওপর নজর রাখতে চায়। সংঘর্ষ অনিবার্য না হলে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন।

প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখছি চীন আমাদের অগ্রগামী ঘাঁটি আক্রমণ করছে।

এখানে বসে সে বিষয়ে স্থির কিছু বলা যায় না। চীনও বলছে ভারতীয় সেনারা ক্রমেই চীনের অভ্যন্তরে ঢুকে চীনা ঘাঁটি আক্রমণ করছে। তবে আমাদের দেশে যারা এই প্রচার করছে তারাও আমেরিকার অর্থপুষ্ট যে নয় এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। পত্রিকাগুলোর কোন কোন মালিক সাক্ষাৎভাবে আমেরিকার কাছ থেকে উৎকোচ পায় এমন অপবাদ বহুবার শোনা গেছে। সেজন্য

পুঁজিবাদীদের ভাগীদার সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশ সংবাদই মিথ্যা রটনা মাত্র। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন দলিল দস্তাবেজ দেখে নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা হয় তখনই জানা যাবে প্রকৃত ঘটনা, তার আগে নয়। জান তো পানুদি, যুদ্ধে সবার আগে প্রাণ হারায় সত্য, সততা, এবং নীতিবোধ।

পানুদি গম্ভীরভাবে বলল, তো.কে প্রো-চাইনিজ মনে হচ্ছে। ভারতের স্বার্থ সব চেয়ে বড়।

বললাম, তুমিও দেখছি সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী হয়েছ। এখনও সময় হয়নি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসার। অপেক্ষা করতে হবে পানুদি। ভারতের সমস্যা মেটাতে না পেরে জওহরলাল এই সংঘর্ষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যদি সংঘর্ষ হয় তাতে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও পুরাণো নীতি ও নৈতিকতার পুনঃ প্রবর্তন ঘটানো যাবে।

তুই কি বলিস এর প্রয়োজন নেই ?

জোর দিয়ে বললাম, প্রয়োজন আছে বিশেষ সময়ে। ওসব বাদ দাও। ক্ষুদে ফিরে এসেছে। এখনও তোমার বর আসে নি, কিন্তু বরের অপেক্ষা করতে চাইছে না পেট। উদরে কিছু না দিলে নীরস রাজনীতির কচকচানি ভাল লাগবে না। বর আসা পর্যন্ত ধৈর্য থাকবে না।

পানুদিদি ক্ষুদেকে খাবার ব্যবস্থা করতে বলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বিশেষ সময়ে প্রয়োজন কেন বলছিস ?

জানো পানুদি, জাতীয়তাবাদ ও নীতি-নৈতিকতা সমাজে এক এক সময়ে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার সেই জাতীয়তাবাদ ও নীতি-নৈতিকতা এক সময় সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখন সেই পচে যাওয়া জাতীয়তাবাদ ও নীতি-নৈতিকতা যারা আঁকড়ে ধরে তাদের মূল উদ্দেশ্য ফ্যাসীবাদ কায়েম করা। সেজন্য যার কোন সময় প্রয়োজন

ছিল তার প্রয়োজন পরবর্তীকালে ফুরিয়ে গেলে তাকে ত্যাগ করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় পুরাতনকে ভেঙ্গে সমাজের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে হয়। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যে ফরাসীরা শুনিয়েছিল তারা পরিবর্তনকে স্বীকার করতে পারেনি, ফলে সেই দেশেই পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নিয়েছিল। উপনিবেশ নিয়ে তারাই লড়াই করেছে শতাধিক বার।

পানুদিদি সামগ্রিক ভাবে আমার মতকে সমর্থন জানাতে পারেনি। অন্যান্য বিষয়ে দ্বিমত না হলেও চীনের দাবীকে মোটেই মানতে রাজী হয় নি। চীন যে ভারতীয় ঘাঁটি আক্রমণ করছে এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

আমি জানি, কেউ উনিশ কেউ বিশ। উভয় পক্ষই এই কাজ করছে। কোন পক্ষই প্রকৃত সত্য ঘটনা বলছে না।

সবাইকে অবাক করল জওহরলালের ঘোষণা। সিংহল যাত্রার পূর্বক্ষণে পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করলেন, চীনাদের হটিয়ে দেবার জন্য আমাদের সৈন্যদলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল।

ঘোষণার ফলে সীমান্ত কতটা বিপদমুক্ত হয়েছিল তা জানা গেছে পরবর্তীকালে কিন্তু সদ্য সদ্য ফললাভ হল, চীনা বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠা, দেশের অভ্যন্তরে যারা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের আন্দোলন করছিল তাদের চীনা কম্যুনিষ্ট অপবাদ দিয়ে গ্রেপ্তার করা, চীনের যে সব সম্পদ ছিল তা আটক করা। জরুরী অবস্থার প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখলাম।

কিন্তু চীনা সৈন্যদের হটিয়ে দেবার পরিবর্তে ভারতীয় সৈন্যরা হটে আসতে থাকে। চীনা সৈন্যরা বমডিলায় থেমে গেল। এক তরফা ঘোষণায় চীনারা দখলীকৃত এলাকা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হল, শত শত সৈন্য প্রাণ হারাল। একজন চীনা সৈন্যকেও বন্দী করতে পারল না ভারতীয় জওয়ানরা।

দেশের মানুষ তিন টাকা কে-জি চালের মূল্য সাময়িক ভাবে ভুলে গেল। জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারে যুক্তি বুদ্ধি সব কিন্তু চাপা পড়ে গেল। যারা সীমান্ত সমস্যা মীমাংসার জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল, মার্কিন উৎকোচভোগী সংবাদপত্র সমূহ তাদের দেশদ্রোহী, চীনাদের দালাল, চীনাদের চর ইত্যাদি ইত্যাদি সুমধুর বিশেষণ দিয়ে বিভূষিত করতে থাকে।

চীনের ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হল।

তদন্ত কমিটি বসল, কে অথবা কাহারা এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেয়ে চীনের দালালী করছে। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বের হল না। দুর্জনেরা (?) বলছে, শাসক গোষ্ঠীরই বহুজন চীনের টাকা পকেটস্থ করছে। সে জন্য রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি।

চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী হাজির হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত সরকার সম্মত হলেই চীনে বোমা বর্ষণ করবে। এসব ঘটনা পাকাপোক্ত হাবার আগেই চীনারা এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ফিরে গেল ম্যাক্‌মেহান লাইনের ওপারে।

পানুদিদি এসব ঘটনা নিয়ে কয়েক দিন বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল। আমিও সভয়ে লক্ষ্য করছিলাম যুদ্ধের গতি। বিশেষ করে তেজপুরের ঘটনা লক্ষ্য করে বেশ শঙ্কিত হয়েছিলাম।

যুদ্ধ থামল।

যুদ্ধবন্দী বিনিময় হল।

কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্ট অপবাদ যাদের কপালে এঁটে দেওয়া হয়েছিল সেইসব বন্দীরা আটক রইল কারাগারে। বিচিত্র জরুরী অবস্থা, বিচিত্র তার প্রয়োগ।

পানুদিদিকে বলেছিলাম, দেখলে তো। দেশের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করল সরকার। বিহার-মাদ্রাজ-পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর প্রদেশ যখন উত্তাল তখন চীনা যুদ্ধের অজুহাতে এমন জাতীয়তাবোধের জন্ম দিল

শাসকরা যার ফলে আন্দোলনকারীরা ঘরছাড়া হল আর সাধারণ মানুষ ভুলে গেল পেটের খিদে। বুর্জোয়া দেশের শাসকশ্রেণী যখন অন্য কোন একটি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন তারা স্বভাবতই দেশের স্বার্থে এবং নিরাপত্তার অজুহাত তুলেই ঐ কাজে প্রবৃত্ত হয়। দেশপ্রেমের বুলির আড়ালে তারা তাদের কাজ হাসিল করতে চায়। এই যুদ্ধ যে দুরভিসন্ধিমূলক নয় সেটাই বা কি করে বলবে। আমি যুদ্ধকে সমর্থন করি কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে, এই যুদ্ধ শুধু বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে নয়, এই যুদ্ধ দেশরক্ষার প্রয়োজনে অথবা দেশের অন্য কোন প্রয়োজনে।

পানুদিদি চিন্তিত ভাবে বলল, আমরা কোথায় যে যাচ্ছি তা আজও বুঝতে পারছি না।

অঘটনের পথে। রক্তপাত, সমাজবিরোধী কাজ, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অনাচার ইত্যাদি যত পাপ আছে সমাজজীবনে সেই পথে এগিয়ে চলেছি পানুদি। আমরা এই নিকৃষ্ট রাজনীতি থেকে অব্যাহতি পাব এমন আশা খুবই কম।

দিল্লির শূন্য মসনদ পূর্ণ করল লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

জওহরলাল সোনার ভারত গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তামাসায় পরিণত হল। সোনার ভারত জওহরলালের পনরবছর রাজত্বকালে পরিণত হয়েছে ভিখারী ভারতে। পুঁজিস্বার্থ রক্ষা করতে জওহরলাল প্রবর্তন করলেন মিশ্র অর্থনীতি, সংবিধান জারী করে কায়েমী স্বার্থকে নিরাপদ করে গেলেন। দেশের মানুষ বুঝবার আগেই নিজের ঘর গুছিয়ে রেখে গেলেন। ধনীর ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে, গরীব আরও গরীব হচ্ছে। এই অনপণেয় কালিমাকে সাময়িক চাপা দিতে চীন-ভারত বৈরিতা কিছুটা কাজ করলেও যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাও বুঝল, কোথায় যেন গলদ থেকে গেছে, নইলে নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে এভাবে কাজিয়া হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

লালবাহাদুর নিরাপদে সিংহাসনে বসতে পারলেন না।

অভ্যন্তরের কোন সমস্যাই বিগত পনর ষোল বছর সমাধান তো হয়-ই নি উপরন্তু সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। চারিদিকে বিক্ষোভ অসন্তোষ।

ওদিকে পাকিস্তানেও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেও বেকার সমস্যা গুরুতর। আহার্যের অভাব, খরা, বন্যায় দেশের মানুষ উৎক্ষিপ্ত। উপরন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানীরা সব সময় জানিয়ে দিচ্ছে পূর্ববাংলার মুসলমানরা মোটেই শরীয়ত অনুসারে মুসলমান নয়, এবং পশ্চিম-পাকিস্তানীরা রুলিং ক্লাশ ও পূর্বপাকিস্তানীরা শাসিত শ্রেণী। এর ফলে উভয় অংশের মধ্যে রেষারেষি ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানে না আছে সমাজতন্ত্র, না আছে গণতন্ত্র, না আছে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা। সামরিক শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। সামরিক শাসন প্রবর্তন করে গেছে মীরজাফরের উত্তর পুরুষ এস্কান্দার মির্জা, তারই বিষফল ভক্ষণ করছে দেশের নিরীহ সরল সহজ মানুষরা। চারিদিকে অসন্তোষ। যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন, পুঁজিবাদী শাসন ও সামরিক শাসনের ফর্মুলা এক। দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি-অসন্তোষ দেখা দিলেই জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র টেনে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয় সাময়িকভাবে গণ অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করতে।

চীন-ভারত বৈরিতার সুযোগ নিতে পাকিস্তান কাশ্মীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সরাসরি কিছু না করে গোপনে হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীরের ভারতীয় এলাকায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার দুষ্টবুদ্ধিকে কাজে লাগাল। পাকিস্তানী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হল কাশ্মীরের সমস্যা। কাশ্মীর পাকিস্তানের চাই। দেশের মানুষকে তপ্ত করে তোলার এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করল পাকিস্তানী জঙ্গীবাজরা।

ভারত ও পাকিস্তানের একই সমস্যা। সমাধানের কোন পথ

নেই। পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের সমস্যা সমাধান করতে মাঝে মাঝে হিন্দু বিতাড়ন করেছে। হিন্দুর সম্পদ লুট করবার অবাধ সুযোগ দিয়েছে। এই ভাবে জনসাধারণের ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমাধান তো চিরকাল হয় না। ভারতও একই পথ অবলম্বন করে অভ্যন্তরের সমস্যা মেটাতে চেয়েছে, তাতে ভাত-কাপড়ের সমস্যা সমাধান তো চিরকাল হয় না।

এবার উভয় পক্ষ নেমে পড়ল 'রণং-দেহি' মূর্তিতে।

কাশ্মীর দখল করবে পাকিস্তান, ভারত বাধা দেবে। পাকিস্তান সামগ্রিকভাবে কিন্তু ভারতের শত্রু নয়, ভারতও সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের শত্রু নয়। তাই যুদ্ধটা সীমাবদ্ধ রইল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কোন উপদ্রব নেই।

এমন তুরীয় ভাব কেন ধারণ করল উভয় পক্ষ? তা হলে এই যুদ্ধ কিসের স্বার্থে এবং কেন?

চিরকাল যা হয়ে থাকে এবারও তাই হল। যুদ্ধ বিরতি হল। যে যার জায়গায় ফিরে গেল। উভয় পক্ষের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হল, সম্পদহানি হল, বহু অমূল্য জীবনহানি হল। পর্বত মুষিক প্রসব করল। মুষিক নিজ বিবরে আবার স্থান নিল।

রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটল।

তাসখণ্ডে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর দেহত্যাগ করলেন।

চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি সালে এত ঘটনা ঘটিয়েও অভ্যন্তরের বিক্ষোভ স্থায়ীভাবে রোধ করতে পারল না শাসকরা।

এখান থেকেই আরম্ভ হল ভারতের দুর্ভাগ্য সৃষ্টির নতুন অধ্যায়।

গদীতে বসল ইন্দিরা গান্ধী। দাবীদার ছিল মোরারজী দেশাই। অনেক কষ্টে আপোস মীমাংসায় মোরারজী হল উপ-প্রধানমন্ত্রী।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রীসভায় ইন্দিরা ছিল তথ্য ও বেতার

মন্ত্রী। এবার ভারত প্রশাসনের একচেটিয়া অধিকার পেয়ে ইন্দিরা তার ভবিষ্যত দাবীদারদের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ আরম্ভ করল। মিথ্যাচার ও অপরাজনীতির খেলোয়াড় হিসেবে ইন্দিরা যে অতুলনীয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল ধীরে ধীরে।

ছেষট্টি সালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে এবং মূল্যবৃদ্ধির দরুণ গোটা দেশেই অশান্তি ও বিক্ষোভ। সেই অশান্তি ও বিক্ষোভ রোধ করার কোন পথ না পেয়ে বন্দুকবাজি শুরু করল প্রশাসকরা। তারই হুবহু চিত্র এখনও জানা যায়নি তবুও বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ, পশ্চিমবাংলা ও কেরলে পুলিস অবস্থা আয়ত্বে আনতে হাঁপিয়ে উঠল। কোথাও কোথাও সামরিক বাহিনীকে ডেকে পাঠানো হল জনতার ক্ষোভকে দমন করতে।

এই সময় সাক্ষাৎ পেলাম বসন্তলালের।

আজকাল বসন্তলাল মোটামুটি একজন নেতা।

ভারতবর্ষে নেতা হতে যে কয়েকটি গুণ দরকার সেই সবই বসন্ত-লালের আছে। তার অর্থ আছে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার মত বাক্‌চাতুর্য আছে, পাড়ার মস্তানদের দরাজ হতে চাঁদা দিয়েও থাকে, পূজা কমিটির উৎসাহী সভাপতিও। দল রাখার জন্য অর্থ ব্যয়ের উদারতা আর তথাকথিত নেতাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করার মত পরিবেশ আছে। অতএব বসন্তলাল যে নেতা হবে এটা মোটেই আশ্চর্য কিছু নয়।

বসন্তলাল গাড়িতে করে কোন সভা থেকে আসছিল। রাস্তায় ভুখা মিছিলে গাড়ি বন্ধ। আমিও পদাশ্রয়ী পথিক। ভীড় এড়িয়ে চলছি। এমন সময় নাম ধরে ডাকতেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বসন্তলাল গাড়ির ভেতর থেকে আমাকে ডাকছে।

জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস?

মেসে ফিরছি।

আয় গাড়িতে।

লাভ নেই। তোর গাড়ির চাকা ঘুরতে না ঘুরতেই আমি পৌঁছে যাব পদাশ্রয় করে।

কি ডিসটার্বেন্স দেখতো। আরে বাপু মিছিল করলে চাল-কেরোসিন পাওয়া যায়!

কি জানি।

শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস বইতে তো পড়েছিস, বাঁধানো দাঁত দিয়ে খিচুঁনি দেওয়া যায় কামড়ানো যায় না। এরা খিচুঁনি দিচ্ছে কামড়াবার মুরোদ নেই। এতে কোন ফল হয় না।

বললাম, বিপ্রদাস যা বলেছিলেন তা কিন্তু সত্য প্রমাণিত হয়নি। বিপ্রদাস দেখতে ভুল করেছিলেন। আসল দাঁতকে বাঁধানো দাঁত মনে করেছিলেন।

তুই বলতে চাস এইভাবে ভারতের অন্ন সমস্যা মিটবে?

জানিনা। এটা সমস্যা মেটাবার দাবী। দাবী মিটলে সমস্যাও মিটবে।

কিন্তু কম্যুনিষ্টরা শহর জীবনকে যেভাবে অতিষ্ঠ করেছে তাতে ওদের প্রতি কারও কোন সিমপ্যাথী নেই।

য়্যাপাথী তো আছে। যার বিরুদ্ধাচরণ আমরা করি ব্যক্তিস্বার্থে তারাই শেকড় গাড়ে। এটা হেঁয়ালী নয়।

বসন্তলাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কত শেকড় গাড়তে পারে দেখা যাবে।

বললাম, বিপক্ষকে কাবু করতে সব সময়ই চেষ্টা করে ক্ষমতাসীনরা। ওদিয়ে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাদের নিন্দা করি, যাদের ছোট মনে করি তারা নিন্দার পাত্র কিনা, ঘৃণার পাত্র কিনা তার বিচারক কিন্তু আমরা নই। ওই ওরা যারা লাইনবন্দী হয়ে মিছিলে শ্লোগান দিচ্ছে তারাই বিচারক। আমাদের মতো বাবুদের সিমপ্যাথীকে ওরা মূল্যবান মনে করে না। যারা উঁচু আসনে

বসে ওদের এতকাল ঠকিয়ে এসেছে, তাদের ওরা ধীরে ধীরে চিনতে শিখেছে। ওদের সম্বন্ধে যুক্তিহীন কোন ধারণা মনে রাখলে আমাদের ভুল হবে।

দেশে খাবার নেই। মিছিল করলে আকাশ থেকে খাবার আসবে কি ?

এই সহজ সরল কথাটা ওরাও জানে। আরও একটু বেশি জানে, দেশে খাবার আছে। মজুতদারদের ঘরে আছে। সেটা আদায় করতে পারেনি সরকার শুধুমাত্র ভোটের ধান্দায়। ওরা আদায় করতে বাধ্য করতে চায় সরকারকে। গণতন্ত্র সম্মত অধিকার আদায় করতে চায়।

বসন্তলাল আরও বলতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, অন্যদিন কথা হবে এখন চলি।

আমি আর পেছন ফিরে বসন্তলালের মুখ দেখিনি। তবে সে মোটেই খুশী হল না তা বুঝতে কষ্ট হয় নি।

মেসে ফিরেই দেখি নীরেশ এসেছে তার স্ত্রীকে নিয়ে।

নীরেশকে যত সরেস মনে করি তার স্ত্রী সেই অনুপাতে আটপৌরে। নীরেশ চাকরি পেয়েছে কয়েক বছর আগে। তার নিত্যকার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে চাকরিটা মোটামুটি চলনসই।

তোমার কাছে এলাম ননা।

হঠাৎ এবং এত বছর পর ?

আমার শ্যালক সমস্যা। ঘণ্টা কয়েক আগে বসিরহাট থেকে এসেছি। সমস্যা বসিরহাট নিয়ে। সেখানে পুলিশ ভুখা মিছিলে গুলী চালিয়েছে। আমার শ্যালক অনুপমের বাঁ হাতে গুলী লেগেছে। পালিয়ে এসেছে কলকাতায়। হাসপাতালে যেতে পারেনি, গেলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে।

বললাম, ও কি মিছিলে ছিল ?

অনুপম বলছে ছিলনা ; দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

হেসে বললাম, মজা দেখছিল এবার মজা বুঝবে। কি করতে হবে বলতো ?

অপারেশনের ব্যবস্থা করে গুলী বের করতে হবে। তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

সেও তো হাসপাতাল। হাসপাতালে গেলেই পুলিশে খবর দেবেই। আইন।

হতাশ ভাবে নীরেশ বলল, তা হলে কি হবে। আমার শ্রীমতী যে সেই থেকে কাঁদছে।

আমি কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললাম ; অনুপম কোথায় আছে ?

আমার বাড়িতে।

তাকে আমার এখানে নিয়ে এস, দেখি কি করা যায়। তাড়াতাড়ি। আজ আর অফিস হবেনা দেখছি। যাও নীরো, তাড়াতাড়ি এস।

অনুপমকে নিয়ে ট্যাক্সি করে গেলাম পানুদিদির বাসায়। বাসায় ক্ষুদে সংসারের কাজ করছে। পানুদিদি ডিউটিতে গেছে। অনুপমকে বসিয়ে রেখে গেলাম হাসপাতালে। অনেক কষ্টে পানুদিদিকে খুঁজে বের করে সব ঘটনা বললাম।

তাইতো রে, কঠিন সমস্যা। বলে পানুদিদি উদাসভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, আমিও জানি কঠিন সমস্যা। সমাধানের একটা পথ খুঁজতে হবে।

আচ্ছা ঠিক আছে। ডাক্তার চাকলদারকে বলে দেখি। সেই যে ডাক্তার, যে দাঙ্গার সময় সপরিবারে আমার বাসায় এসেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে দেখি। সেদিনের সেই সাহায্যের বিনিময়টা আজ যদি আদায় করতে পারি। তুই বাসায় যা, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। যদি কেউ কিছু নাও করে, এতো মাইনর অপারেশন। আরেক জন নার্সকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আমিই ছুরি চালিয়ে দেব।

তুমি পারবে ?

আশা করছি। আজ অবধি কয়েক হাজার অপারেশন য়্যাটেণ্ড করেছি। কিছু অভিজ্ঞতা তো রয়েছে। একা একাজ করা যায় না তাই একজন জুনিয়র বাধ্যানুগত নার্সকে খুঁজে নিতে হবে। তুই যা।

দুপুর বেলায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পান্নুদি একজন নার্স সঙ্গে করে এল। বেশ নিপুণতা সহকারে হাত থেকে বুলেট বের করে ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

এতক্ষণে কথা বলার সময় পেলাম।

ডাক্তার চাকলাদার এল না ?

না। ভয় পেল। কোন হাঙ্গামায় যদি জড়াতে হয়। মধ্যবিত্ত আত্মসর্বস্ব মানুষের যে চরিত্র তার বাইরে কি ওরা যেতে পারে।

কিন্তু যেদিন মুসলমানদের হাতে প্রাণ ও সম্মান নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল সেদিন তুমি-ই তো আশ্রয় দিয়েছিলে।

এটা মিথ্যা নয়। মানুষ ওসব কথা ভুলে যায়। আজকের ইমোশ্যন কালকে কি থাকে রে। কৃতজ্ঞতাবোধ ? সেটাও আপেক্ষিক। সঙ্গে সঙ্গে আদায় করতে পারলে আদায় হয়। একটু বিলম্ব হলেই মানুষ কৃতজ্ঞতাবোধ ভুলে যায়। বিশেষ করে আমরা যে শ্রেণীর প্রতিনিধি সে শ্রেণীতে কৃতজ্ঞতাবোধটা আভিধানিক একটি শব্দ। সন্তান পিতামাতাকে খেতে দেয়না এটা তো জানিস। যে দেশে অর্থের পরিমাপে মানুষের নীতিজ্ঞানের বিচার হয় সে দেশে ডাক্তার চাকলাদার একজন সদাশয় স্বাভাবিক সামাজিক জীব।

অনুযোগের সুরে বললাম, তবুও তো একটা মানবতাবোধ আছে।

পান্নুদিদি হাসল।

সেদিন হাসির অর্থ না বুঝলেও পরবর্তীকালে পান্নুদিদি বলেছিল, এই সব শ্রেণীর লোক অর্থের জন্য না পারে এমন কাজ নেই। শহরে অনেক নার্সিং-হোম দেখতে তো পাস। এদের বেশির ভাগই হল

ম্যাটারনিটি। গলিতে ঘুপচিতে ম্যাটারনিটি নার্সিং-হোমে গর্ভবতী রুগীরা আসে অথচ তারা ফিরে যায় শূন্য কোলে। এগুলির মালিকরা ডাক্তার নয়, কিন্তু ভাড়াটিয়া ডাক্তাররা মালিকের এই অপকার্যে সাহায্য করে এবং জারজ সন্তানের দায় থেকে মাকে ও সমাজকে রক্ষা করে। এটাই যদি সম্ভব হয় তা হলে মানবতাবোধ নিয়ে মাথা ঘামাস কেন। এসব কাজে পুলিশ-শাসক বাধা দেয় না। দু একজন ডাক্তার বিপন্ন না হয় এমন নয় কিন্তু তার সংখ্যা অণু-কণার মত।

এর প্রতিবিধান কি নেই?

না নেই। সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলতে না পারলে এতো সামান্য পাপ, আরও ভয়ঙ্কর পাপের সম্মুখীন হতে হবে। এরজন্য যা প্রয়োজন তা হল বিপ্লব। সেই প্রস্তুতি ও সংগঠন ভারতে নেই। কমিউনিস্ট পার্টি একবার বিপ্লবের ধ্বনি তুলেছিল। তার পরিণাম যে কি হয়েছে তাতো জানিস। নেতৃত্বে দুর্বলতা ও অসারতা তাদের টেনে নিয়ে গেছে পার্লামেণ্টারী পলিটিক্সে। অর্থাৎ ভোটের জোরে ওরা দেশ দখল করবে। এরকম বাতুলতা মার্কস ও লেলিনবাদ বিরোধী।

কিন্তু লেলিনও তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ সময়ে যেটা সার্থক হয়েছে সেটা সব অবস্থায় ও সব সময়ে সার্থক নাও হতে পারে। আর প্রয়োগক্ষেত্র বিবেচনা করতে হয়। যেসব তরুণ তাজা মানুষ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে তারা হয়েছে ভোটের ক্যানভাসার আর বিপ্লব এখন দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছেছে। ভারতে ওদের বিপ্লব অভিধানিক একটা শব্দ মাত্র। তবে যদি নেতাদের নেতৃত্ব বজায় রেখে এবং তাদের গায়ে আঁচড়টি না লেগে বিপ্লব ঘটে তাতে অবশ্য কেউ আপত্তি করবে না। পৃথিবীর কোন দেশেই ভোটের বাক্স বিপ্লব আনেনি, আনতেও পারেনি।

ভোটের বাক্সের ভরসায় যারা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে তাদের আহাম্মুক বলা যায় অতি সহজ কথায়।

অনুপমের অপারেশনের পরের দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বসিরহাট ও বাদুড়িয়ার ঘটনা অনেকের মনেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সবাই বলে যত অশান্তি নাকি সৃষ্টি হয় কলকাতায়। এবার কলকাতায় কোন গোলযোগ নেই; গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে গ্রাম্য এলাকায়।

গ্রামের অশান্তি দমন যত কঠিন শহরের অশান্তি দমন তত কঠিন নয়। শহরে কায়েমী স্বার্থের আত্মসর্বস্ব লোক, তাদের পাশাপাশি বসবাসকারী ছন্নছাড়া বুভুক্ষু মানুষ যদি আন্দোলনে এগিয়ে যায় তাদের ওপর একদিকে শাসকরা চাপ দেয়, অপরদিকে স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীও চাপ দেয় যার ফলে শহরের অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করা সহজ হয় কিন্তু গ্রামের অসন্তোষ দমন করতে রাষ্ট্রের যে শক্তি প্রয়োজন তা সব সময় হাতের কাছে থাকেনা। গ্রামই হল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র।

পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় জনতার অসন্তোষ দমন করতে সামরিক শক্তি সর্ব দেশেই প্রয়োগ করে আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটবে না। ক্ষমতা হারাবার আশঙ্কায় ওরা পশুপর্যায়ে নামতেও হয়ত দ্বিধা করবে না। জনমতকে দমন করার প্রথম উপায় হল ভাল ভাল পথঘাট তৈরী করে দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। সে কার্যটি আমাদের দেশে যথেষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। গ্রাম্য এলাকার অশান্তি দমন করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। পশুশক্তি সহজেই পৌঁছে যাবে বিক্ষোভ ক্ষেত্রে।

কদিন যেতে না যেতেই কৃষ্ণনগরে হাঙ্গামা। বলতে গেলে কৃষ্ণনগরে কয়েকদিন কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাই ছিলনা। সামরিক বাহিনীকে পাঠাতে হল রাষ্ট্রশক্তিকে কায়েম করতে।

জনতা তখন নেতৃত্ববিহীনভাবে নিজের পথে চলছে।

পশ্চিম বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আরও কিছু-

কাল বজায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা কি হত তা অনুমান সাপেক্ষ কিন্তু শাসকরা যখন জনসাধারণকে বাগ মানাতে পারছিল না তখন যেসব প্রথম শ্রেণীর নেতা জেলে আটক ছিল তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নেতাদের মুক্তি দিল। এরা সেই সব আদ্দির পান্‌জাবীধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি নেতা। এরা জনসাধারণকে দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার না করে জনরোষকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য বাণী আর বিবৃতি দিতে আরম্ভ করল।

বহুলোক প্রাণ দিল খাদ্যের দাবী জানাতে কিন্তু খাদ্য-সমস্যা সমাধান হয়েছিল কি? জোতদার জমিদারদের ঘর থেকে চোরাই মজুত মাল উদ্ধার করে দেশের লোকের ক্ষুধা মিটিয়ে ছিল কি? প্রথম শ্রেণীর নেতারা যে ফতোয়া দিল তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নেতারা কাজে প্রয়োগ করল। এই তিন শ্রেণীর নেতারা জানে রাজনৈতিক দল তাদের জমিদারী। পাইক বরকন্দাজদের সংযত করে রাখতে পারলেই জমিদারীর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে। অতএব, ঘরে ফিরে যাও সুবোধ বালকের দল। আমরা নেতারা সব সমস্যার সমাধান করব। তোমাদের কিছু করার নেই।

ওরা বলল, এইতো বিপ্লবের সূচনা।

শাসকরা শঙ্কিত হল।

চিন্তাশীল লোকেরা বলল, বিপ্লবকে প্রতারিত করা হল।

সামনে নির্বাচন।

এবার লড়াই জমেছে ভাল।

কিন্তু যারা বামপন্থী বলে দাবী জানায় তারা কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না? কেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোটের লড়াইতে নামতে পারছেনা?

অনেক প্রশ্ন।

সে সব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে।

হঠাৎ রাজনৈতিক গগনে দেখা দিল অজয় মুখার্জি এবং প্রফুল্ল ঘোষ। এরা কংগ্রেস বিরোধী। অবাক হয়ে বোকা লোকে ভাবছে এও কি সম্ভব!

অনেকে ভাবল, যাই হোক অজয় মুখুজ্যে আর প্রফুল্ল ঘোষের মত ত্যাগী দেশপ্রেমিকরা যখন কংগ্রেস বিরোধী তখন কংগ্রেস এবার নির্মূল হবে।

কেউ কেউ বলল, তাই তো হে, এযে সোনার পাথরের বাটি। কংগ্রেস চিরকাল কংগ্রেস। সে কংগ্রেস বাংগ্রেস অথবা ইংগ্রেসই হোক চরিত্র তাদের একই। পালক গায়ে জড়ালে কাক যেমন ময়ূর হয় না, এও যেন তাই।

আবার অন্য লোকে বলল, অশুভের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অশুভ আঁতাতে কোন কালেই ফল ভাল হয় না। দুঃসময় আমাদের সামনে।

যারা নিরাসক্ত এবং রাজনীতির কচকচানি বোঝে না অথবা বুঝতে চায় না তারা পঞ্চমুখ হল এইসব নেতাদের গুণগান করতে। বিশ্লেষণ করে দেখল না, কেন এই অশুভ আঁতাত। বামপন্থীরা ক্ষমতা চায় ঠিকই কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের কেন কাছে ডেকে নিল। যাদের মনে এই প্রশ্ন তাদের বলা হল, কংগ্রেস হল দেশের শত্রু। কংগ্রেসকে বিতাড়িত করতে প্রয়োজন হলে যে কোন দলের সঙ্গে যে কোন দল আঁতাত সৃষ্টি করবে, সেটাই করা হয়েছে।

মার্কসবাদ যারা হজম করতে পারেনি তারা বলল, মহানায়ক লেলিন নাকি এই উপদেশ দিয়েছেন।

আমাদের মত যারা বোকা লোক তারা কংগ্রেস বিরোধী দুটো ফ্রন্ট দেখে আরও আতঙ্কিত হল। তারা গোপনে বলতে থাকে, যদি কংগ্রেস বিতাড়ণ তোমাদের কাজ হয় তা হলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন কাজ করতে পার না।

যারা প্রকাশ্যে এই সব কথা বলল, তাদের বলা হল দালাল। এদলের অথবা ওদলের অথবা কংগ্রেসের দালাল।

একে অপরের ওপর নিজের মতামত চালিয়ে দিতে চায়। শক্তিমানরা চিরদিনই চেয়ে আসছে তুনিয়ার সব মানুষকে একমতের মুখোস পরিয়ে ঐক্যবদ্ধ করবেন, সবাই এক ধরণে চলবে, একভাবে উঠবে বসবে, কাজ করবে। একই বুলি আউড়িয়ে তারা হবে খাঁটি দেশের মানুষ। অনেক নরহত্যা করে অনেক ধর্মকথা বলে কোন মহাবীর অথবা মহাপুরুষ এই কল্পনাকে সফল মূর্তিতে রূপায়িত করতে পারেননি। কারণ, মানুষই একমাত্র জীব যে অতীতের পুনরুক্তি নয়, বর্তমানের কাঠামোতে ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে চায় এবং যে চিরকাল অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, কখনও বা অতীতকে মুছে ফেলতে বিপ্লবী হয়েছে।

এই সত্যকে যারা অস্বীকার করে তারাই নৃত্য করেছিল অজয় মুখুজ্যে আর প্রফুল্ল ঘোষকে পেয়ে। তারা বিস্মৃত হয়েছিল ওরা রাজনীতির ফসিল। ওদের দিয়ে আলমারী সাজানো যায়, ওদের দিয়ে সম্মুখগতিকে পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, ওদের নিয়ে হয়তবা রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আঁচড় কাটা যায়, কিন্তু সামনে এগোনো যায় না। যারা সামনে এগিয়েছে তাদের পেছনে টেনে আনতে ওরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মানুষের ভবিষ্যতকে গলাটিপে মারতে পারে।

আশাবাদী মানুষ চেয়ে রইল এই অশুভ আঁতাতের দিকে।

একদিন ভোটের বাক্স পরাজিত করল কংগ্রেসকে।

পরাজিত কংগ্রেস বিবরে প্রবেশ করল।

কেউ কেউ বলল, ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকার সময় চক্রান্ত করে জবরদস্তি কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকারকে উনষাট সালে উৎখাত করেছিল, এখন সেই ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সর্বপ্রকার চক্রান্ত করে কংগ্রেস বিরোধী কোন

সরকার গঠন হলে তাকেও উৎখাত করবেই। সাধু সাবধান! সরকার যেন কংগ্রেস বিরোধীরা পরিচালনা না করে সেদিকে ইন্দিরার তীক্ষ্ণ নজর থাকবেই।

ক্ষমতার লোভ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তার নজীর খুঁজতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাতে হয়। যে দুটো ভিন্ন মোর্চা নির্বাচনের সময় এক হতে পারেনি কংগ্রেস পরাজিত হইতেই রাতারাতি সব পার্থক্য ভুলে সরকার গঠনে তৎপর হল।

আদর্শ ?—বড় আদর্শ ক্ষমতালাভ। সবাই সে পথে পা বাড়াল। ভেবেও দেখল না অসম চিন্তার মানুষরা কখনও যুক্ত থাকতে পারেনা। পিতা-পুত্র এবং স্বামী-স্ত্রী অসম চিন্তার বাহক হলে সেখানেও বিচ্ছেদ ঘটে। আর লোভনীয় গদীর লোভে আরও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এটা তো নতুন কোন ঘটনা ময়।

কম্যুনিষ্ট চিন্তার বাহক যারা তারা কেন ভুলে গেল, পৃথিবীর কোন দেশেই বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী পথে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম হয়নি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যারা এই স্বপ্ন দেখে, বামপন্থী সুলভ গালভরা স্লোগান ও প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের ভ্রান্তি অমার্জনীয়।

ময়দানের মিটিং-এ গিয়েছিলাম।

বসন্তলাল এবার আইন সভার সদস্য হয়েছে। সভার উদ্যোক্তাদের অন্যতম বসন্তলাল। সত্য সরকারও এবার আইন সভার সদস্য। ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না পরিণতিটা কি।

ময়দানের মিটিং-এ নতুন মুখ্যমন্ত্রী জনতার দুঃখ মোচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন। আমি আত্মহত্যা করব তবুও কংগ্রেসে কখনও যোগ দেবনা। আরও বললেন, আমরা যদি ভুল করি তা হলে জনসাধারণ আমাদের চাবুক মেরে ভুল শুধরে যেন দেন। আমরা বার বার জনতার সামনে আসব। আমাদের বক্তব্য রাখব।

নতুন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ বললেন, ষোল আউন্স খাদ্য সবাইকে

দেবেন। ডিম দেবেন, মাছ দেবেন। দুধ ঘিয়ের নদীতে সাঁতরে যাবার ফতোয়াও যেন দিলেন।

কংগ্রেসের পতনে সাধারণ মানুষ খুশী।

ঘুম নেই দিল্লীর বাদশাহদের আর তাদের অনুচর বিবরবাসী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদের।

মিটিং থেকে সোজা গেলাম পানুদিদির বাসায়।

পানুদিদি আমাকে দেখেই বলল, তোর জন্যই অপেক্ষা করছি। এত দেরী করলি কেন?

বললাম, রাস্তা জ্যাম্। ময়দান আজ লোকে লোকারণ্য। পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ ভেঙ্গে পড়েছে ময়দানে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাতে।

পানুদিদি গম্ভীরভাবে বলল, সব দলের নেতারা বেশ গালভরা বক্তৃতা দিল, তাই না রে?

সে তো বটেই। কি ভাবছ পানুদিদি?

আরেকটা সর্বনাশের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। এরা কারা? ভিন্ন আদর্শের মানুষ। একদল স্বীয় স্বার্থহানি ঘটতেই কংগ্রেস ছেড়েছে আরেক দল নিজেদের সর্বহারার প্রতিনিধি বলে দাবী করে। এদের সংঘাতে সর্বহারার অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। সর্বহারার অগ্রগতি অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ভেতর দিয়েই হয়। সেই সর্বহারাকে ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে আপোস করতে দেখলে ভয় হয় ননা।

আমি পানুদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওসব কথা থাক। এবার কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে বল।

তা বলছি। জানিস ননা, সর্বহারার আন্দোলনই প্রভূত পরিমান সংখ্যাগুরুর আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন এবং প্রভূত পরিমান সংখ্যাগুরু মানুষের স্বার্থেই আন্দোলন। সেই আন্দোলন থেকে অনেক পিছিয়ে পড়বে মানুষ। আমার এই আশঙ্কা বাস্তব হবে, দেখে নিস।

বললাম, এখনই মতামত দেবার সময় হয়েছে কি ?

নিশ্চয়। রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। কতকগুলো অবস্থা লক্ষ্য করেই তো মতামতে উপস্থিত হওয়া যায়। ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঠেলে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত বর্তমান সংবিধানের কাঠামোতে মাথা মুড়িয়ে দেশের কোন উপকার এরা করতে পারবেনা। সংবিধান প্রণেতারা কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্যই সংবিধান প্রণয়ন করেছে। সেজন্য প্রগতিশীল কোন কাজই এরা করতে পারবেনা। উপরন্তু এই সরকারকে আঘাত করতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার না দেবে টাকা, না দেবে খাদ্য। ভারতের সংবিধান সব ক্ষমতা তুলে দিয়েছে কেন্দ্রের হাতে। যা ছিটেফোঁটা আছে প্রদেশে তা দিয়ে একমাত্র লাঠিপেটা করানো যায় নিরীহ মানুষদের আর ব্যক্তিস্বার্থে অর্থ তছরূপ করে পকেট ভর্তি করা যায়। এমতক্ষেত্রে কি আশা করিস ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পানুদিদি উঠে গেল খাবার আনতে।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কদিন আগের রাতের চেহারা। রাস্তার আলোগুলোতে লাল কাগজ মুড়ে দিয়ে "লাল জমানা" এসেছে তারই বিজয় উৎসবে মত্ত তরুণদের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আশ্চর্য হয়ে ভাবছি মূর্খতার একটা মাত্রা আছে। শহরের এই উৎসবে যারা মেতেছে তারা ভুলে গেছে শহরের মানুষ অধিকাংশই কায়েমী স্বার্থের তল্পীদার। এই সব মানুষ জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলে। জোয়ারের আবর্জনা চিনে নেবার ক্ষমতা এদের থাকে না। এই জোয়ারের উল্টো পথে চলার মত সংগ্রামশীল মন এদের নেই, যে কারণে নির্ভুল পথ এরা খুঁজে পায় না।

আরও ভাবছিলাম, বিগত বিশ বছরের ঘটনাগুলো।

আঘাত এসেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ভাষা সংস্কৃতির আঘাতে বাংলার নিজস্ব ভাবধারা বিনিষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। আচার-আচরণে দেখা দিয়েছে নীতিহীনতা। মানবতাবোধ রুদ্ধশ্বাস হয়েছে

ব্যক্তিগত লাভলোকসানের খতিয়ান তৈরী করতে। ভাষা, সাহিত্য, চিন্তায় এসে গেছে জড়তা, নীচতা, নোংরামি।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সারল্য, সততা, পবিত্রতার নামগন্ধ নেই। চৌকিদার থেকে মুখ্য প্রশাসক পর্যন্ত কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছেনা তারা দুর্নীতি আর অপবিত্রতাকে পরিহার করে চলতে পারছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শুধু ভাঙ্গন। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ভেঙ্গে সারা ভারতে অঙ্গ-বঙ্গ নানা রঙ্গ বুকে এঁকে কংগ্রেসের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিষ্ট পার্টিও ভাঙ্গছে। জাতীয়তাবাদীর ধুয়া ধরে পলাতকের দল শোধনবাদকে সর্বস্ব করে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট হয়েছে, আরেকটি মার্কসবাদের সাইনবোর্ড কপালে এঁটে নতুন করে খাঁটি কম্যুনিষ্ট হবার জিগীর দিচ্ছে।

শ্রমিক এলাকায় অর্থনীতিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা না দিয়ে তাদের শেখানো হয়েছে ধর্মঘট করলে আংশিক অর্থনৈতিকলাভ হয়। যার প্রতিক্রিয়াতে শ্রমিকরা দ্বিধাগ্রস্থ ও বিভ্রান্ত, দল-উপদলের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে।

কৃষকরা কৃষির উন্নতি কেবলমাত্র চায় না, তারা চায় কৃষকের অধিকার। সেদিকে বিশবছরে কংগ্রেস একবারও নজর দেয়নি। যারা ক্ষেত মজুর তারা কংগ্রেসী অভিধানে কৃষক নয়। যারা জোতদার-মজুতদার তারাই কৃষক, তাদের জন্যই কৃষির উন্নতি ঘটাতে চায় কংগ্রেস, কৃষকের উন্নতি চায় না।

নিম্নমধ্যবিত্ত মেহনতী বুদ্ধিজীবিরা মনে মনে অসন্তুষ্ট। তারা সুযোগ খুঁজছে। জোয়ারে গা ভাসিয়ে আখের গোছাবার চেষ্টায় থাকে। সবচেয়ে নীতিহীনতা প্রবেশ করেছে এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ে। এরাই দুর্নীতি ঘটায়, দুর্নীতিকে স্থায়িত্ব দান করে। বুদ্ধি যাদের জীবিকা তাদের কাছে মহান আদর্শ আশা করা বাতুলতা।

আমলাদের সর্বশ্রেণীতে দুর্নীতি।

এদের পরিচালকরা অসত্যভাষণে পটু, দুর্নীতির শেকলে বাঁধা।

এই চরম অবস্থার মাঝে কংগ্রেসের পতনকে নির্যাতিত মানুষরা আশীর্বাদ মনে করেছিল। এই সব সাধারণ মানুষ রাজনীতি বোঝে না, বোঝে তাদের বাস্তব অবস্থা। তারা আশা করছে,-এবার তাদের দুঃখ রজনীর অবসান ঘটতে পারে

পানুদিদি খাবার হাতে করে এসে বলল, কি ভাবছিস?

ভাবছি আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। এর শেষ কোথায় তাও ভাবছি। -

পানুদিদি হাসতে হাসতে বলল, ভাববার সময় এখনও হয়নি। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করেছিলাম। না করেও তো উপায় নেই।

যুক্তফ্রন্ট ধরাশায়ী হল।

বাংলা কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যরা রং বদল করল। কংগ্রেসী চক্রান্ত সার্থক হল। তথাকথিত কংগ্রেস বিরোধী প্রফুল্ল ঘোষকে সামনে রেখে কংগ্রেসীরা রাজ্যপাল ধর্মবীরকে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী-সভাকে শরশয্যায় শায়িত করল।

অজয়বাবু কেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ?

ইমেজ। জনসাধারণের সামনে অজয়বাবুর অজেয় ইমেজ। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে কি ডাকা যায়!

অজয়বাবু মরশুমী পাখী। যেখানে আহার্য ও নীড় গড়ার সুযোগ সেইখানেই তাকে পাওয়া সম্ভব। তার দলে যারা জুটেছিল তারা ভাগ্যান্বেষী। কংগ্রেসী চক্রে স্থান করতে না পেয়ে অজয়বাবুর পেছনে এসেছিল ভাগ্য গড়তে। রাজনৈতিক কোন চরিত্র তাদের ছিল কি!

এসব অবান্তর প্রশ্ন। ঘটনা চিরকাল ঘটনা।

বাধ সাধল মার্কসবাদীর জঙ্গী অনুচররা। তারা হিসাবে কিছু ভুল করে ফেলল। তারা মনে করেছিল, যেহেতু মার্কসবাদীরা

ক্ষমতায় অংশীদার হয়েছে, তাই রাতারাতি পশ্চিমবাংলায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে। যেমন ভুল করেছিল লাইট-পোস্টের বাল্বে লাল কাগজ মুড়ে তেমনি ভুল করল এরা। মূল কথা বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের তৈরী সংবিধান হল অতি সাংঘাতিক অস্ত্র যা দিয়ে প্রতিক্রিয়া কায়েম হয়। প্রগতির পথ হয় কণ্টকাকীর্ণ। যারা মাঠে-ময়দানে 'বিপ্লব' বলে চিৎকার করেছে তারা সংবিধানের খপ্পরে পা দিয়েই বুঝতে পারল তাদের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ। তাদের যে কোন প্রগতিমূলক সমাজতান্ত্রিক মনোভাব থাকুক এই সংবিধান তাদের কোন কাজই করতে দেবে না। একমাত্র কাজ হল পুঁজি-তোষণের পথ উন্মুক্ত রাখা। যারা মনে করেছিল, কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হলে দেশে রাতারাতি সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, সর্বহারাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা নৈরাশ্যবোধ করতে থাকে।

ভারতের বড় সমস্যা হল ভূমি সমস্যা।

প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকে ভূমি শ্রেণী বিশেষের অধিকারে রয়েছে। কৃষক ও শ্রমিকদের কোন অধিকার কোন দিনই স্বীকার করেনি কোন শাসক, কংগ্রেস তাদের উত্তর পুরুষ। জোতদার ও জমিদারদের স্বার্থহানি ঘটাতে সাহস পায়নি শাসকরা। ভূমিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে আধুনিক উপায়ে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের কোন চেষ্টাই হয়নি।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

কেন করা হয়নি ?

তাতে কৃষি নির্ভরশীলদের মাঝে বেকার সমস্যা দেখা দেবে। সেই সব বেকারদের কর্মসংস্থান করার মত কোন শিল্প গড়ে তোলা হয়নি।

কেন শিল্প গড়ে তোলা হয়নি ?

এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থহানি ঘটলে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার আশঙ্কা ষোল আনা।

তবুও জমিচোরদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা লাভ করতেই মার্কসবাদী ক্যাডাররা চোরাই জমি উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করতেই প্রথমেই বাধা পেল যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে। অথচ তারা আশা করেছিল ভূমি সমস্যা সমাধান হবে যুক্তফ্রন্টের প্রাথমিক কাজ। বিরোধের সূত্রপাত এইখানেই।

প্রশ্ন হল শান্তি-শৃঙ্খলা।

যারা চোর তাদের জন্য আইন নয়। যারা চোরের কাছ থেকে চুরি করা সম্পত্তি উদ্ধার করতে নামল তাদের জন্যই শান্তি আর শৃঙ্খলার প্রশ্ন। অন্তত অজয়বাবু সেটাই মনে করেন।

কারণ, এটাই তো সংবিধান।

ভোঁতা আইন দিয়ে চোর ধরার কোন উপায় নেই জেনেই সেই ভোঁতা আইনের আঘাতে যুক্তফ্রন্টকে শায়েস্তা করতে তৎপর হল কংগ্রেস।

পশ্চিমবাংলা তথা গোটা ভারতে রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের পত্তন হল এই যুক্তফ্রন্ট শাসন কালে।

বসন্তলাল উসখুস করছিল। আইন সভার সদস্য হওয়ার অর্থ হাত তোলা নয়, ভাগ্য তৈরী করা অথচ পারছেনা কম্যুনিষ্টদের বাগড়ায়। সব কিছুতেই ওদের বাড়াবাড়ি। কমিটি, সাব-কমিটি, কমিশন এই সব বসবে, তদন্ত কার্যের ফিরিস্তি হবে। লাইসেন্স-পারমিটের জিম্মাদারী পাবে, তা নয় শুকনো আড়াই'শ' টাকার চাকরি করতে পথে পথে ঘুরে লোকের পদে তৈল মর্দন করে ভোট সংগ্রহ করার মেহনতই পোষাচ্ছে না।

চৌরঙ্গীর বড় বাড়ি থেকে দূত আনাগোনা করছে। দল বদল স্থির, অপেক্ষা শুধু গ্রীন সিগন্যালের। শুধু 'হু' বলার অপেক্ষা।

এদিকে যখন চক্রান্ত চলছে তখন অন্যদিকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা গেল।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসী শাসন লোপ পাওয়ার অর্থ এটা নয় যে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু যারা ভোটের বাক্সকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বেদী মনে করে তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপরিপক্ক রাজনীতির খেলোয়াড়দের বিপন্ন করল।

উত্তরবঙ্গের অখ্যাত এলাকা নকশালবাড়ি।

ইংরেজ তার বণিক স্বার্থ প্রসার করতে নকশালবাড়ী এলাকায় চা বাগান স্থাপনের সনদ দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ প্ল্যান্টার্সদের। কিছু কিছু ভারতীয় ভাগ্যবানও এখানে চা বাগান স্থাপন করেছিল। যখন এই চা বাগান স্থাপন করা হয় তখন এই এলাকায় জন-বসতি কম ছিল। ইংরেজ এখানকার বাসিন্দা রাজবংশী পোলিয়া প্রভৃতি শ্রেণীর চাষীদের ভূমি জবরদখল করেছিল। যারা ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তাদের বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

চা বাগানের জন্য হাজার হাজার বিঘা জমি দখল করা হলেও চা চাষের জমি বাদেও উদ্বৃত্ত হাজার হাজার বিঘা জমি থেকে গেল বাগান মালিকদের। এই জমিতে কোন সত্ত্ব ছিলনা উদ্বাস্তু চাষীদের। এই সুযোগে চা বাগানের মালিকরা এই সব জমি বন্দোবস্ত দিল কতকগুলো জোতদারকে। যারা মূল চাষী তারা জমি পেল না। বিনা মূল্যের জমি বহু মূল্যে বন্দোবস্ত দিয়ে বাগানের মালিকরা লাভবান হল আর লাভবান হল অর্থশালী জোতদাররা। এই জোতদারদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। আর বাঙ্গালী উদ্বাস্তু চাষীরা পেটের দায়ে এই সব অবাঙ্গালী জোতদারদের ঘরে কাজ করে যা মজুরী পেত তা দিয়ে কোন ক্রমেই তাদের পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন দিতে পারত না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জনমত ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। তার মৃদু কম্পন

বন্দুকের মুখে স্তব্ধ করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। কংগ্রেসও একই ভাবে চাষীদের দাবী অগ্রাহ্য করেছে। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতালাভের পর বামপন্থীদের জঙ্গী অংশ জমি উদ্ধারে নামল।

তারই মূল পত্তন হল নকশালবাড়িতে।

বিপন্ন হল যুক্তফ্রন্টের বামপন্থী দলগুলো। বাংলা কংগ্রেসের মূখ্য ব্যক্তি এবং মূখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে নেপথ্যে বুঝানো হল, এটা সংবিধান বিরোধী এবং আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে। পুঁজিবাদীদের ভাড়াটিয়া তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ পুঁজি-স্বার্থ রক্ষার জেহাদ ঘোষণা করল। মিথ্যার পর মিথ্যা সংবাদ বিকৃতভাবে পরিবেশন করে বিভ্রান্ত করতে থাকে জনমত। এই সব দালালরা জানে, সাধারণ মানুষ রাজনীতি বোঝে না। বিভ্রান্ত করলে জনমত উল্টো পথ ধরবে।

নকশালবাড়ীতে পুলিশ গেল।

পুলিশের গুলীতে নারী-পুরুষ নিহত হল। গ্রেপ্তার হল অনেকে।

বামপন্থী দলের জঙ্গী অংশ মাথায় হাত দিয়ে বসল। তারা যুক্তফ্রন্টের অংশীদার বামপন্থী দলের কাছে গেল প্রতিকার চাইতে।

কিছু হলনা।

সংবিধান রাজ্য সরকারকে কোন ক্ষমতা দেয়নি এই সত্যটা কেউ বুঝলনা। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি আবার ভাঙ্গল। গড়ে উঠল নতুন দল, মার্কস-লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি; জনসাধারণের কাছে পরিচিত হল, নকশালপন্থী।

ওরা কি চায়?

মার্কস ও লেনিন যা নির্দেশ দিয়েছেন সেই পথে চলতে চায় কিন্তু বিভ্রাট দেখা দিল অন্যত্র। নকশালপন্থীদের সঙ্গে প্রথম বিরোধ দেখা দিল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির। নকশালপন্থীরা বলল, আমাদের দলের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং। মাও-এর শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা। কিন্তু মাও-সেতুং-এর শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে

ভুল করল। মাও বলেছেন, শত্রু ও মিত্রকে চিনে নেওয়া হ'ল বিপ্লবীদের কাজ। কিন্তু নকশালপন্থীরা কি চিনতে পেরেছিল কারা দেশের শত্রু এবং কারা তাদের বিপ্লবের বন্ধু? এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যার জন্য কার্য পদ্ধতিতে ভুলের পর ভুল হতে থাকে।

নকশালপন্থী আন্দোলন দানা বাধার আগেই যুক্তফ্রণ্ট ধরাশায়ী হল। প্রফুল্ল ঘোষ বসলেন মসনদে। কিন্তু থাকতে পারলেন না। যারা দল ভাঙ্গে তাদের ওপর আস্থা রেখে কোন রাজ্য চালানো যায় না সেটা বুঝতে প্রফুল্ল ঘোষের দেরী হল, কিন্তু কংগ্রেস স্বার্থ-সিদ্ধিতে এগিয়ে গেল সংবিধানকে অমর্যাদা করে দিল্লীর কংগ্রেসী বাদশাহরা নতুন খেলা দেখাল গোটা দেশকে। প্রফুল্ল ঘোষও ধরাশায়ী হলেন।

আবার নির্বাচন।

এবারও সেই একই ঘটনা। কংগ্রেস প্রায় নির্মূল। কংগ্রেসও ভাঙ্গল, জন্ম নিল আদি ও নব কংগ্রেস। কাজের সুযোগ সুবিধা ছিল যুক্তফ্রণ্টের সামনে কিন্তু কোন কাজ করতে পারলনা।

কেন? এই প্রশ্ন সবার সামনে।

এবার তেরটা মাস ক্ষমতায় থেকে ওরা কেন নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারেনি সেটাই সবার প্রশ্ন।

যে ভুল করেছিল বামপন্থীরা প্রথম যুক্তফ্রণ্ট গঠনে সেই ভুল আবার করল। আবার তারা অজয় মুখুজ্যেকে বসাল মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে। তারা ভুলে গেল মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা যা আছে তাতে যুক্ত-ফ্রণ্টের বামপন্থী কার্যক্রমকে এক নিমেষে চূর্ণ করে দিতে পারে। কিন্তু সাইনবোর্ডওলাদের দলে রাখতে দাদার দাবী আদায় করল ছোট ভাই। যুক্তফ্রণ্ট বিযুক্ত হল, কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় অজয় মুখুজ্যে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গেই দিলনা, নতুন নির্বাচনের অনুরোধ জানাল রাজ্য-পালকে। বামপন্থীদের কোন সুযোগ দিলনা নতুন সরকার গঠন করতে। জয়ী হল কংগ্রেস।

আমার বয়স কত হল জানিস ননা ?

জানি। হঠাৎ বয়সের চিন্তা কেন করছ পান্নুদি ?

পশ্চিমবাংলার সব মুখ্যমন্ত্রী তো ছিল চিরকুমার তাই ভাবছি। আমার মনে নৈরাশ্য বোধ জাগছে। তোরও তো জাগছে, ওদেরও নিশ্চয়ই জাগে।

প্রশাসন যারা চালায় তারা কিন্তু চিরকুমার নয়। সেজন্য নৈরাশ্যবোধ-সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রীদের সচেতক হল আমলারা। এর ফলে নৈরাশ্যবোধ অনেক হ্রাস পায়। তোমার বক্তব্যটা কি সেটাই বল।

বলছি।

পান্নুদিদি কথা বলার আগেই দরজায় ধাক্কা পড়ল।

পান্নুদিদি প্রশ্ন করলেন, কে ?

দরজাটা খুলুন ; আমরা বড় বিপন্ন। আমাদের বাঁচান।

ধরাস্ করে দরজা খুলে দিল পান্নুদিদি। বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলাম আমি।

একজন তরুণ, তার কাঁধে ভর দিয়ে আরেকজন রক্তাক্ত তরুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। পান্নুদিদিও অবাক হয়ে গেল।

তরুণ দুটি ঘরে ঢুকতেই পান্নুদিদি দরজা বন্ধ করে দিল। আমাদের উভয়ের চোখেই প্রশ্ন, কি ঘটেছে ?

সুস্থদেহী তরুণটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, পুলিশে গুলী করেছে। আমরা চেতলা থেকে আসছি। কোন রকমে অন্ধকারে পালিয়ে এসেছি। আমাদের বস্তি ঘেরাও করেছিল পুলিশ। বুঝলাম আমাদের গ্রেপ্তার করবে। তাতেই শেষ নয়, গুলী করে মারবে বন্দীশালায়। তাই পালাচ্ছিলাম। পেছন পেছন পুলিশ তেড়ে আসছিল আর গুলী করছিল। একটা গুলী বিমানের কোমরে লাগতেই বিমান মাটিতে পড়ে গেল। আমি পালালাম। ওরা

ভাবল, আমি পালিয়েছি। তা নয়। আমি দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম আমাদের গোপন আস্তানায়।

অবাক হয়ে শুনছিলাম ওর কথা।

পান্নুদিদি বলল, তারপর ?

আস্তানা থেকে চারটে বোমা নিয়ে আমিও আক্রমণ করলাম পুলিশকে। বোমা পর পর ছুটো ফাটাতেই পুলিশ পালাতে আরম্ভ করল। ভাড়াটে লোককে আঘাত করলেই পালাবে জানতাম।

বললাম, তোমার ভয় করল না ?

ভয় ? কেন ? বুকের রক্ত দিয়েই তো মানুষের মুক্তি আনতে হবে। যারা রক্ত দিতে পারবে না তারা অন্যায় অবিচারকে মেনে নিয়ে রাস্তার নেড়ী কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করবে, অনাহারে রোগে ভুগতে ভুগতে মরবে অথচ তারা প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসবে না। মৃত্যু তো হবেই। আজই হোক আর কালই হোক। মৃত্যুকে যারা ভয় পায় তারা কোন কাজই করতে পারে না।

পান্নুদিদি বলল, তুমি কেন উল্টে আক্রমণ করতে গেলে ?

আমার সহকর্মী আহত হয়ে মাটিতে শুয়ে, তাকে, ফেলে আসা আমার ধর্ম নয়। তাকে বাঁচাতে হবে মনে করেই পুলিশকে আক্রমণ করেছিলাম।

গুলীতে তোমার মৃত্যুও হতে পারত।

অসম্ভব নয়। বিমানকে মেঝেতে শুইয়ে দিচ্ছি। আঘাতটা গুরুতর মনে হচ্ছে।

পান্নুদিদি মাত্বর পেতে বিমানকে শুইয়ে দিতে দিতে বলল, চিকিৎসার দরকার। ডাক্তার কোথায় পাই।

ছেঁড়া ন্যাকড়া কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেই চলবে। একটু সুস্থ হলে আমাদের জানাশোনা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

পান্নুদিদিকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললাম, কাজটা কি ভাল

হবে। তুমি-আমি দুজনেই জড়িয়ে পড়ব। তার চেয়ে ওদের অন্য কোথাও যেতে বল।

গম্ভীরভাবে পান্নুদিদি বলল, না। বিপন্নকে আশ্রয় দিয়েছি। তার জাতগোত্র জানা আমাদের কাজ নয়। আমরা সেবার অধিকারী। এর জন্য লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য করতে রাজি।

কথা শেষ করেই পান্নুদিদি ক্ষুদেকে ডেকে বলল দুধ গরম করতে। নিজেও ওষুধ ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিমানের কাছে গিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল, বুলেট ভেতরে আছে। বুলেট বের করতে হবে। পারবে তুমি সহ্য করতে যদি আমি ছুরি চালাই?

বিমান প্রায় বেহুঁস।

তার মধ্যেই বলল, পারব। এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না মাসীমা। এখনও যে বিপ্লব সফল হয়নি।

পান্নুদিদি অপারেশন করার জোগাড় করে বলল, তুই একটু সাহয্য করবি। যেমন যেমন বলব তেমন তেমন ভাবে কাজ করবি।

বলা শেষ করেই নিপুণ হাতে ছুরি চালিয়ে পান্নুদিদি বুলেট বের করে ফেলল। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে বিমানকে শুইয়ে দিল।

অনেক রাত হয়েছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বারান্দায় মাদুর পেতে নিলাম। পান্নুদিদি পাশে এসে বসল।

বললাম, অসীম তোমার ক্ষমতা।

পান্নুদিদি হেসে বলল, এটা দু নম্বর। এর আগে একটা করেছি তাও তো জানিস।

ছেলেটা বাঁচবে কি?

বলা মুস্কিল। এখন পর্যন্ত আশা আছে।

মাসীমা।

কে? অরূপ। এস। কি খবর।

অরূপ পাশে বসল।

পানুদিদি বলল, কথা বলছনা কেন ?

ভাবছি মাসীমা।। আচ্ছা বলতে পারেন, আমরা দুসপ্তাহ বাড়িতে ছিলাম না। সবে আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে এসেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। আমরা বাড়ি পৌঁছবার এক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির। আমাদের সঙ্গে পাড়ার কারও দেখা হয়নি। দেখা হয়েছিল যাদের সঙ্গে তারা গোপণে আমাদের কাজ করে। অথচ পুলিশ সোজা এসে বাড়ি ঘেরাও করেছিল। কি করে সম্ভব হল ?

বললাম, পাড়ার লোকেরা নিশ্চয়ই ফোন করেছিল।

তা হতে পারে তবে এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় কেননা পাড়ার কোন লোকই দেখতে পায়নি।

পানুদিদি হেসে বলল, রবারের বেলুন ফুঁ দিলে বেশ ফেঁপে ফুলে ওঠে। কিন্তু তা ফটাস্ করে ফেটেও যায়। তোমরা হঠাৎ ফেঁপে ফুলে উঠেছ, তাই ফটাস্ করে ফাটছ ; কারণ তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকেছে। তারাই সংবাদ দিচ্ছে পুলিশকে। ইংরেজ তাড়াবার আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি পয়সার লোভে দলের লোকেরাই সহকর্মীদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এতো নতুন কিছু নয়।

অরূপ মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, তা হতে পারে। বিশ্বাস-ঘাতকতা নিশ্চয়ই করেছে কেউ। নিশ্চয়ই আমাদের দলের লোক।

পানুদিদি বলল, তোমাদের আদর্শ অনবদ্য, তোমাদের ত্যাগ চিরস্মরণীয় কিন্তু তোমাদের কর্মপদ্ধতি ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মনে করছি। তোমরা বিপ্লব ঘটাতে চাও কিন্তু বিপ্লব ঘটাবার আগেই তোমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নেমেছ। আমাদের দেশের মানুষ রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী, তারা তোমাদের কাজকে সমর্থন করবে কেন ? বিপ্লব হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারে। জনমত গঠন করার বদলে তোমরা জনমতকে বিরূপ করে তুলেছ।

তা হলে আমরা কি ভুল করছি ?

না। কর্মপদ্ধতি তোমাদের বদল করতে হবে। তোমাদের বিপ্লব চিন্তার কোথাও ভুল নেই।

কিন্তু শ'য়ে শ'য়ে তরুণকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আমাদের বিপ্লব-চিন্তা ব্যর্থ হবে মনে করেন কি ?

না। বিপ্লব চিন্তা কখনও বার্থ হয় না। বিপ্লবীর আত্মত্যাগ কখনও ব্যর্থ হয় না তবে তোমাদের কর্মপদ্ধতিটা সঠিক পথে চলেনি। তোমার মত লক্ষ লক্ষ অরূপ মরলেও বিপ্লবের গতি রুদ্ধ হয় না। বিপ্লব একটা বিজ্ঞান ; তার ব্যর্থতা অসম্ভব, সাময়িক তোমরা পিছিয়ে পড়বে সঠিক পথ নির্ণয় করতে পারনি সেজন্য। অবশ্য এটা আমার মত।

সঠিক পথ বলতে আপনি কি বলতে চান ?

আমি তো তোমাদের মত রাজনীতিতে পক্ক নই। তবে তোমাদের বিপ্লবীবাহিনী গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে নেতৃত্ব পেতে পার কিন্তু তারা সামগ্রিকভাবে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। তারা বিপ্লবের বন্ধু হবে তখনই যখন তারা বুঝবে ঘটনার গতি তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তোমরা বিপ্লব করতে চাও শহরে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শহর হল প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গ। এই দুর্গ ওভাবে ভাঙ্গা যায় না। তোমাদের স্লোগানও ভারতীয় চিন্তার বিরোধী। তোমরা বলছ, তোমরা মাওপন্থী অথচ মাও-য়ের শিক্ষা তোমরা গ্রহণ করনি। সেই কারণেই বলছি, সঠিক পথ বোধহয় নির্ণয় করতে পারেনি তোমাদের নেতারা। বিশেষ করে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসে কোন কালেই কোন মহৎ কাজ হয় না। আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, আরও স্বচ্ছ করতে হবে তোমাদের চিন্তাধারা। এসব আলোচনা থাক, তুমি যাও বিমানকে দেখ। যদি তাকে বাঁচাতে পারি তখন কথা হবে।

অরূপ উঠে যেতেই বললাম, যাই বল পানুদি ওরা কাপুরুষ নয়।

পানুদিদি মৃদু হেসে বলল, যারা এদের হত্যা করছে তারা

সুপুরুষ অথচ কাপুরুষ। বেশ সুপরিকল্পিত উপায়ে এদের হত্যা করা হচ্ছে। হত্যার পর বেশ শ্রুতিরোচক কৈফিয়তও দেওয়া হচ্ছে। এরপর মৃতদেহগুলো রাস্তাঘাটে পাওয়া যাবে, কে হত্যাকারী তা কেউ বলতে সাহস পাবে না। ইন্দিরা শঙ্কিত হয়েছে। পার্লামেণ্টে বলেছে, I will fight to finish, তারই দৃষ্টান্ত। অনেক রাত অবধি রাজভবনে বসে ইন্দিরা যেসব শলা পরামর্শ দিয়ে গেছে তারই এগুলো প্রত্যক্ষ ফল। যাদের ওরা কাজ দিতে পারিনা, এক মুঠো খেতে দিতে পারিনা, তাদের হত্যা করে ক্ষমতা দখলে রাখার কোন নৈতিক অধিকার কারও নেই অথচ তাই হচ্ছে শুধু ক্ষমতা কুক্ষিগত রেখে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে।

-কোন সভ্য সরকার কি এভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন ?

পারেন। সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে এ-ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করে ক্ষমতাসীনরা। সরকারের নিজস্ব একটা গোয়েন্দা সংস্থা আছে। তাদের নির্দেশে একদল জহ্লাদ তৈরী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই জহ্লাদদের প্রমোশন হবে। এরা পুরস্কৃত হবে। অবশ্য পরিণামে কি হবে তা বলা কঠিন, তবে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে এই সব জহ্লাদরা। দেশের মানুষ বড়ই অসহায় তারা আতঙ্কে কথা বলতে পারছে না কিন্তু পঞ্জীভূত ঘৃণা একদিন এইসব জহ্লাদ ও তাদের উপরওলাদের পুড়িয়ে নিঃশেষ করবে।

আমি ভাবছি অরূপের কথা। সহকর্মী আহত। তাকে উদ্ধার করতে এইভাবে নিজের জীবন যে বিপন্ন করতে পারে তার নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ওদের কাজকে সমর্থন করিনা কিন্তু ওদের মত তরুণদের এই নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ সত্যই ঐতিহাসিক ঘটনা। অপরে এদের ছোট ভাবলেও আমি কিন্তু ছোট ভাবছি না।

পানুদিদি বলল, সবই বুঝলাম কিন্তু কংগ্রেস এর সুযোগ নেবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে

তাদের এই সুযোগে নির্মূল করতেও পেছ পা হবে না। যারা কংগ্রেস বিরোধী তাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে নিজেদের বে-সরকারী গুণ্ডাবাহিনীকে; পুলিশ পেছনে থেকে এদের সাহায্য করবে যাতে কেউ প্রতিরোধ করতে না পারে। অত্যাচারিত মানুষ যখন পুলিশের কাছে যাবে আশ্রয় চাইতে তখন তারা আশ্রয় পাবে না। বরং সীমান্ত গান্ধীর ভাষায় এই আশ্রয়প্রার্থীদের ছুড়ে দেওয়া হবে নেকড়ের মুখে। এই ভয়াবহ অবস্থা প্রায় সমাগত।

বললাম, এটা কি সম্ভব? গণতান্ত্রিক দেশে এটা কি সম্ভব?

সম্ভব অথবা অসম্ভব তা বিচার হয় বাস্তব সঙ্গতিতে। বাস্তব ঘটনা অদূর ভবিষ্যতে এটাই প্রমাণ করবে। তখন তুই প্রশ্ন করবি, এটা সম্ভব হওয়া উচিত কি?

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

অরূপ বিমানকে নিয়ে চলে গেছে কদিন পরেই। কোথায় গেছে তা বলে যায়নি। যাবার সময় পানুদিদি বলেছিল, আমার কথা একটু ভেবে দেখ। জনসংগঠন হল বড় শক্তি। সেটার চেষ্টা করলে সব চেয়ে ভাল হয়।

অরূপ বলেছিল, সবাইকে স্বমতে আনা যায় কি?

না, যায় না। যারা শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত তাদের তো স্বমতে আনতে পার। ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক মতে মহান ধর্ম। অর্থাৎ দারিদ্র কায়েম রাখতে ধর্মের পরশ বুলিয়ে দিয়ে ভিক্ষুক তথা মানব-সমাজকে প্রতারণা করা হয়। ভিক্ষুককে যদি জানিয়ে দিতে পার কেন সে ভিক্ষা করে, তাকে যদি বুঝিয়ে দাও তারও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অধিকার আছে, তাদের যদি বিশ্বাস করাতে পার, ভিক্ষার চেয়েও মহৎ হল নিজের সত্তা বজায় রাখা, সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ শ্রেয়, তাহলে তোমাদের মিশন সফল হবেই। অর্থ নৈতিক দৈন্য চিরতরে তখনই দূর হতে পারে যখন নিপীড়িত মানুষকে অর্থ-নীতির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক চেতনা দান করতে পার। নইলে

সব পরিশ্রম পণ্ড হবেই হবে। সেই সব নীচের তলার মানুষের কাছে যাও। যারা মেহনত করে মজুরী পায় না বাঁচার মত, যারা ভূমিতে ক্রীতদাসের জীবন-যাপন করে তাদের কাছে যাও, তাদের সঙ্গে কাজ কর; তাদের একজন হও; তাদের সঙ্গে বাস কর; তাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নাও, তাদের কদন্ন জুটলে তা মুখে তুলে নাও। এইসব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হও।

অরূপ আর কোন কথা বলেনি। নীরবে এবং গোপণে বিমানকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

আমার সঙ্গে দেখা হতেই পানুদিদি বলল, কোনদিন বা ওদের অপঘাত মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে দেখতে পাব। আহা!

বললাম, ওদের মৃত্যু সংবাদ দেবার মত স্থান খবরের কাগজে নেই পানুদি। খবরের কাগজে মন্ত্রীদের হাঁচি-কাশির খবর থাকে, আর থাকে বিকৃত মিথ্যা সংবাদ যা দিয়ে লোক ঠকানো যায়। ওরা মরলে কেউ জানবে না। ওদের জন্য আজ যে তুমি 'আহা' বললে, এটাই ওদের প্রাপ্য সর্বশেষ 'আহা'। আর কেউ আহা বলবে না।

অরূপ ও বিমানের ঘটনা বিস্মৃতির অতলে চলে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে মনে হত তাদের কথা, তখনই মনে হত সত্য সরকারের কথা। কত পার্থক্য এই সব তরুণদের সঙ্গে সেদিনের তথাকথিত বিপ্লবীদের।

আবার সরকার ভেঙ্গে গেছে।

সত্য সরকারের উচ্চাশায় ছাই পড়েছে।

বয়সও বৃদ্ধি পেয়েছে তার। লোকমুখে শুনেছি সত্য সরকার নাকি আজকাল রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছে। ভাবলাম, দেশের লোক অন্তত একটা দুর্জনের হাত থেকে বেঁচেছে।

একদিন শুনলাম সত্য সরকার গুরুতর পীড়িত।

গেলাম দেখা করতে। দেখে এসে পানুদিদিকে বললাম, সত্য সরকারের প্যারালেসিস হয়েছে, বোধহয় বাঁচবে না।

পান্নুদিদি বলল, এত তাড়াতাড়ি সত্য সরকার মরতে পারে না। তার পাপের শাস্তি না নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে না।

সত্যিই অত তাড়াতাড়ি মৃত্যু তাকে ডেকে নেয়নি।

পান্নুদিদি বলেছিল, জানিস বিমলা আত্মহত্যা করেছিল। বিমলার প্রেতাত্মা সত্য সরকারের দেহটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কত মায়ের চোখে জল পড়েছে সত্য সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায়, সেই সব মায়ের অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। আরও দুর্গতি জমা আছে ওর জন্য।

কয়েক মাস পরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখলাম, প্রাক্তন বিপ্লবী ও প্রাক্তন আইন সভার সদস্য সত্য সরকার দেহত্যাগ করেছে। তার জীবনী ও প্রশস্তি প্রায় আধ কলম ভর্তি ছাপা হয়েছে।

মনে মনে হাসলাম।

মৃত্যুর সংবাদ শুনে পান্নুদিদি বলল, পৃথিবীতে ধর্ম নেই। এত তাড়াতাড়ি সত্য সরকারের মরা উচিত হয়নি।

তা প্রায় সাত মাস তো ভুগেছে।

সাত বছর ভোগা উচিত ছিল। পৃথিবী থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে রে, নইলে, যাক্।

সত্য সরকারের মৃত্যু বিরাট ঘটনা নয়। সত্য সরকার দল বদল করে মন্ত্রী হবার আশায় যাদের পেছনে পেছনে ঘুরেছে তারাও নিশ্চিন্ত। সত্য সরকার মরেনি, নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে রাজনীতির ডাস্টবিনে, সংবাদপত্রের প্রশস্তি অমর করতে পারেনি তাকে।

আবার নির্বাচন।

এইতো সেদিন ইন্দিরা গান্ধী বলল, নির্বাচন তো ছেলেখেলা নয়। সাতষট্টি, উনসত্তর আবার একাত্তর, তা হতে পারে না।

কিন্তু কোথাও সবুজ সঙ্কেত দেখেছে প্রধানমন্ত্রী নইলে হঠাৎ নির্বাচনের ফতোয়া জারী করতে পারত না। জয়ের আশা নিয়েই

কংগ্রেস নির্বাচনে নেমেছিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। কংগ্রেস এবারও পরাজিত হল। কিন্তু সরকার গঠন করল কংগ্রেস।

বামপন্থীরা দ্বিধা বিভক্ত।

বামপন্থীরা যাতে জয়লাভ করতে না পারে তার জন্য নানা অসদুপায় গ্রহণ করলেও কোন ফল হয়নি। এমন কি হেমন্তবাবুর মত নির্বিরোধী ব্যক্তিকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হল। কে ঘাতক তা স্থির হবার আগেই হত্যার পরেই রটনা হল মার্কসবাদীরাই ঘাতক। তবুও মার্কসবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংবিধানকে রম্ভা প্রদর্শন করে রাজ্যপাল কংগ্রেসকে ডাকলেন সরকার গঠন করতে। কায়েমীস্বার্থের তল্পীদাররা সমবেত হল কংগ্রেসের পাশে। জনসাধারণকে অবাক করে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সমর্থন জানাল কংগ্রেসকে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবার শুনতে পেল দুর্দিনের পদধ্বনি।

রাজনীতির দাবা খেলায় বড় খেলোয়াড় ইন্দিরা গান্ধী। সোভিয়েতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় তথাকথিত কম্যুনিষ্টদের আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে। এদের সঙ্গে যে মিতালি তার উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে খাঁটি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে দমন করা। দিল্লির জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে সোভিয়েতপন্থী কম্যুনিষ্টদের। তাদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা-প্রশাখায় তারই ছাপ স্পষ্ট। ফলে, সোভিয়েতপন্থী কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেসের ল্যাংবোট সেজে প্রগতিশীল সরকার গঠনে বাধা দিল। কংগ্রেস পেল তক্ত।

মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টরা এবার বোধহয় বুঝেছিল তাদের ভুল। যখন ইন্দিরার তক্ত-ই-তাউস নড়ে উঠেছিল কংগ্রেস বিভক্ত হতে তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মার্কসবাদীরা ইন্দিরাকে সমর্থন করেছিল। তারা বলেছিল, ইন্দিরার কংগ্রেস তবুও প্রগতিশীল, মোরারজি সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। রাজনীতির ব্যবসাদার হয়েও কংগ্রেসকে প্রগতিশীল মনে করা কত বড় ভুল তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল মার্কবাদীরা পরবর্তী ঘটনা ঘটতেই। মার্কসবাদীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সরকার

সরকার গড়তে পারেনি। কিছু নির্দলীয় সদস্য আর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সর্বাঙ্গীন সমর্থন জানালেও সোভিয়েতপন্থী কম্যুনিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক মুসলীমলীগ কংগ্রেসের খুঁটোতে গলার দড়ি আটকে রেখে পশ্চিম বাংলায় দুভার্গ্যের নতুন অধ্যায় পত্তন করল।

শোনা গেল "গরিবী হটাও" শ্লোগান।

আরও শোনা গেল, 'সমাজতন্ত্র আসছে আসবে'।

নতুন শ্লোগান "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র শান্তির পথে কায়েম কর"।

খুনের রাজনীতি নয়, আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে শান্তির রাজনীতি।

এরপর শোনা গেল, এক দল, এক নেতা, এক মত।

অবশেষে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হল, এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও। তারই পাশে আরও যাদের নামের পাশে "যুগ যুগ জিও" লেখা হল তাদের তালিকা মহাভারতে লেখার মত স্থান আর কেউ পেল না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই শ্লোগানে ধরাশায়ী হল বিরোধীরা। কংগ্রেস সব রাজ্যেই জয়লাভ করে দিল্লীর জৌলুষ বৃদ্ধি করল। শুধু-মাত্র পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় এই শ্লোগান দিয়ে কোন লাভ হল না।

ইতিমধ্যে ঘনঘটা দেখা দিল পূর্ব বাংলায়।

তারই ঢেউ এসে লাগল পশ্চিম বাংলায়। পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হতেই পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরা হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ল স্বাধিকারকে কবর দিতে।

অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে তখন বেনামী কংগ্রেসী শাসন। চার্জ দ্য আফেয়ারস দেশবন্ধুর দৌহিত্র সিদ্ধার্থশংকর রায়। কেন্দ্রের ইঙ্গিতে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রতিরোধ বাহিনী' নাম দিয়ে একদল বেতনভোগী জহ্লাদবাহিনী তৈরী হল, তাদের পেছনে দাঁড়াল সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি। পুলিশ এদের সামনে রেখে কার্য উদ্ধারে নামল। যেখানে জহ্লাদরা অসফল হচ্ছিল সেখানে পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে জহ্লাদের ভূমিকা নিতে মোটেই দ্বিধা করেনি।

পশ্চিমবাংলার তিন থেকে চার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ হারাল। এই সব নরহত্যার কোন তদন্ত হল না। ফয়সলা হল না, হত্যাকারীরা শাসকের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে রইল। বিশ হাজারের ওপর তরুণ-তরুণীকে বিনা বিচারে কারাগারে পাঠানো হল। গণতান্ত্রিক রাজনীতির কবর খোঁড়া হতে থাকে ধীরে ধীরে। এই অন্যায় কাজকে সমর্থন করতে পুঁজির তল্পীবাহক তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও সরকারী বেতার পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। প্রতিবাদ জানাবার সাহস কারও নেই, সবার মনে আতঙ্ক। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে অথবা অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ করতে গেলে নিজের গলা কাটা যাবে এ ভয় সবারই।

এই অবস্থার মধ্যে পূর্ব বাংলায় অশান্ত যুদ্ধ।

পূর্ব বাংলার যুদ্ধ স্বাধিকার লাভের যুদ্ধ। এই স্বাধিকার লাভকে সবাই সমর্থন করল। ভারতের মানুষ অর্থবিত্ত দিয়ে সাহায্য করল।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খান লড়াই জানে, রাজনীতি জানেনা। তাই প্রথম পদক্ষেপেই বিরাট ভুল করল। ভুট্টোর প্ররোচনায় এহিয়া খানের স্বাধিকার আন্দোলন দমনের রক্তাক্ত পথ গোটা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক চিত্র দিল বদল করে।

পূর্ব বাংলা তখন পূর্ব পাকিস্তান।

অভ্যন্তরের বিরোধ দমনের অধিকার আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে স্বীকৃত অধিকার। অপর রাষ্ট্র এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে না।

পাকিস্তানী হামলা আরম্ভ হতেই দলে দলে মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এপারে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসামে প্রবেশ করতে থাকে।

এরা কারা?

এদের শতকরা আশীজনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাঁতের মাকুর মত এরা হাঙ্গামা হলেই ছিট্‌কে আসে ভারতে, আবার হাঙ্গামা বন্ধ হলেই ওরা ফিরে যায় নিজেদের ঘরে। কিন্তু শতকরা বিশজন যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের। এরা তো কখনও আসেনি। এরা এবং

এদের মুরুব্বারাই তো পাকিস্তান হাসেল করতে জান-মাল কোরবান করেছিল। এরা সীমান্ত পেরিয়ে এল কেন? বিশেষ করে তাদের প্রায় সবাইয়ের কপালে রাজনীতির সাইনবোর্ড। এরা এহিয়া বিরোধী আওয়ামী লীগের সদস্য, অনুচর, সমর্থক। এদের বিনা বাধায় কেন প্রবেশ করতে দিল ভারত সরকার!

তা হলে এটা কি পূর্ব পরিকল্পিত?

দলিল-দস্তাবেজ প্রয়োজন নেই, সাধারণ বুদ্ধিতেই মানুষ বুঝল, নেপথ্যচক্র ভারতের হাতে। অনেক উদ্দেশ্যের অন্যতম হল ক্ষমতাসীন ইন্দিরার ইমেজ অক্ষয় করা।

গরিবী হটাতে না পারলেও নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে ইন্দিরা জনমনকে ঠেলে দিল পূর্ব বাংলার সমস্যার দিকে।

অপর উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলা স্বাধিকারলাভ করলে রাজনীতি ও সামরিক দিক থেকে ভারতের প্রভূত লাভ।

উৎফুল্ল হল পুঁজিবাদী পুঁজির দালালরা।

স্বাধিকারপ্রাপ্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কারণে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হলেই ভুঁড়িওলাদের 'নাফা' ফেঁপেফুলে উঠবে, শোষণের অন্য একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে।

অনেক দিন কালীঘাটে যাওয়া হয়নি।

আজকাল মাঝে মাঝেই বসন্তলাল আসে। একদিন তো বউ নিয়েই হাজির হল।

বসন্তলাল বলল, বাংলাদেশের অবস্থা বল দেখি। আমি তো ভাল বুঝছি না।

বললাম, ভাল আমিও বুঝছি না।

বসন্তলাল বলল, তিরিশ লক্ষ মানুষকে মেরেছে, এক কোটি লোক পালিয়ে এসেছে। ভারতের ওপর কি চাপ পড়েছে তা তো বুঝছিস। ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। কি যে হবে!

তুই যে ভাবে চিন্তা করছিস সে ভাবে আমি চিন্তা করছি না। আমার বিশ্বাস এই কাজের পেছনে ভারতের অদৃশ্য হস্ত আছে, সেজন্য দায় বহনের নৈতিক দায়িত্ব কিছুটা আছে বই কি।

এটা ভুল কথা।

তা হলে আনন্দিত হতাম। সেদিন অধ্যাপক ইসুফ সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে পটুয়াখালি জেলার ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলাম বসেছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কি বলব দাদা, আমাদের বলা হয়েছিল বাংলাদেশে হাঙ্গামা আরম্ভ হলেই পনর দিনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ভারত যাতে বাংলাদেশ স্বাধীনতালাভ করে। অথচ বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেছে, আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলোর যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আর কিছু কাল এই অবস্থা চললে এদের অর্ধেকও দেশে ফিরতে পারবে না। যা খাবার দিতে বলেছে ভারত সরকার তাও দেওয়া হয় না। যাদের দেবার দায়িত্ব তাদের দুর্নীতিতে সবাই অতিষ্ঠ। পুরো রেশন পায় না, মাথা ঢেকে রাখার মত আচ্ছাদন নেই, রোগ ছড়িয়ে পড়েছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে।

বললাম, আপনারা সরকারকে রিপোর্ট করুন।

কি যে বলেন দাদা। অনেক কাল পাকিস্তানীদের জেলে বাস করেছি, এইসব কথা বলে কিছুকাল ভারতের জেলখানায় থাকার ইচ্ছা নেই। আমরা ঘটনার স্রোতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি।

বসন্তলাল আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমিও অবস্থা লক্ষ্য রাখছি। আওয়ামী লীগের যারা নেতা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছি, এরা পাকিস্তানী শোষককে উৎখাত করে বাঙ্গালী শোষকদল সৃষ্টি করতে চায়। ভারত সরকার এদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। এরা বাদশাহী কায়দায় বাস করছে, ভারতের জনসাধারণও কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলে দিচ্ছে। এদের অনেকেই এসেছে সোনা নিয়ে, অনেকে এনেছে

কোটি কোটি টাকা। ভারত সরকারের খরচে গাড়ি-বাড়ি তো পাচ্ছেই উপরন্তু মদ্যপান ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছে অনেকেই। এরা যদি ক্ষমতা পায় তা হলেই দেশ আরও বিপন্ন হবে।

বললাম, এর পরিণাম কি হবে বলতে পারিস ?

বসন্তলাল হেসে বলল, অতি সহজ সরল উত্তর। ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানীরা যখন বিতাড়িত হবে তখন এই সব অসদাচারীরা গদীতে বসবে ভারত সরকারের দয়াতে ও চেষ্টাতে। এরা মুখে বলবে বড় বড় কথা, কাজের বেলায় জনস্বার্থহানি ঘটাবেই। যারা ক্ষমতার আসনে বসবে তারা হবে despot-স্বৈরাচারী। লুঠের ও শোষণের রাজ্য কায়েম হবে।

তারপর ?

তারপর আবার লড়াই বাধবে। গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধ হলে ভারত সরকার কি চুপ করে থাকবে ?

থাকতে বাধ্য হবে। এখন যেমন লক্ষ লক্ষ লোক এসে হাজির হয়েছে এদেশে তখন তো কেউ হাজির হবেনা। এখন যেমন এই আশ্রয়প্রার্থীদের দেখিয়ে বিশ্বজনমত ঘোরালো করে স্বপক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে তখন তো তা হবেনা। অ্যালিবাই সৃষ্টি করার পথ না পেলে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া তো সম্ভব নয়। তাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধা হবেই।

বললাম, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার যদি সাহায্য চায় ?

চাইবে। তাতে অস্ত্র অথবা যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য করবে, সরাসরি সৈন্য পাঠাতে পারবেনা। বেনামদারী সৈন্য হয়ত পাঠাবে। এতে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আছে। এমন কাজ যদি ভারত সরকার করে তা হলে বোকামি হবে। জনসাধারণ যে সরকারকে চায়না তাকে বন্দুকের মুখে কায়েম করলেও তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়না। বললাম, মুজিবের কোন হদিস নেই। বোধহয় তাকে পশ্চিম-পাকিস্তানে বন্দী করে রেখেছে। যদি সে মুক্তি পায় তা হলে ঘটনার চাকা ঘুরবে।

তাও ঘুরবেনা। মুজিবকে আমরা যে ভাবে ভারত বিভাগে আগে দেখেছি তাতে মনে হয়না মুজিব সত্যই কিছু করতে পারবে। ভারত বিভাগের বড় নায়ক সোরাবুর্দি, তারই মন্ত্রশিষ্য মুজিব, সেজন্য বিশেষ কিছু আশা যায় না। তবে পৃথিবীর রং বদল হচ্ছে, মুজিবের রং কিছুটা বদল হবে, কোন ক্রমেই কোন র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন হবে না। হি মে বি এ ক্যামোফ্লেজড্ ডেস্‌পট্। এটাই আশঙ্কা।

ভারত কেন সাহায্য করছে?

বসন্তলাল বলল, এটাও সোজা কথা। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দুর্দৈব যেমন দেখা দেবে তেমনি পাকিস্তানের সামরিক সামর্থ্যও কমবে। পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকে সৈন্য মোতায়েন রেখে অধিক ব্যয় ও আশঙ্কা নিয়ে ভারতকে বাস করতে হবে না। সব চেয়ে বড় লাভ হল অর্থনৈতিক। সাত সাড়ে-সাত কোটি লোকের বাজার পাওয়ার আশা পোষণ করে ভারতীয় শোষক ও লুণ্ঠকরা, সেই বাজার দখল করতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের পরোক্ষ প্রেরণায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ভারত সরকার। পরবর্তী অধ্যায় আরও কঠিন কঠোর হবে এটাই নিশ্চিত।

বসন্তলালের বক্তব্য শেষ হতেই বললাম, যারা আজ বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করছে তারা কিন্তু এই ব্যবস্থা মেনে নেবে না। আজ ভারত যাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে, যখন তারা বুঝবে ভারতীয় পুঁজির ধাক্কায় তাদের জীবন ওষ্ঠাগত তখনই তারা বৈরী হয়ে দাঁড়াবে। রাজনীতির অভিধানে শেষ কথা কিছু নেই। রাজনীতির গতি প্রয়োজনের দাসত্ব করে। প্রয়োজন পরস্পরকে বন্ধু করে আবার বৈরী করে। সেজন্য বাংলাদেশের এই অশান্তিতে উৎসাহিত হবার কিছু নেই।

মাসের পর মাস পেরিয়ে যায়।

জনসাধারণ দাবী জানায়, বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে

তাকে বাস্তব সাহায্য দেওয়া হোক। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মানুষ এবং ভারতের মানুষ নিস্কৃতি চায়।

তারপর একদিন। শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার ময়দানে নাতিবৃহৎ সভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন, পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে। নিষ্প্রদীপ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেতার ঘোষণা করা হল, পাকিস্তানী বিমান বহর ভারতের বিভিন্ন বিমান-ক্ষেত্র আক্রমণ করছে। দিল্লি পেরিয়ে আগ্রায় এসে বোমা ফেলছে।

পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভ হল পাকিস্তানের উভয় খণ্ডে।

এর আগে পাকিস্তান যতবার ভারত আক্রমণ করেছে ততবারই দেখা গেছে পূর্ববঙ্গে কোন উত্তাপ সৃষ্টি হয়নি। এবার পূর্ববঙ্গই হল সব অশান্তির মূল কেন্দ্র।

যুদ্ধ মানেই 'সত্যকে হত্যা', অপরের ভূমি দখল করার নীতিগত প্রশ্নকে বড় করে দেখানো। এতে কোন পক্ষই পেছপা নয়।

যুদ্ধের পটভূমি তৈরী করতে ভারত যে বিলম্ব ঘটিয়েছিল তার পেছনে ছিল মার্কিন সমরাস্ত্রের ভয়। মার্কিন সমরাস্ত্রকে মোকাবিলা করার মত অস্ত্র আছে একমাত্র সোভিয়েত ও চীনের। সোভিয়েত সহায়তার আশ্বাস পাবার পরই হাতিয়ার তুলে নিল হাতে। প্রকাশ্যে বলা হল, এটা সামরিক চুক্তি নয়। বন্ধুত্বের বন্ধন। পাক-ভারতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনেই মার্কিন আর সোভিয়েত হস্ত প্রসারিত হয়েছিল যথাক্রমে পাক-ভারতের দিকে।

পূর্ববঙ্গ লড়াকু পাকিস্তানীদের নিরাপদ এলাকা নয়। তারা অবরুদ্ধ হল চারিদিক থেকে। একমাত্র সমুদ্র পথ খোলা থাকলেও তাও নিরাপদ নয়। অবস্থা বুঝে মার্কিন নৌ-বহর এগিয়ে এল বঙ্গোপসাগরে। সোভিয়েত রণতরীও অগ্রসর হল ভ্লাডিভাস্টক থেকে। তাদের শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজন হলনা। চোদ্দ দিনের দিন পূর্ব-বঙ্গের পাকিস্তানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধের বিভীষিকা মুক্ত হল উভয় প্রান্ত।

ইন্দিরা গান্ধীর জয়-জয়াকার। কংগ্রেসী চমূরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখল, 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও'।

ইন্দিরাও সুযোগ বুঝে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আয়ত্বে আনতে নির্বাচনের ফতোয়া জারী করল। সাধারণ মানুষ চিন্তাও করল না, মুক্তি সূর্য কাকে মুক্ত করেছে, এবং কেন?

কেন?

ইন্দিরা গরীবি হটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্লামেন্ট দখল করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি দমন করে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রপতি শাসনের কালে কম পক্ষেও তিন হাজার ব্যক্তিকে সংহার করা হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হতেই প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ আরও বৃদ্ধি পেল। ছাত্র-যুবক সম্প্রদায়কে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে, শিক্ষা-সংস্কারের আশা দিয়ে কংগ্রেসের পতকাতলে টেনে আনতে কষ্ট হল না। বামপন্থী শ্লোগানসমূহ নিয়ে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করল। কংগ্রেসী অপকর্ম সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস রইল না সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের। বে-সরকারী গলাকাটা বাহিনীর ভয়ে কণ্ঠরোধ হল সাধারণ মানুষের। এই সুযোগে নির্বাচনের ফতোয়া সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়। এই উপায় গ্রহণ করলেন ইন্দিরা গান্ধী।

একাত্তর সালে কংগ্রেস নির্মূল হয়েছিল। বাহাত্তর সালে দেখা গেল বামপন্থী দলসমূহ নির্মূল হয়েছে। গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল সবাই, কি করে সম্ভব হল।

কারচুপি।

চোরাই ভোট দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। বিরুদ্ধপক্ষকে কোন মতেই প্রচার চালাতে দেওয়া হয়নি। বোমা-পিস্তল নিয়ে বে-সরকারী গলাকাটা বাহিনী ভোট-কেন্দ্র দখল করে বামপন্থীদের জয়ের পথ রুদ্ধ করেছিল।

সরকার বলল, না এসব হয়নি।

কংগ্রেস বলল, দেশের লোক কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে।

নানা মুনির নানা মত কিন্তু সবাই জানে অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। প্রশাসনের সাহায্যে গলাকাটাবাহিনীর সক্রিয় ব্যবস্থায় কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করলেও দেশের লোক কংগ্রেসের প্রচারে বিশ্বাস করেনি তবে গলাকাটার ভয়ে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়েও আসেনি।

এদের প্রশস্তি গান করছে পুঁজিতন্ত্রীবাহক সংবাদপত্রসমূহ। সরকারী বেতার ক্ষমতাসীনদের গুণগানে পঞ্চমুখ।

সব চেয়ে নক্কারজনক হল ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবির দল। এরা কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ প্রবন্ধকার, কেউ সাংবাদিক। এদের জীবনে আছে তুবেলা চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজনের বরাদ্দ। প্রচুর অবসর আছে স্ফুর্তির। এদের প্রভুদের অঢেল অর্থ। বিদেশী সরকারের গোপন উৎকোচ এদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বৃদ্ধি করে। বাড়ি-গাড়ি সব কিছুই এদের করায়ত্ত। এদের গৃহে আছে সুন্দরী স্ত্রী আর বাইরে সুন্দরী নর্ম-সহচরী। সমাজে এদের আছে প্রচুর খ্যাতি, প্রতিপত্তি আর সম্মান। সাধারণ মানুষের অনেকেই এদের স্বরূপ চেনে না। তাই নানা অনুষ্ঠানে এদের সভাপতির আসনে বসিয়ে লোকে এদের গুরুগম্ভীর ভাষণ শোনে।

এই সব বুদ্ধিজীবিদের পেশা হল একটা অবাস্তব সমাজের অবান্তর বিশ্লেষণ। বিকৃত যৌন-উন্মাদনা জাগ্রত করার কিছু মালমশলা, ভিত্তিহীন ব্যক্তিগত দর্শন বিলাস, তৎপর্যবিহীন আপাতচতুর কিছু কথার ফুলঝুরি। কিন্তু এরা সমাজের দুঃখ-বেদনাকে তুলে ধরে না, শোষণের বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করে না, ঘাতকের বিরুদ্ধে কলম ধরে না, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার ফ্যাসীবাদের প্রতিবাদ করেনা বরং সমর্থন করে।

এই সব বুদ্ধিজীবি যা করে প্রভুতোষণের জন্য তার স্বরূপ রাষ্ট্র-

ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্ষমতা লাভের পর এই সব বুদ্ধিজীবিরা যেমন সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে বিবেক-বুদ্ধি সদাচারকে নর্দমায় টেনে নামিয়েছে; তেমন পাশাপাশি ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে স্নায়ুযুদ্ধ।

স্নায়ুযুদ্ধের ধরণ হল উগ্রযৌনাত্মক গল্প-উপন্যাস কবিতায় সাহিত্যকে ডুবিয়ে দেওয়া, তার সঙ্গে যৌন রসাত্মক নাটক, শৃঙ্গার রসাত্মক সিনেমা, নগ্ন-নারীর বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি বিক্রয়, এই সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খোলা, (অভাবে প্রকাশ্যে চোলাই মদের বেচাকেনা) ক্যাবারে নাচ প্রচলন করা (অভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে কদর্য নাচ-গানের ব্যবস্থা), মেয়েদের প্রলোভন দেখিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে টেনে আনা (অথবা চাকুরি দেবার অথবা ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার আশা দেখিয়ে নারীধর্ষণ অথবা জোরজবরদস্তি নারীধর্ষণ), নানা রকম অশালীন পোষাকে মেয়েদের নৈতিকতাকে শিথিল করে দেওয়া (হিপী কালচার আমদানী)। নানা রকম রসায়নিক পিল বাজারে ছেড়ে, মদের পিল, চণ্ডু-চরস-গাঁজা-আফিমের ছড়াছড়ি ঘটিয়ে স্নায়ু শিথিল করে দেওয়া। তার ওপর রয়েছে ধর্মের নামে বাঁদরামি। প্রতিবাদকারীর গলাকাটা, গণতন্ত্রের নামে দুর্নীতিকে প্রসার করা, যুব-সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের পথে টেনে নামানো। এইগুলো হল বুর্জোয়া শাসকদের মুখ্য অস্ত্র যা দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা যায়। এই কাজটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে শাসকরা করে চলেছে।

বুদ্ধিজীবিদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ না দিলেই ফ্যাসিবাদ কায়েম করার সুযোগ ঘটে, সেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে শাসককুল।

কিন্তু পরিণতি কোন পথে? কিসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে?

কর্মক্ষেত্রে টেলিফোন বেজে উঠল। পানুদিদির গলা শুনে বললাম, কি খবর?

সাতদিনের ছুটি নাও ননা।

কেন ?

সব কথা অগ্রিম বলা যায় কি ? সাতদিনের ছুটি নিয়ে নাও; বেড়াতে যাব।

হায়দ্রাবাদ এক্স্‌প্রেসটা চারঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছাল গন্তব্য স্থানে।

লটবহর নিয়ে এসে উঠলাম হোটেলে।

পরের দিনের প্রোগ্রাম করে শুয়ে পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পান্নুদিদিও ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষ রাতে পান্নুদিদি ডেকে তুলল আমাকে।

ঘুম ভাঙ্গালে কেন ? এখনও সকাল হতে দেরী ? আছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

একা একা জেগে থাকা যায় কি ? এস গল্প করি।

অন্ধ্ররাজ্যের সব খবর শুনেছ ?

কাগজে পড়েছি। অন্ধ্রে ক্ষমতাসীল কংগ্রেসীদের মারামারি ? ক্ষমতালাভের যে অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বার্থ তা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। সেই কাজই করেছে অন্ধ্রের শাসকগোষ্ঠী। তেলেঙ্গানার মানুষ বঞ্চিত। অন্ধ্রের কিছু অর্থবান ও পুঁজিপতিরা শোষণ অব্যাহত রাখতে তেলেঙ্গানার মানুষকে বঞ্চিত করেছে জাতীয় ঐক্য আর দেশপ্রেমের অজুহাতে। চিরকাল কেউ বঞ্চনা সহ্য করে না। তেলেঙ্গানার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। শ্রীকাকুলামে নকশালী আন্দোলন তারই একটা বিস্ফোরণ। শোষণ এত কদর্য আকার ধারণ করেছে যার ফলে কংগ্রেসীরাও নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করছে। লুঠতরাজ করছে। ঘরবাড়ি সরকারি সম্পত্তি পুড়িয়েছে। নরহত্যা করেছে। পঁচাত্তরটি পরিবারের স্বার্থরক্ষা করতে কংগ্রেসের নীতি দেউলিয়া হয়েছে এটা তারই প্রমাণ।

পান্নুদি অন্যমনস্কভাবে বলল, আমাদের আমেদাবাদ যাওয়া উচিত হয়নি। গান্ধীজির দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অসহ্য মনে হচ্ছে।

ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে নিজেদের অক্ষমতাকে গোপন করার অন্য পথ তো নেই। গুজরাটের দাঙ্গা নতুন কোন ঘটনা নয়। এই সব ঘটনা যদি না ঘটানো যায় তা হলে মানুষের পেটতন্ত্র মিথ্যাচারীদের নর্দমায় নিক্ষেপ করবেই। তাই এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এবার গুজরাটে নব নির্মাণ সমিতি আঘাতের পর আঘাত করছে কংগ্রেসী অপশাসন বিতাড়ণ করতে।

কিন্তু পরিণতি?

পরিণতি? চিন্তার বিষয়। তবে পান্নুদি দেশের মানুষ এখন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে হটবার কোন উপায় নেই। নীরবে মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে, নইলে এগিয়ে চলতে হবে। এককালে বাংলার মানুষ পথ দেখিয়েছে এবার গুজরাট পথ দেখাচ্ছে। ফ্যাসীবাদকে রুখতে সামান্য প্রতিবাদ। অনেক রক্ত দিয়েছে গুজরাটের মানুষ। এই রক্তের তিলক কপালে এঁকে দেখা দেবে বিপ্লব অবশ্য যদি নেতৃত্ব নির্ভুল হয়।

মোরারজির আবির্ভাব অপনেতৃত্বের চিহ্ন। এগিয়ে চলতে অনেক বাধা।

হ্যাঁ, বাধা অনেক। কিন্তু যে মানুষের দ্বিতীয় আশ্রয় নেই, যে মানুষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত, তার বাঁচার পথ হল সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম মানুষের মেরুদণ্ড শক্ত করবে। শক্ত মেরুদণ্ড নিয়ে মানুষ বিপ্লবের পথে পা বাড়াবে। ইন্দিরা সৃষ্ট মোরারজি গণরোধ স্তব্ধ করবে সাময়িক। শুধু প্রস্তুতি প্রয়োজন।

পান্নুদি বলল, রক্তপাত ঘটছে।

যাট কোটি মানুষের দেশে প্রতিদিন কয়েকলক্ষ লোক রোগে, দুর্ঘটনায়, অনাহারে, অচিকিৎসায় মরছে। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ লোক জন্ম নিচ্ছে। এই বিশাল দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা

করতে আরও যদি দু তিন কোটি লোককে প্রাণ দিতে হয় সেটা কি খুব বড় ত্যাগ অথবা বড় ঘটনা ?

শাসক শক্তিশালী, তাদের হাতে মারণাস্ত্র বাদেও তাদের ভাড়াটিয়া বেসরকারী খুনীর দল রয়েছে।

পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে রাষ্ট্রশাসন করার মত বেকুবি যারা করে তাদের পরিণতি সুখজনক কখনও হয়নি, ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। আর বেসরকারী খুনীর দল ততদিনই শক্তিশালী যতদিন তাদের পেছনে রয়েছে পশুশক্তির সমর্থন। বন্দুক-কামানের আশ্রয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা পশুশক্তিরই নামান্তর। জনসাধারণের ঘৃণা ও ক্ষোভের সামনে এই পশুশক্তি চিরকালই পরাজিত হয়েছে। নাও, শুয়ে পড়। কাল নিজামশাহীর জৌলুষের যা ভগ্নাবশেষ আছে তা দেখে আসব।

পানুদি পাশ ফিরে শুতেই আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকি।

তাইতো। যতগুলো প্রতিশ্রুতি ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছিল তার একটিও তো পালন করেনি। গরীবি হঠাবার প্রতিশ্রুতির পর দেশের মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছে। শতকরা আশী জন লোকের উপার্জন মাসিক বিশ টাকার নীচে; অথচ একজনের শুধু নুন-ভাতের জন্য প্রয়োজন কম করেও পঞ্চাশ টাকা।

ভূমিহীন কৃষকের দল শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভীড় করেছে, ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে আমাদের ঐতিহ্যপুর্ণ মহান জাতির গৌরব বৃদ্ধি করছে। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে প্রতিদিন। বেকার শ্রমিক অন্নের আশায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরছে।

গরীবি হটাবার অজুহাতে যারা সমগ্র দেশকে ভিখারীতে পরিণত করেছে তারা সাধারণ মানুষের কেউ নয়। এরা কায়েমী স্বার্থের দাসত্ব করে ব্যক্তিস্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে লাইসেন্স, পারমিট আর চোরাবাজার বজায় রেখে। এরাই প্রতিবাদকারীদের গলাকাটার মহান কর্তব্য পালন করছে।

ছাব্বিশ বছরের ইতিহাস হল বঞ্চনার ইতিহাস। অজ্ঞ সহজ সরল জনসাধারণকে বছরের পর বছর মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে অসদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে যারা ভোট ক্রয় ও সংগ্রহ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে তাদের কাছে মানুষ পেয়েছে প্রতারণা, বঞ্চনা, ধোঁকাবাজী, অনাহার, আশ্রয়হীনতা, অশিক্ষা।

উন্নয়নের আশ্বাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র কয়েকটি পরিবারের অর্থবিত্ত বৃদ্ধি করতে, শোষণের পথ খুলে দিতে, ধনীর ধন বৃদ্ধি করতে, গরীবকে ভিখারীতে পরিণত করতে। এর প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করছে সমগ্র দেশবাসী।

বিচার-বিভাগে দুর্নীতি, শিক্ষা-বিভাগে দুর্নীতি, আচার-আচরণে দুর্নীতি, এর চেয়েও সাংঘাতিক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ডাকাতি, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ, যুব-সম্প্রদায়ের অবাধ যৌনবিলাস ও মদ্যপান, লুঠতরাজ, খুন-জখম সমাজদেহকে ক্রমেই বিষাক্ত করে তুলেছে। উপরন্তু শাসকদের দুর্নীতি, মিথ্যাবাদীতা, ভ্রষ্ঠচরিত্র কোথায় যে আমাদের উত্তর পুরুষদের টেনে নিয়ে চলেছে! আর এই সব সংবাদ গোপণ করে তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী পুঁজির তল্পীবাহক ভাড়াটিয়া সাংবাদিকরা শাসকদের জয়গান করছে। মানুষের দুঃখ-বেদনা, অসহায় অবস্থার প্রচারে কাহিনী শোনাতে ওদের অবসর নেই! মন্ত্রীদের হাঁচি-কাশির সংবাদ ছাপাতে এরা অগ্রদূত। এদের মত দেশবৈরী আর আছে কি?

এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্তি কিসে আসবে?

কোটি কোটি বেকার কর্মের আশায় পথে পথে ঘুরছে, কোটি কোটি লোক অনাহারে রয়েছে, কোটি কোটি লোকের পরিধেয় নেই, কোটি কোটি লোকের মাথা গোঁজার ছাউনি নেই, কোটি কোটি লোকের মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, কোটি কোটি শিশুর কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা নেই, অথচ বাক্যবীর দিল্লীর

সুলতানা তৎসহ রাজ্যের জ[illegible]মীর উল-মুলুকের দল শুধুমাত্র মিষ্ট অথচ অসত্য আশ্বাস দি[illegible]র দেশকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই [illegible] অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি চায় মানুষ।

মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করতে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কোথাও প্রাদেশিক দাঙ্গা, কোথাও বিচ্ছিন্নতার দাঙ্গা বাধিয়ে তামাসা উপভোগ করছে ক্ষমতাবানরা। মানুষের জীবন যেন পিঁপড়ের জীবন। পিঁপড়ে মারতে যেটুকু মমত্ববোধ থাকে, মানুষ মারতে সেই মমত্ববোধটুকুও নেই এদের। আর তা ঘটছে সুলতানার গোপণ নির্দেশে। গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে পশ্চিমবঙ্গে গণহত্যার অভিযান চলছে।

তবুও মুক্তি পেতে চায় মানুষ।

ক্ষোভ দানা বাঁধছে। যেকোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ভাবতে ভাবতে উঠে বসলাম।

আলো জ্বাললাম।

পাশের বিছানায় পানুদি ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে। বুকটা উঠানামা করছে। পাকা চুলের রেখা সারা মাথায়, কপালে বয়সের কুঞ্চণ। কিন্তু অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখতে। পানুদি যে এত সুন্দর তা কখনও ভাবতেও পারিনি। প্রৌঢ়ত্বের সৌন্দর্য কতটা গাঢ় হতে পারে তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম। যৌবনের সৌন্দর্য দেখবার চোখ আর নেই বলেই বোধহয় প্রৌঢ়া পান্না লাহিড়িকে অত সুন্দর মনে হচ্ছিল। ব্যর্থতার ছাপ কিন্তু কোথাও নেই। কেমন পরিপূর্ণতার পরিতৃপ্তি ছেয়ে আছে তার অবয়বে। কেমন একটা চোখ ধাঁধানো সুষমা। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

ভাবলাম, পানুদিকে ডেকে তুলি। কেমন মায়া হল, ডাকতে পারলাম না। ঘুমোক শান্তিতে।

পরদিন পানুদিকে নিয়ে পথে বেরিয়ে বিগত দিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নগুলো দেখছি আর এগোচ্ছি।

বললাম, এসব অনাচার সম্ভব কেন হল? এক দেশ, এক নেতা, এক শ্লোগান অথচ নিজেদের মধ্যেই তো দেখছি মিল নেই। ঐক্য কোথায়? কোনদিন ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ ছিল কি? বোধহয় ছিল না, তাই মেকি ঐক্যে ফাটল ধরেছে।

পানুদি বলল, দেশকে দূষিত আবহাওয়া থেকে যারা মুক্ত করতে পারত তারা বামপন্থী। বামপন্থী দলগুলো তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অপসংস্কৃতি মগজ ধোলাই করেছে বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের, যার ফলে দাসত্বসুলভ আনুগত্য স্বীকার করে সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

বললাম, তাকিয়ে দেখছ লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ কি ভাবে শহরের আনাচে কানাচে ভীড় জমিয়েছে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ভারতের দুর্ভিক্ষ চিরকাল মনুষ্য সৃষ্ট। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটিয়েছিল ইংরেজের হৃদয়হীন শোষণ, এই শতকের পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়েছিল ইংরেজ শাসক, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল দেশী মজুতদার কালোবাজারীর দল। এবারও ভারতীয় শাসক তাদের অনুচর কালোবাজারী মজুতদাররা দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে মানুষ মরেছিল নিঃশব্দে। নিজের কপালে আঘাত করে; একক এবং নিঃসঙ্গ সেই মৃত্যু, করুণ ও ভয়াবহ। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে মজুতদার, কালোবাজারী আর জমিদারদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত হয়েছে। অথচ এই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকে মূলধন করতে যে রাজনীতিবিদ্‌রা কালোবাজারী আর মজুতদারদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল, দেশ স্বাধীন হলে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটাবে, সকল অভাব বিদূরিত হবে বলে দম্ভ প্রকাশ করেছিল তাদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে মজুতদার-কালোবাজারী দেশের সর্বনাশ করছে।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারকে লোকে দেখল ইংরেজের চেয়েও হিংস্র ও বর্বর। নিরন্ন শোষিত মানবতার প্রতি এতবড় অবমাননা জানাতে পারেনি ইংরেজ অথচ জাতীয়তাবাদী অহিংস

শাসকের বুলেটে ছিন্ন হল কঙ্কালসার মানুষের হৃদপিণ্ড, ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের বিক্রমে নারী হারাল তার নারীত্ব, পুরুষকে টেনে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। (একমুঠো অন্নের যারা কাঙ্গাল তাদের অশ্রু মোচনের অন্য কোন পথ ওদের জানা নেই, সেই কারণেই ওরা গরীবি হটাবার শ্লোগান দিয়ে গরীব হটাচ্ছে বুলেট দিয়ে, গলা কেটে।) শ্মশানের শান্তি আনতে মৃতদেহের ওপরে ছাপমারা হল 'সত্যমেব জয়তে'। তারই পরিচয় সারা ভারতে।

মহীশূরে খাদ্যলুট হয়েছে। মহারাষ্ট্রে খাদ্যলুট হয়েছে। গুজরাট ও বিহার অগ্নিগর্ভ, বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যলুট করার লোক না থাকলেও যাদের কর্মসংস্থান করে দেব বলে শাসকরা বিভ্রান্ত করেছিল তারা রেলের ওয়াগন ভাঙ্গছে রেলকর্মী ও শান্তিরক্ষকদের সহযোগিতায়, নিজেদের দলে উপদলে খুনোখুনী করছে। আর সরকার ও তার নেতার দল ভদ্রলোকের চুক্তির নামে প্রতিদিন কালোবাজারীদের দাবী মেনে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে। টাকার মূল্য আর নেই। এ যেন চিয়াং-এর চীন।

পানুদি বলল, সরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে জনরোষ দমন করার অভিনব পন্থা গ্রহণ করছে। বিরোধীদের সভাসমিতি করতে দিচ্ছে না, একশ চুয়াল্লিশধারা জারী করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, গলাকাটা বাহিনী বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠরোধ করতে ঘরে ঘরে শাসাচ্ছে। মঙ্গল চাও তো এই সোনার ভারতের দুঃখদারিদ্রগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনে নাও। এর পরিণতি কি?

বললাম, আগে মনে করতাম পশ্চিমবঙ্গই বুঝি ক্ষুধার তাড়নায় বিব্রত। পশ্চিমবাংলার মানুষ বুঝি সবচেয়ে শোষিত, কিন্তু সারা ভারতের এক চেহারা। দিন-দুপুরে ডাস্টবিন থেকে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করছে কঙ্কালসার মানুষ খাদ্যসংগ্রহ করতে। রুগ্ন-শীর্ণ শিশু কঙ্কালতুল্য জননীর বুক থেকে দুধ সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই দৃশ্য সারা ভারতের। আহার্যের অভাবে দলে দলে মানুষ শহরে ভীড়

করছে গ্রাম ছেড়ে এসে। পরিণতি কোনদিকে অগ্রসর হচ্ছে বুঝতে পারছ না। কিসের সঙ্কেত শোনা গেছে উত্তর প্রদেশের পুলিশ-মিলিটারীর লড়াইতে। ভারতের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। যাদের ভরসায় ক্ষমতালাভ তারাই আজ ক্ষিপ্ত। পানুদি শোনা যাচ্ছে বিপ্লবের পদধ্বনি। অথচ মানুষ সামগ্রিকভাবে বিপ্লব সাধনায় নামতে পারেনি, কারণ নেতৃত্বের ত্রুটিতে জনসংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি কেউ-ই। বিকল্প হল কংগ্রেসী ফ্যাসীবাদের যূপকাষ্ঠে মাথা দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করা।

পথ চলতে চলতে ভাবছি কেন এই দুর্দশা? পরোক্ষ কর বৃদ্ধি, ঘাটতি বাজেট পূর্ণ করতে বেহিসাবী কাগুজে টাকায় বাজার ছেয়ে দেওয়া, মুনাফাবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনে ঘাটতি ঘটিয়ে শ্রমিকদের ছাঁটাই, সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। অথচ এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষিকে আধুনিক উপায়ে কাজে লাগানো, কৃষিজীবিদের উদ্বৃত্ত লোকশক্তিকে ভারী শিল্পে নিয়োগ করা কিন্তু ভারী শিল্প গড়ে তোলেনি সরকার একচেটিয়া পুঁজি তোষণ করতে, চাষীকে আদিম অবস্থায় শস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। যার ফলে কৃষিউৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অকিঞ্চিৎকর। দেশে দেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে মন্ত্রীরা ঘুরছে, দেশকে মটর্গেজ দিয়ে মানুষের ক্ষুধা মেটাতে।

মধ্যভারত ও দক্ষিণভারতের এই অংশ এতকাল ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এখানে মানুষকে ক্রীতদাসের মতই জীবন যাপন করতে যেমন হত তেমনি সম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান হয়ে এগুলো ছিল একদল মেরুদণ্ডহীন অমানুষ তৈরীর ক্ষেত্র। পাহাড়ের ওপর বিরাট বিরাট মধ্যযুগীয় কেল্লাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে হাসি পেয়েছে। সেকালেও দরিদ্র মানুষের শ্রমে ও অর্থে এইসব কেল্লা তৈরী হয়েছিল সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখতে। আজ তার রূপ বদল হলেও দরিদ্র মানুষের শ্রমে ও অর্থে বিলাস বহুল একচেটিয়া পুঁজিপতির স্বার্থ

বজায় রাখতে রাষ্ট্রনেতারা সদা যত্নবান। সময়ের ব্যবধানে সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততন্ত্র শুধু পুঁজিতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। 'রূপ বদল হলেও গুণ বদল হয়নি।

হোটেলে ফিরে এসে বললাম, এবার ফিরে চল পান্নুদি। ভারত দেখা আমার শেষ হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় যে ক্লেদ জমেছে, তা থেকে মুক্তি পাবার একটা মাত্র পথ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সজোরে সমূলে উৎপাটন করা। সেকাজ করার মত লোক আসছে, আমাদের উত্তরপুরুষ তারা। পাপও একটা সীমায় এসে থেমে যায়, তার গতিপথ রুদ্ধ হয়। পাপের গতিপথ রুদ্ধ হবার ইঙ্গিত দেখছি। আর বিলম্ব নয়, এবার ফিয়ে চল।

ফিরে আসতে হয়েছিল।

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। না ফিরেও উপার নেই।

পথে পান্নুদি বলল, একদল, একনেতা, এক আদর্শ ইত্যাদি কত বড় বড় গাল-গল্প শুনিয়েছে ইন্দিরাগান্ধী। এক নেতার পরিণতি দেখতে পাচ্ছ? উড়িষ্যায় নন্দিনী সৎপথীকে ইন্দিরার ইঙ্গিতে বসানো হয়েছিল, উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে গেছে, নতুন নির্বাচনেও কংগ্রেস গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। গুজরাটেও যাকে বসানো হয়েছিল তাকেও হটিয়ে দিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে যাকে বসানো হয়েছিল সেই ত্রিপাঠীও বিতাড়িত। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বহুগুণাকে বসিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ নিয়ে আবার গদী দখল করেছে কংগ্রেস। বিহারেও একই অবস্থা। অর্থাৎ একদল হয়েছে বহুদল, এক নেতার নেতৃত্ব কেউ মানে না। যারা আজও মুক্তিসূর্যের জয়গান করছে তারা কায়েমী স্বার্থবাজ ও তাদের ভাড়াটিয়া অনুচর, ফ্যাসীবাদ কায়েম করতে প্রধান সহায়ক।

বললাম, 'গরীবি হটাও' এখন আর শোনা যায় না। একমাত্র ইন্দিরাই এই শব্দটা উচ্চারণ করে মাঝে মাঝে। সারা ভারতে বিশ কোটিরও বেশি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। দারিদ্রের

সংজ্ঞা হল যার আয় মাসিক কুড়ি টাকার কম। যতই দিন যাচ্ছে ততই এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। দারিদ্র দূর করার মরীচিকার পিছনে দেশের লোক ছুটছে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যে সোনার পাথর বাটি তাও মানুষ বুঝতে শিখেছে। সমাজতন্ত্রের নামে যেভাবে দরিদ্রের পকেট কেটে পুঁজিপতি, কালোবাজারী, মজুতদারদের পকেট ভর্তি হচ্ছে ইন্দিরা সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনে তাতে সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যু অনেক দিন আগেই ঘটেছে। এরপর নতুন কোন শ্লোগান খুঁজতে হবে বর্তমান শাসকদের। মাঝে মাঝে বিদেশী গুপ্তচরদের গাল-গল্প শোনা যাছে।

কলকাতা পৌছানো অবধি আমরা কোন ব্যাক্যালাপ করিনি। হাওড়া স্টেশনে নামবার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। এই বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে এলাম আমার মেসে।

ক'দিন পরে বের হলাম শহরের পথে।

কিন্তু! আলোয় ঝলমল করছে গোটা শহর। হিন্দী রেকর্ড বাজছে পূজার মণ্ডপে। এই মণ্ডপ সংখ্যা অসংখ্য। প্রতিদিন যে শহরে লোড্-শেডিং-এর নামে মানুষ অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য হয় সেই শহরে আলোর অভাব তো নেই, উপরন্তু তার শতগুণ বেশি আলোর ঝলকানি চলছে।

জুলপি-বাবরি হিপীর দলে রাস্তা-ঘাট পরিপূর্ণ। কেউ মদ্যপান করছে, কেউ অশ্লীল গানের কলি ভাঁজছে, যুবতীদের অর্ধনগ্ন অথবা বিকৃত পোষাক দেখে অশালীন মন্তব্য করছে। গ্রাম-বাংলার অনাহারী মানুষের পাশে শহর কলকাতায় ধর্মের নামে যে নারকীয় ঘটনা ঘটছে তা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কলকাতা ও অন্যান্য শহর ও উপকণ্ঠকে দেখলে কেউ কি ভাবতে পারবে এই বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকে! এই বিলাস ও পাপাচার চলছে ধর্মের নামে আর তাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাচ্ছে শাসককূল।

ধর্মের নামে যারা পাপাচার করছে তারা ঘরের পয়সা ব্যয় করে না, জুলুম করে ভীতি প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের কাছ থেকে

চাঁদা আদায় করেছে। যারা অত্যাচার থেকে বাঁচতে পুলিশের সাহায্য চেয়েছে তারা বেশি দুর্ভোগ সহ্য করেছে। পুলিশ তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

কিন্তু এরা করা? এরা অপরাজনীতির নর্দমার কৃমি-কীটের মত অর্থলুণ্ঠন করে ভোগবিলাসের পথ খুঁজছে। এদের কাজ নেই, এরা ছিনতাইকারী, ওয়াগন ব্রেকার, স্মাগলার, খুনী, চোর, কালোবাজারী। যারা এই উৎসবে সমর্থন জানায় তাদের মত নৃশংস নিষ্ঠুর মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। পাশাপাশি চলছে আহার-অনাহার; সদাচার-ব্যভিচার; জননীর শোক-ঘাতকের উল্লাস, পরিধেয় অভাবে-নগ্ন, পরিধেয় প্রাচুর্যের বিলাসে অর্ধনগ্নতা; পানীয় অভাবে মৃতকল্প আর মানুষ-মদ্যপানে উন্মত্ত অমানুষ। অদ্ভুত সহাবস্থান!

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মরার। ওরা স্বাধীনতা পেয়েছে মারার।

বিপন্ন মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবার লোক কোথায়? কারও লেখনীতে বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়না কেন? সবাই ক্লীব হয়ে গেছে। শাসকের ফ্যাসীবাদের সামনে সবাইকে কি অমর্যাদাকরভাবে আত্মসমর্পণ করেছে?

স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছে যারা তাদের অনুচররা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভীতিপ্রদ। খাস রাজধানীতে নারীধর্ষণ, রাহাজানি, ডাকাতি, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি অবাধে চলছে। পশ্চিম-বাংলায় নারীধর্ষণ যেন স্বাভাবিক ঘটনা। যারা এই ধর্ষণের মস্তান তাদের অধিকাংশই হল শাসকদের দলের আশ্রিত লোক।

জনবিক্ষোভ দমন করার আরও একটি নতুন পথ গ্রহণ করছে শাসকরা। এটা হল 'নকশালী' জিগীর। স্মাগলারদের কোন দল নেই, তাদের সঙ্গে ভাগ বাঁটোরায় দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে পুলিশের সঙ্গে। এতকাল পুলিশের একচেটিয়া অধিকার ছিল স্মাগলার পেটাবার। বর্তমানে অধিকারের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করছে স্মাগলাররা। মাঝে

মাঝে স্মাগলাররা পুলিশকেও পেটাচ্ছে। আর পুলিশ ও শাসকরা চিৎকার করছে, এসব উগ্রপন্থী অর্থাৎ নকশালী তৎপরতা। তারপরই শুরু হয় বিরোধী দলের কর্মী গ্রেপ্তার, নির্যাতন, আর মিসার ফাঁস জড়িয়ে বিনা বিচারে আটক রাখা। সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করার পরদিনই দেখা যায় তারা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে।

গোটা দেশটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে হাঁসফাঁস করছে, আহার্যের অভাবে মানুষ ছটফট করছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, সুদিন সমাগত, একই দিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিপোর্ট দিচ্ছে দ্রব্যমূল্য কমার কোন সম্ভাবনা নেই। যারা নির্বাচন তহবিল ভর্তি করেছে তারা সুদে আসলে উশুল করছে। নইলে ভারতের চিনি আমেরিকায় বারআনা দরে বিক্রি হচ্ছে আর ভারতে তার দাম সাড়ে চার টাকা কি করে হয়।

যেখানে অন্নের সমস্যা, কর্মপ্রাপ্তির সমস্যা, আশ্রয়ের সমস্যা, চিকিৎসার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা সেখানে জনগণকে বিপথে চালনা করতে হলে নানা ঘটনা ঘটাতে হবে, নানা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে হবে, বিরোধী দলকে দমন করতে হবে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে হবে। এটা গণতন্ত্র নয়, স্বৈরাচার এবং ফ্যাসীবাদ।

এই শাসন ব্যবস্থাকে দেশের লোক মেনে নিতে পারছে না তাই ঘন ঘন মন্ত্রীসভা বদল হচ্ছে, অথবা ভাঙ্গছে বিভিন্ন রাজ্যে। তবুও হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

অবসর সময়ে সারা ভারতের এই করুণ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মেসের ঠাকুর যখন নোটিশ দিল, 'এবার দুবেলাই রুটি খেতে হবে' তখন বিস্মিত হইনি তবে যেদিন বলল, তাও হবে না বাবু এবার থেকে চার্জ বেশি পড়বে কেননা রেশনে চাল যা দিচ্ছে তাতে সপ্তাহে তিন বেলার খোরাকও হবে না। তখনই মনে হল চরম পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছি।

এই প্রতীক্ষা যেন করছিলাম। আমরা দেশবন্ধুকে অতি মহান বলেই জানি। দেশবন্ধুর দৌহিত্র পশ্চিমবাংলার দায়িত্ব নেবার পর অনেকেই আশা করেছিল পশ্চিমবাংলার কিছু উন্নতি হতে পারে। কার্যকালে দেখা গেল উল্টো। যখন উনি পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন কয়েক শত নরহত্যা করেছে পুলিশ ও

পুলিশসৃষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী। এই নারকীয় ঘটনার তদন্তও হয়নি। নকশালপন্থীদের যেভাবে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে তা হিটলারী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চেয়ে বিশেষ গৌরবের নয়। হয়ত কোয়ানটিটি কম কিন্তু কোয়ালিটি একই। তারপর অসত্য কথার ফুলঝুড়ি ঝড়তে থাকে ওর মুখে। আজ অবধি যতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জনসাধারণকে তার একটাও পালন করেননি। পশ্চিমবঙ্গ অনেক মুখ্যমন্ত্রী দেখেছে কিন্তু এই রকম অসত্যভাষী মুখ্যমন্ত্রী কেউ দেখেনি। রাজনীতির স্টাণ্ট সামান্য ক্ষণের মোহ সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু স্টাণ্টবাজরা লোকচক্ষে হেয় হয় এবং তার ওপর কারও আস্থা থাকে না। যে রাজ্যের এই অবস্থা, সেরাজ্যে রাত কেটে সকাল হলেই নিজের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে দেখতে হয়, বেঁচে আছি কিনা!

পানুদিদির সঙ্গে এইসবের আলোচনা করেছি। পানুদিদি গম্ভীরভাবে বলল, শোন বন্ধু; ফ্যাসীবাদের আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হতে বাধ্য। আমরা যার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি সেটা হল রক্তাক্ত বিপ্লব। আর সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় এই অনভিপ্রেত বিপ্লবকে ডেকে আনছে প্রধানমন্ত্রী।

বললাম, সেটা ভারতে সম্ভব নয়।

অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয় বন্ধু। আমি বিশ্বাস করি ভারতের মুক্তি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভোটের বাক্স আনতে পারবে না। এটা সম্ভব শুধুমাত্র বলপ্রয়োগে দেশের শত্রুদের নিপাত ঘটালে। সেই বলপ্রয়োগ যে ঘটবে তারই পদধ্বনি শুনছি গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে ও রাজস্থানে। এবার চাই যথাযথ নেতৃত্ব।

সে নেতৃত্ব কে দেবে? সে সংগঠন কোথায়।

সংগঠন আপনা থেকে গড়ে উঠবে। মানুষের সহনশীলতার শেষ মাত্রায় এসে গেছে। যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটবে। নির্ভুল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য যা কিছু অপেক্ষা। এই পথের বহু পথিক অপেক্ষা করছে নির্দেশের। সে সময় সমাগত প্রায়। তারই পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। তুমি অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু ইতিহাসের গতি কখনও রুদ্ধ হয় না।

—:*:—